অনাদি-অনন্ত

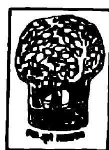
অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

অনাদি-অনন্ত

শ্রীরঙ্গ

অনুবাদ

চিত্রা দেব



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

1990 (শক 1912)

মূল © লেখক

বাংলা অনুবাদ © ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 1990

মূল্য : 14·00 টাকা

Original Title : ANADI-ANANT (*Kannada*)

Bengali Translation : ANADI-ANANTA

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত।

ভূমিকা

সাহিত্যপ্রেমী ও নাট্যামোদীর মধ্যে 'শ্রীরঙ্গ' নামে খ্যাত আদ্য রঙ্গাচারী প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সাহিত্য চর্চা করছেন। তিনি প্রায় পঁয়ত্রিশটি নাটক ও পঞ্চাশটি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন। এ ছাড়া নতুন নতুন আঙ্গিকে নাটক রচনায় তিনি সদাই যত্নশীল। তাঁর টেকনিক যে শুধু নতুন তা নয়, সেই সঙ্গে নতুনভাবে চিন্তা করবার প্রেরণা যোগায়। 1963 সালে তিনি সঙ্গীত নাটক একাডেমীর পুরস্কার পান।

নাটক লিখে শ্রীরঙ্গ অনেক খ্যাতি পেয়েছেন—তিনি তার যোগ্যও বটে—কিন্তু এতে তাঁর প্রতি এক অন্যায়ও করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত তিনি বারোটি উপন্যাস লিখেছেন। নাট্যকাররূপে যে নাটক 'হরিজনবার' তাঁকে বিখ্যাত করেছে. তার রচনাকাল হচ্ছে 1930 সাল আর তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বিশ্বামিত্রন সৃষ্টি' প্রকাশিত হয় 1934 সালে। কন্নড় উপন্যাস-ক্ষেত্রে এটি একটি অভিনব সংযোজন। কিন্তু তাঁর এই উপন্যাস বা পরবর্তী উপন্যাসগুলো সমালোচকের দৃষ্টি তেমন-ভাবে আকর্ষণ করতে পারে নি।

কন্নড় ভাষায় প্রথম উপন্যাস কোনটি? সম্প্রতি এই প্রশ্ন সমালোচকদের নাড়া দিয়েছে। 1805 (?) সালে 'কলাবতী পরিণয়' (লেখকঃ যাদব) এবং 1821 সালে 'সৌগন্ধিকা পরিণয়' (লেখকঃ মুম্মডী কৃষ্ণরাজ ঔডেয়র) প্রকাশিত হয়। ডঃ শ্রীনিবাস হবনুর সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, এ দুটিকে রোম্যান্টিক শ্রেণীতে রাখা যায়। কেম্পু নারায়ণের 'মুদ্রা মঞ্জুষ' (1823) কন্নড় ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। 1842 নাগাদ বানিয়নের 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস' 'যাত্রীকন সঞ্চার' নামে প্রকাশিত হয়। 1857 সালে এস. বি. কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার ডানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুসো' কন্নড় ভাষায় অনুবাদ করেন। ইতিমধ্যে কন্নড় উপন্যাসে বর্ণনাত্মক রূপ দেখা দিয়েছে।

1895 সালে বি. ভেঙ্কটাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' কন্নড় ভাষায় অনুবাদ করেন। তারপর তিনি অনেক বাংলা উপন্যাস কন্নড় ভাষাকে উপহার দেন। ভেঙ্কটাচার্যের অনুবাদ জনপ্রিয় হওয়ায় কন্নড় উপন্যাসে বাংলা উপন্যাসের প্রভাব পড়তে লাগল। ভেঙ্কটাচার্য দুর্গেশনন্দিনীর ভূমিকা ইংরাজীতে লেখেন এবং তাতে 'নভেল' শব্দ ব্যবহার করে তার ব্যাখ্যায় লেখেন—'সমাজ ও সমাজের অঙ্গীভূত মানুষের জীবনে যে সব দুর্ব্যবহার দেখা যায় তা ফুটিয়ে তুলে সকলকে সঠিক ভাবে চলবার পথ দেখানো চাই।'

গল্লবাড়ী বেঙ্কটরায় রচিত 'ইন্দিরা বায়ি' কন্নড় ভাষায় প্রথম মৌলিক সামাজিক উপন্যাস। এর অপর নাম হচ্ছে 'সদ্ধর্ম বিজয়'। তৎকালীন জিলাধিকারী কাজমন ইংরাজীতে এর অনুবাদ করেন। দ্বিতীয় শিরোনাম থেকেই এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়। বি. ভেঙ্কটাচার্য নভেলের মধ্যে পাঠকের স্বভাব বদলে দেবার শক্তির প্রাধান্য দিয়েছেন। এই উপন্যাসটিরও সেই উদ্দেশ্য। এতে তৎকালীন সমাজের মঠের ও সমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। সত্যনিষ্ঠা আর হৃদয়ের নির্মলতা এই দুইয়ের সাধনাই আমাদের ইহলোক ও পরলোকের জন্য প্রয়োজন। এ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য প্রচেষ্টা নিরর্থক। লেখক এইটেই স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে 1905 সালে প্রকাশিত, 'বাগ্দেবী' (বোলার বাবুরায়ের রচনা) বইটাতে এরকম উপদেশ প্রবণতা নেই, বরং তাতে মনুষ্য-স্বভাবের প্রতি আসক্তি প্রাধান্য পেয়েছে।

1915 সালে প্রকাশিত এম. এস. পুট্টন্নার 'মাডিদ্দুন্নো মহরায়া' কন্নড় উপন্যাস সাহিত্যে এক ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ লেখক এমন চরিত্র সৃষ্টি করেন যে সে যেন অপরের কাছে আদর্শ হয়, কিন্তু এই উপন্যাসে নূতনত্ব এই যে এখানে মনুষ্য-স্বভাবে আসক্তিই প্রধান। তবে এখানেও অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ হয়েছে। মৃতা-স্ত্রীকেও বেঁচে উঠতে দেখা যায়। যাদু-টাদুও আছে। কিন্তু চরিত্রগুলির বৈচিত্র্য অবাক করে দেয়। জীবনের সংঘাতে মানব স্বভাবের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে। পুট্টন্নার রচনার শৈলীও বেশ প্রভাব বিস্তার করে। কন্নড় ভাষায় এটাই প্রথম উপন্যাস যেখানে পরিবেশ ও কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশ এক সার্থক-রূপ লাভ করেছে।

'সুব্বণ্ণা' 1926 সালে প্রকাশিত হয়। একে লঘু উপন্যাস বলা যেতে পারে। শ্রীনিবাস (ডাঃ মাস্তি ভেঙ্কটেশ আয়াঙ্গার) এতে দেখিয়েছেন কি করে জীবনের নানা সংঘর্ষের মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুব্বণ্ণার সঙ্গীত-শিল্পী হবার ইচ্ছা ছিল। মা বাবার সঙ্গে মন কষাকষির ফলে সে তাঁদের ছেড়ে মহীশূর থেকে কলকাতায় যায়। সেখানে স্ত্রী পুত্র হারিয়ে সঙ্গীতের মাধ্যমে শান্তিতে জীবন কাটায়। লঘু উপন্যাসটির এইটি সার কথা। ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবার পর তার পরিপূর্ণতা লাভই এখানে লক্ষ্য। এই উপন্যাসে নাটকীয় ঘটনা নেই। সুব্বণ্ণা কন্নড় উপন্যাসের চোখ মানুষের অন্তর্জগতের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

'বিনায়ক' (বিনায়ক কৃষ্ণগোকাক) 1932 সালে 'ইজ্জোড' নামে 172 পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস লেখেন। এক কোমল দয়ালু স্বভাবের মেয়ের গোঁয়ার মূর্খ স্বামীর হাতে মৃত্যু এর সার কথা। আশ্চর্যের কথা এই উপন্যাসের যে অবশিষ্ট ভাগ 1953 সালে প্রকাশিত হয় সেটা অন্য এক আদর্শে চিত্রিত। কিন্তু

বিনায়কের নরহরি নানারকম প্রভাবের ফলে জীবনের উত্থান পতন অনুভব করে ক্রমে ক্রমে আমাদের সামনে একটা রূপ ধারণ করে। 1933 সালে আনন্দ কন্দ (বেটগেরি কৃষ্ণ শর্মা) 'সুদর্শন' নামে এক উপন্যাস লেখেন। 'সুদর্শন'কে সামাজিক উপন্যাস বলা যায়। এক আদর্শ ব্যক্তিকে চিত্রিত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এটা গান্ধীযুগের প্রথম উপন্যাস। এর নায়ক সরল জীবন, উদাত্ত বিচার ও ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। 'কুবেংপু' (ডাঃ কে. বি. পুট্টপ্প) 1936 সালে লেখেন 'কানুর সুব্বম্মা হেগ্গডতী'। অ. ন. কৃ (ডা. অ. ন. কৃষ্ণরাও) অনেক উপন্যাস লিখেছেন। এঁরা যে জীবন দেখেছেন তাই ব্যক্ত করেছেন নিজেদের উপন্যাসের মাধ্যমে। এটা সত্য যে জীবনের জটিলতা এবং নিষ্ঠুর সত্যের পটভূমিতে অনেক অবিকশিত আকাশ কুসুমেরও সৃষ্টি হয়েছে।

শিবরাম কারন্ত 'চোমনদুডী' নামে এক উৎকৃষ্ট উপন্যাস 1933 সালে প্রকাশ করেন। (ইতিমধ্যে তার পাঁচটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে) পরের বছর-গুলিতে কন্নড় উপন্যাসে হরিজন সমস্যা বার বার স্থান পেয়েছে। চল্লিশ বছর আগে কারন্ত এক বিশিষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। অস্পৃশ্যের জীবন এখানে শিল্পরুচিসম্মত ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সংস্কারের ইচ্ছার চেয়ে হৃদয়ের বোধই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। এইভাবেই গরীব আর তাদের পিষে ফেলার জন্য প্রস্তুত চারপাশের লোকজন আর তাদের জগৎকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি অজস্র কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। কারন্তের দৃষ্টিতে ভাবুকতার কোনও সুযোগ নেই দেখে আজও অবাক হতে হয়। কন্নড় উপন্যাসের জগতে আজও কারন্ত মহান স্রষ্টাদের মধ্যে গণ্য।

'শ্রীরঙ্গে'র 'বিশ্বামিত্রন সৃষ্টি' 1934 সালে প্রকাশিত হয়। এটা দেখে বোঝা গেল যে এ যাবৎ কন্নড় ভাষায় উল্লেখযোগ্য উপন্যাস সৃষ্টি হয়নি। উপন্যাসে ধর্মোপদেশের স্থান নেই। মানুষের জীবন সংগ্রাম, মানুষের অন্তর্জগতের মহত্ত্ব, সমাজের সমালোচনা, মানুষের আদর্শই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। সংলাপে কথ্য ভাষার সার্থক প্রয়োগ হয়েছে। এম. এস. পুট্টন্না আর শ্রীনিবাস উপন্যাসের ভাষায় দিলেন তীক্ষ্ণতা, সাবলীলতা ও লালিত্য। কিন্তু তখন পর্যন্ত প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা নগণ্য ছিল। (1945 সাল পর্যন্ত প্রায় 150টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল।) পরে জনপ্রিয় উপন্যাসকার অ. ন. কৃ. কৃত প্রথম দিকের উপন্যাস 'জীবন যাত্রে' ও 'উদয় রাগ' 1934 সালে প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ কন্নড় পাঠকেরা বী. ভেঙ্কটাচার্য আর গলগনাথের সাহসী নায়কদের রোমাঞ্চকর কৃতিত্ব পছন্দ করত। অন্য লেখকরাও প্রায় প্রত্যেকেই এক একটা উপন্যাস লিখেছেন।

এই পরিস্থিতিতে শ্রীরঙ্গের 'বিশ্বামিত্রন সৃষ্টি' উপন্যাস রচিত হয় 1934

সালে। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র নারায়ণ নামে এক যুবক। সে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় কেননা ঘরের লোকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। সে রেলের কামরায় উঠে বসে। সেখানেই বিশাল জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুরু হয়। সে শিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক। সে চায় যে তার চারপাশের সমাজ পূর্ণতা লাভ করুক। নিজের বিয়ের প্রশ্নে তার মনে যে অসন্তোষের সৃষ্টি, সেটা রেলে, রাস্তার চায়ের দোকানে, গ্রামের নানা শ্রেণীর নানা লোকের সঙ্গে মিশে বাড়তেই থাকে। জনতার মূর্খতায় তার করুণা হয়। তাদের অজ্ঞতা দূর করবার ইচ্ছা বাড়তে থাকে। নিজে কলেজে পড়া বলে তাদের শোধরাবার জন্য শিক্ষাকে বেছে নেয়। গাঁয়ের কুলকর্ণী লোকদের মূর্খতার প্রশ্রয় দিত আর তার ফলে নিজের জীবিকা অর্জন করত। কুলকর্ণীর সাহায্যেই নারায়ণ স্কুল খোলে। যে অজ্ঞতা দূর করবার জন্য নারায়ণ কোমর বেঁধে লেগেছিল সেই অজ্ঞতাই তাকে মহাপুরুষের আসনে বসিয়ে দেয়। সে বর্ষা নামাতে সক্ষম অলৌকিক পুরুষ হয়ে পড়ে। শেষে স্কুলে পড়াতে পড়াতে তার মৃত্যু হয়।

শ্রীরঙ্গের উপন্যাস প্রকাশিত হলে স্পষ্ট দেখা গেল তিনি সমসাময়িক যুগ থেকে কতটা এগিয়ে আছেন। ব্যাপারটা অনেক দিন সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। সাধারণ পাঠক উপন্যাসের কেন্দ্রীভূত ব্যক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। সাধারণ লোকেদের 'বিশ্বামিত্রন সৃষ্টি' প্রভাবিত করতে পারে নি। উপন্যাসের অধিকাংশে লেখক উপন্যাসের পাত্রদের কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে নিজের সহানুভূতি পাওয়া পাত্রদের সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হয়ে দেখেছেন। শেষ অংশ ছাড়া সারা উপন্যাসেই ব্যঙ্গের ছড়াছড়ি। এটা সাধারণ অগভীর ব্যঙ্গ নয়। নারায়ণ বুদ্ধিমান, আদর্শে পূর্ণ বিশ্বাসী। কিন্তু তার বিশ্লেষণে বাস্তবিকতার বোধ নেই, নেই অভিজ্ঞতার গভীরতা। অমুক গ্রামে যাওয়া উচিত হবে কিনা তা স্থির না করেই সে রেলগাড়ীতে চেপে বসে। এ থেকে তার জীবনের একটা সঙ্কেত মেলে। তার যাবার ইচ্ছা আছে কিন্তু কোথায় যে যাবে তা ঠিক নেই। তৃতীয় শ্রেণীতে তার যাত্রা শুরু। সারা যাত্রাপথে তার আর অন্যান্য সংস্কারকদের মধ্যে গভীর পার্থক্য। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে নারায়ণের সে বোধ নেই। এই উপন্যাসে দুরকমের ব্যঙ্গ মিলে এক বিশিষ্ট জটিলতার সৃষ্টি করেছে। একটা ব্যঙ্গ হচ্ছে যে নারায়ণ তার চারপাশের পৃথিবীকে ঠিক বুঝতে পারে না, ফলে তার আর সমাজের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় ব্যঙ্গ হচ্ছে যে নিজের অনভিজ্ঞতার বোধ তার নেই। নিজের চারপাশে মূর্খতা দেখে নারায়ণের মনে করুণা জাগে, জনতার জন্য তার অত্যন্ত দুঃখ হয়—'হায় কি করে এদের শোধরানো যাবে।' তখনই নারায়ণ বুঝতে পারে এদের শিক্ষিত করা দরকার···এদের শিক্ষার দরকার বটে কিন্তু এ কথাটা সে বুঝতে পারে না যে তার নিজেরই জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দরকার।

এই উপন্যাসে শ্রীরঙ্গ কন্নড় ভাষায় প্রথমবার মনোবৈজ্ঞানিক শৈলীর প্রয়োগ করেছেন। (বোধ হয় দ্বিতীয়বার এর প্রয়োগ ত. রা. সু. লিখিত 'বিড়ুগডেয় বেড়ী'তে হয়েছে।) শ্রীরঙ্গ কিছুকাল ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। অতএব তাঁর রচনায় ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। মনোবৈজ্ঞানিক টেকনিকের প্রয়োগকারী শ্রীরঙ্গকে চেনা দরকার।

নারায়ণের চারপাশের জনতাকে তিনি তার চোখ দিয়েই দেখেন। তার মনের ব্যাপার স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখার মত পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু জেম্‌স্‌ জয়েসের লেখায় যে ব্যঙ্গ নেই, সেটা এখানে দেখা যায়। এতে নায়কের মনের স্তরগুলি আলাদা আলাদা করে দেখাবার প্রয়াস নেই।

এই উপন্যাসে ভাষার প্রয়োগেও এক বৈশিষ্ট্য আছে। বিভিন্ন চরিত্রের শুধু সামাজিক শ্রেণীর অনুকূলই নয়, মনের ব্যাপারেও অনুকূল ভাষার প্রয়োগ কথাবার্তার মধ্যে করা হয়েছে। এতে অন্য সাধারণ লেখকের লেখনভঙ্গী থেকে শ্রেণী ও ভাষার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে ; অধিকন্তু তাঁর দৃষ্টিকোণের পার্থক্য ব্যক্ত করবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এইভাবে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উপন্যাস জগতে প্রবেশ করে শ্রীরঙ্গ একের পর এক উপন্যাস লিখে নিজের সাধনার নতুন আঙ্গিক প্রস্তুত করে চলেছেন। গত চল্লিশ বছর ধরে কন্নড় উপন্যাস সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে। 1945 সাল পর্যন্ত শিবরাম কারন্ত, অ. ন. কৃষ্ণরাও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এরপর শিবরাম কারন্ত এক অনুপম আঙ্গিকের সাধনায় প্রবৃত্ত হন। জীবনের প্রতি অনুভূতিলব্ধ গভীর শ্রদ্ধাবোধকে উপযুক্ত কথাবস্তু ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ দিয়ে সফল টেকনিকে তিনি 'মরলি মন্নিগে' থেকে 'মূকজ্জিয় কনসুগলু' পর্যন্ত অনেক উপন্যাস লেখেন। কন্নড় উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনেকবার বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হলেও তাঁর উপন্যাস কোন সমালোচকই উপেক্ষা করতে পারেন নি। নিজের দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে তিনি বলেছেনঃ— 'এ কথা সত্য যে আজকাল অনেক বিবাদ চলছে। সেটা জীবন্ত সাহিত্যের গুণ, কিন্তু টেকনিক, শৈলী ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাদের ফলের উপর নির্ভরশীল। তাদের সার্থকতা তখনই যখন সাহিত্যকারের কল্পনা, ভাবনা আর উদ্দেশ্য পাঠকের হৃদয়ে অবিস্মরণীয় প্রভাব বিস্তার করে।'

আনন্দ কন্দ ও বিনায়ক থেকে যে পরম্পরা শুরু হয় (গল্পের ক্ষেত্রে সে ধারা শ্রীনিবাসের ধারার সঙ্গে যুক্ত) কন্নড় ভাষায় সেটাই চলে আসছে। তাতে আদর্শ প্রেম থাকে, জীবনকে আত্মার শোধন যন্ত্র মনে করা হয়, ত্যাগ ও চিত্তের স্থৈর্যের গৌরব দেখান হয়। অনেক উপন্যাস লেখক এই ধারায় লিখেছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে 1945 থেকে প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত এই প্রগতিশীল

আন্দোলন চলে যার প্রমুখ আচার্য হচ্ছেন অ. ন. কৃ.। তাঁর প্রথম বিশিষ্ট কৃতিত্ব 'সন্ধ্যারাগ' এই ধারার রচনা। প্রগতিশীল আন্দোলন অখিল ভারতীয় রূপ নিয়েছিল। প্রগতিশীল সাহিত্যিকেরা দেখালেন যে সাহিত্যে সব আবর্জনা ও ত্রুটি দেখিয়ে সে সব দূর করবার জন্য প্রচণ্ড শক্তি থাকা দরকার। এর মধ্যে অ. ন. কৃ. ছাড়াও ত. রা. সু. (ত. রা. সুব্বারাও), বসবরাজ কট্টিমনী প্রভৃতি জনপ্রিয় লেখকেরা উপন্যাস লিখেছেন। তবে এই শ্রেণীর লেখকদের রচনা যুগের চেয়ে পিছিয়ে ছিল এবং তাতে ভাবাবেগের মাত্রাই বেশী। কিন্তু 'বিড়ুগডেয় বেড়ি', 'জ্বালামুখী' প্রভৃতি উপন্যাসে কথাবস্তুর বিস্তার দেখা যায়। অনাবশ্যক সংকোচ বাদ দেওয়া হয়েছে। এটাও সত্য যে এর ফলে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বিগত পঁচিশ বছরে 'নব্য পন্থ' কন্নড় ভাষায় পর্যাপ্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। আশ্চর্যের কথা এই যে নব্য পন্থে লেখা সাহিত্য (কবিতা ছাড়া) বড় কম। সাহিত্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম, কঠোর ও বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে বলে এই মতবাদ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। এটা সত্য যে, এই 'নব্য পন্থ'কে বিশেষ দৃষ্টিকোণে দেখলে অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক আন্দোলনের স্বরূপ বলা যায়। বিদেশযাত্রী যুবকের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রসার এবং সাহিত্যের মর্যাদা লাভের ফলে পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি এই সব কারণ এই আন্দোলনকে উৎসাহিত করল। এই প্রভাব পড়েছিল সমগ্র ভারতের উপর। এরই ফলে কাফকা, কামু ব্রেখ্‌ট্, অয়নেস্কো, ব্রুহ, সাত্রে প্রভৃতি পশ্চিমী সাহিত্যিকদের প্রভাব সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। যদি কন্নড় উপন্যাস সম্বন্ধে বলতে হয় তো উপন্যাস লেখকের উচিত কোন সিদ্ধান্তকে চোখ বুঁজে স্বীকার না করে বস্তুনিষ্ঠ হয়ে জীবনের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা। অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিত্ব বিসর্জন না দিয়ে তৈরী ছাঁচকে স্বীকার না করে সাহিত্য সৃষ্টি করা উচিত। গতানুগতিক ভাবে না লিখে নির্লিপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ হয়ে নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে লিখলে ভাষায় একটা স্থিতিস্থাপকতা আসে। রচনায় দরকার মতো ভাষাকে রাখতে হয়, বদলাতে হয়। এই হচ্ছে নব্যপন্থীদের বিচারধারার বুনিয়াদ।

/ অনেক ঔপন্যাসিক আছেন যাঁরা বাঁধাপথে না চলে স্বতন্ত্র পথ ধরে লেখেন। কারন্তের নাম আগেই বলা হয়েছে। 'গ্রামায়ণে'র লেখক রায়বাহাদুর, 'মনেয়ল্লী মদুমগল' এর রচয়িতা কুবেংপুও এই দলে পড়েন। শঙ্কর মোকাশী পুনেকরের উপন্যাস 'গংগম্বা গঙ্গামাঈ'* কে নব্য শৈলীর রচনা না বললেও কিছু সমালোচক এতে নব্য উপন্যাসের গুণ দেখেছেন। সাম্প্রতিককালে প্রসিদ্ধ ডাঃ ভৈরপ্পা 'বংশবৃক্ষ', 'নায়িনেরড়ু', 'গৃহভঙ্গ'* ইত্যাদি উপন্যাস কারন্তের মতো অনুভূতি-

---

* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এই উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছে।

কেই ভিত্তি করে রচনা করেছেন। এই সব বিভিন্ন ধারার লেখকদের মধ্যে যাঁরা পড়েন না শ্রীরঙ্গের নাম সেই সব লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

যদি বলা যায় যে শ্রীরঙ্গের প্রত্যেক উপন্যাসই এক একটা শৈলীর বা আঙ্গিকের প্রয়োগ, তবে বলা যেতে পারে যে প্রয়োগের দিকে তাঁর বিশেষ নজর আছে। এ কথা স্পষ্টই স্বীকার করতে হয় যে শ্রীরঙ্গের উপন্যাস 'বিশ্বামিত্রন সৃষ্টি' একেবারে নতুন আঙ্গিকে লেখা এবং সার্থকও বটে। অ. ন. কৃ. যে জনপ্রিয় তার কারণ তিনি মধ্যবিত্তের গার্হস্থ্য জীবনের বিশ্বাস আর আদর্শপ্রিয়তাকে নিজের উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্রীরঙ্গের লেখায় বৌদ্ধিক অংশ প্রধান। গতানুগতিকতা বা ভাবুকতা তাঁর লেখায় নেই। (তিনি উপন্যাস লেখক ও নাট্যকার রূপে বড় তীক্ষ্ম বলেই এ আলোচনা।) চারপাশের জগৎকে প্রকাশ করতে হলে তিনি একটা অংশ নেন, আর সেটা দেখা শেষ হলে অন্য অংশের উপর তার নজর পড়ে। সেইজন্য তাঁর এক উপন্যাসে দেখানো পরিবেশ বা চরিত্র অন্যটিতে দেখা যায় না। এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে তিনি তাঁর সমকালীন জনপ্রিয় অন্যান্য ঔপন্যাসিকের চেয়ে ভিন্ন বলে জানা যায়।

শ্রীরঙ্গের বিভিন্ন উপন্যাসে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 'প্রকৃতি'তে তিনি তিন পুরুষের ছবি এঁকেছেন। এই তিন পুরুষে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের পারস্পরিক সম্বন্ধ কিভাবে বদলায় সেই তথ্য এই রচনায় মেলে। এটা একটা ভাবনা বা ঘটনার বিবরণ না হয়ে যেন জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে মনে হয়। এখানে আমরা টেকনিকের প্রাধান্য দেখতে পাই। বর্তমান কালে আরম্ভ হওয়া গল্প অতীতে ফিরে গিয়ে আবার বর্তমানে ফিরে আসা—এই টেকনিক এখানে সার্থক হয়েছে।

15 অগাস্ট, 1947 সালে শ্রীরঙ্গের 'পুরুষার্থ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। লোকমান্য তিলকের শ্মশান যাত্রায় (1 অগাস্ট, 1920) উপন্যাসের কাহিনী শুরু আর শেষ হয় স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে। স্বাধীনতা লাভের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করবার আদর্শ নিয়ে চার বন্ধু মিলিত হয়। তিনজন নির্বাচিত আদর্শ ত্যাগ করে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করে। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধের জন্য অবশিষ্ট থাকে সাধু। সততার আদর্শ ধরে সাধু সব কিছু হারায়। চারজনের স্মৃতি চার পুরুষার্থের রূপ ফুটিয়ে তোলে।

সাম্প্রতিক উপন্যাস 'বিষচক্রব্যূহ' গান্ধী-উত্তর যুগের কাহিনী। এখানে দুই পুরুষের পার্থক্য পিতা-পুত্রে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীরঙ্গ ভাষার প্রতি সর্বদাই সজাগ। এখানে দুই পুরুষের পার্থক্য শব্দের অভিব্যক্তিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'কমাণ্ডার', 'যা বলছি তাই কর', 'লীডার', 'সুখ', 'সার্থক', প্রত্যেকটি শব্দ এক এক পুরুষে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝায়। শেষে ছেলে বাপকে বলে, 'জানিনা গান্ধীর মধ্যে আপনারা কী দেখেছিলেন; আমরা তো বুঝতেই পারি না।'

'অনাদি-অনন্ত' শ্রীরঙ্গের অষ্টম উপন্যাস (1959)। প্রথম ভাগের অনাদির ঘটনা আর দ্বিতীয় ভাগের অনন্তের ঘটনার মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান। অনাদিতে চরিত্র তিনটি—তার মধ্যে এক সরলা মৃত। কিন্তু অন্য দুই চরিত্র রামপ্পা ও কুমুদের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে সরলাও তাদের মতই জীবন্ত ও বাস্তব প্রতীত হয়। এ ছাড়া সরলার কথাবার্তায় একরকম রহস্য থাকার জন্য, রামপ্পা ও কুমুদের মানসিক দ্বন্দ্বের বিষয়ে এবং তাদের নতুন সম্বন্ধের ব্যাপার সে কতটা জানতে পেরেছে আর কতটা কল্পনা করেছে, সেটা বুঝতে না দেওয়ায় তার ব্যক্তিত্ব এক রহস্যই থেকে যায়। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ। (দৈহিক সম্বন্ধ বললে অনাবশ্যকভাবে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার উপর নজর দেবার মতন হবে। স্ত্রী পুরুষ দুজনেরই একে অপরের মনকে সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত করবার শৈলী এই উপন্যাসে আছে।) এই কাহিনীর বিকাশের সঙ্গে আরও কয়েকটি উপকাহিনী সাঙ্কেতিক রূপে প্রথম থেকেই চলতে থাকে এবং উপন্যাসের জটিলতা বাড়ায়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ, ভাষার বৈশিষ্ট্য, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ, শরীর ও মনের সম্বন্ধ এই সবই উপন্যাসের প্রথম ছয় অধ্যায়েই ব্যক্ত হওয়া এক আশ্চর্য ব্যাপার। প্রথম অধ্যায়ে কুমুদ ও রামপ্পা সমান্তরাল ভাবে চলে। তখনও তাদের এক পা থাকে অতীতে, অন্য পা থাকে বর্তমানে। স্ত্রী পুরুষের আকর্ষণ, ইচ্ছা, ইচ্ছার নানা রূপ, প্রেমে লুকোনো ঈর্ষা, ঈর্ষার অঙ্কুর থেকে বিকশিত প্রেম, তাদের দুজনের অনিবার্যভাবে বিবাহে বাধ্য করার মতো ক্রিয়া কলাপ এবং এই সব থেকে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের আর এক রূপ সরলার জীবনকে পৃষ্ঠভূমি করে এক নূতন ব্যাপ্তি প্রদান করে।

দ্বিতীয় ভাগের চরিত্রও তিন—প্রত্যক্ষ দুই আর অপ্রত্যক্ষ এক। প্রথম ভাগে কুমুদ ও রামপ্পার ঘনিষ্ঠতার জন্য দায়ী সরলা যেমন প্রত্যক্ষ না হয়েও প্রত্যক্ষ দেখায়, সেই রকম তাদের মিলনের ফল মোহনকেও এখানে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না; সে অপ্রত্যক্ষই থাকে এবং সরলার মত মৃত্যুর গ্রাসে পড়ে। এখানে শ্রীরঙ্গ 'কাল'কে এক বিশিষ্ট রূপে প্রয়োগ করেছেন। সমস্ত ঘটনা এক ঘন্টার ভিতর শেষ হয় কিন্তু এর মধ্যেই দশ বৎসরের জীবনের চড়াই-উৎরাই শুধু নয়, কুমুদ ও রামপ্পার সংঘাতও একটা রূপ নেয়। দেহ-মনের সম্বন্ধ, (অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুমুদের দেহই রামপ্পার দেহের সঙ্গে প্রেম করতে থাকে। কুমুদের মতে সেটা তার লালসা), কথাবার্তা, ভাবের সম্বন্ধ এখানে সব একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়। 'পতি-পত্নীকে যুক্ত করবার গ্রন্থি হচ্ছে সন্তান' 'ভবভূতির এই উক্তির ভূমিকা দিয়ে লেখক রামপ্পা ও কুমুদের সম্বন্ধকে এক নতুন আঙ্গিকে তৈরী করেছেন এবং মোহনের অস্তিত্ব ও মৃত্যু দুইয়েরই অর্থ সূচিত করেছেন। এখানে বুড়ী পিসী এসে অতীত ও বর্তমানকে বারবার মিলিয়ে কুমুদের দশ বছরের অনুভবকে জুড়ে দেয়।

অনাদি-অনন্তের কিছু অংশে (সরলার ছবির সঙ্গে রামন্নার আলাপ, বন্ধুর বাড়ীতে খাওয়া, তার পায়ে আঘাত পাওয়া—এই সব প্রসঙ্গে কুমুদের মানসিক স্থিতি ইত্যাদি) আমাদের মনে হতে পারে যে বর্ণনা নাটকীয় হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও এও মনে হতে পারে যে এটা মগজের কসরত, কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এটা স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের জটিলতাকে ভাষা দিয়ে অভিব্যক্ত এক কৃতিত্ব। কেবল স্মৃতিচারণ দিয়ে এগারো বারো বৎসরের জীবনকে ব্যক্ত করবার এ এক বিশিষ্ট শৈলী। এই উপন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে পার্থিব ঘটনা আর মানসিক ব্যাপারকে সমানভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সত্তর বৎসর বয়স্ক শ্রীরঙ্গ আজও নূতন নূতন প্রয়োগ করছেন। তাঁর সকল প্রয়োগ সফল না হলেও কৌতুহল সৃষ্টি করে।

—এল. এম. শেষগিরি রাও

অনাদি

'চলো সিনেমা যাই।'

'—উঁ—হু'

'সিনেমা না হোক বাইরে কোথাও যাবে?'

উত্তর নেই।

'বাইরে বেড়িয়ে এলে ভালই হত—ঘরে বসে একঘেয়ে লাগছে তাই বলছিলাম।

মুখের ওপর হাত রেখে হাই তুলল। এই তার উত্তর।

'কোথাও যাবার দরকার নেই, এই তো? তোমার জন্যেই বলছিলাম। আমার তো লেখার কাজ পড়ে আছে, যাবে তো বলো। আমি রাতে লিখবো। অ,-শুধু তো-না-ই বলছ। চুপচাপ বসে থেকে করিই বা কী, বলো তো? আমি তাহলে লিখতে বসছি। কোন কাজ থাকলে বলে যেও।'

বলতে বলতে খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে একটা ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস নিয়ে রামপ্পা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। দিনের বারো ঘণ্টার মধ্যে কুমুদের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে এটা বোধ হয় শততম বা সহস্রতম প্রয়াস।

এই অস্বস্তিকর অবস্থার এই প্রথম বা শেষদিন নয়। প্রায় চার মাস হয়ে গেল। অথচ এই অসহ্য পরিবেশটাকে মেনে নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কুমুদ কে? তার সঙ্গে আমার সমন্ধটাই বা কি? আমি কেন তার জন্যে ঘরে শ্মশানের নীরবতা মেনে নেব? কুমুদের যদি কোন সম্বন্ধ থেকেও থাকে তো সে আমার স্ত্রী সরলার সঙ্গে। বেচারী! সরলার স্বভাবে ছিল সরল বিশ্বাস। সে বলত কুমুদ তার মাসতুত বোন। কে জানে সে মাসী কোথায় থাকে? আগে কখনও সরলার মুখে ওর কোন মাসীর কথা শুনিনি। একদিন ভাইয়ের বাড়ি থেকে ফেরবার সময় সে কুমুদকে সঙ্গে নিয়ে এল। মাসতুত বোন বলে বাড়িতে ঠাঁই দিল। মাসীর কথা জিজ্ঞেস করবার সুযোগই পেলাম না, কারণ মাসী তখন মারা গেছেন। এইভাবেই কুমুদের এই সংসারে প্রবেশ। সেও আজ ছ'বছর আগেকার কথা। এখন কুমুদের সে সম্বন্ধও টিঁকল না। সরলা মারা যাবার পর চার মাস কেটে গেছে। ছ'বছরের পুরনো পরিচয় অবশ্য আছে, কিন্তু এই ব্যবহার আর কতদিন সহ্য করা যায়? মুখে না বলে কাগজটা চেয়ারের ওপর আছড়ে ফেলে প্রতিবাদ জানিয়ে রামপ্পা উঠে পড়ে। 'যদি কিছু দরকার হয় তো এসে বলে যেও, ভুলো না' বলে আরেকবার মনে করিয়ে দিয়ে সে নিজের ঘরে চলে যায়।

দুই

রামন্নার দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে কুমুদ আর নিজেকে সামলাতে পারল না। রামন্না কি দুঃখ পেল? সে তো তাকে দুঃখ দিতে চায় না। কক্‌খনো না। তাকে কষ্ট দেবার কথা ভাবতেই পারে না সে। কিন্তু কি করবে? প্রাণ চায় এক তো মন চায় আর। প্রাণ চায় রামন্নার সঙ্গ অথচ ওর হাসি ঠাট্টা অসহ্য লাগে মনের কাছে। এমন কেন হয়? কুমুদ বুঝতেই পারে না। তবে ব্যাপারটা সত্যি। তার অস্থিরতাই তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। সরলাদিদির মৃত্যু তাকে অভীর আঘাত করেছে। সে ভাবে, আমার মতো বারো বছরের একটা অনাথ মেয়েকে পেলে পুষে মায়ের স্নেহ-যত্নে মানুষ করেছিল বলেই কি সরলাদিদির মৃত্যুতে এমন লাগছে? কিন্তু রামন্নার অবস্থা আমার মতো হল না কেন? প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়ে স্বামীর যত দুঃখ হয়, ততটা কি আমার হতে পারে? সেটা কি স্বাভাবিক? এ সন্দেহ অনেকবার তার মনে জাগল। রামন্নার সামনে বসে কথাবার্তা বলতে তার অসহ্য লাগে কিন্তু রামন্না সরে গেলেই সে যেন পাগল হয়ে যায়। তাই দরজা বন্ধের শব্দ হতেই এক মুহূর্তের মধ্যে তার মুখে কান্না হাসির আলো ছায়া খেলে। সবটাই গূঢ় রহস্যময় ব্যাপার। হৃদয়-গগনে মেঘ ঘনিয়ে আসে। প্রথমে গুরু গুরু শব্দ, পরে বিদ্যুৎ চমকায়। সে হাসিমুখে বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে থাকে, সুখের আবেশে পুরোপুরি ডুবে যাবার জন্যে চোখ বোজে। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে বৃষ্টিধারা নেমে আসার মতো তার হাসিমাখা মুখ ভেসে যায় চোখের জলে। এ কি সুখ? না দুঃখ? ঠিক বুঝতে না পারার জন্যে কিংবা এক অলৌকিক সুখের আমেজে তার মুখ রমণীয় হয়ে উঠেছিল। চোখ বুঁজলেই এক অলৌকিক আনন্দ অনুভব করে। আজও চোখ বুঁজে কুমুদ পুরনো স্মৃতি হাতড়ায়······সেদিনও, রামন্নার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। সে ছিল বারো বছরের মেয়ে। সেই প্রথম সরলাদিদির সঙ্গে এখানে আসছিল। রেলের জানলা দিয়ে ছুটন্ত দৃশ্যগুলো 'রাজা দ্যাখো, রাণী দ্যাখো' ছবির মতো ছুটে চলেছে। তার খুব ভাল লাগছিল। কিন্তু সরলাদিদি অনর্গল বকে চলেছে, মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে চলেছে, 'বুঝলি তো কুমুদ?' তাই তার কথায় কান রাখতে হচ্ছিল। আর কথাই বা কী? সারা পথ শুধু রামন্নার প্রশংসা আর প্রশংসা। কথায় কথায় বলে, 'উনি এই কথা বলেন।' সরলাদিদি গম্ভীর হয়ে বলবার চেষ্টা করেছিল, 'উনি লেখক তো, ভারি অদ্ভুত স্বভাব, তোর সঙ্গে হাসিঠাট্টা করলে কেঁদে ফেলিস না যেন।' আজও তার মুখ মনে পড়লে হাসি পায়। সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, 'আর একটা কথা, উনি ঠাট্টা তামাসা করলেও তুই যেন ওঁকে নিয়ে মস্করা করতে যাস নে। ভীষণ বকবেন।

তাঁর মন কখন যে কি খেয়ালে থাকে বলা যায় না।' এসব শুনে রামন্নাকে দেখবার জন্যে কুমুদ উৎসুক হয়ে উঠেছিল। স্টেশন থেকে সে আর সরলাদিদি বাড়ি এল। দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে কাউকে দেখা গেল না। তা সত্ত্বেও সরলাদিদি চাপাগলায় বললেন, 'এই, হাত পা ধুয়ে নে। আমি চা করছি। ঘরের দরজা তো বন্ধ, উনি লিখছেন বোধ হয়। শব্দ করিস না। চা হলে পরে দেখব।' কুমুদ আর কৌতূহল চাপতে পারে না ; বন্ধ দরজাটাই একমনে দেখতে থাকে। কে জানে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ঘর থেকে ডাক শোনা গেল 'সরলা !' পরক্ষণেই দড়াম করে দরজা খুলে রামন্না তার সামনে এসে দাঁড়াল। কুমুদ কি করবে ভেবে না পেয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। 'স্যরি সরলা, একটু বাকি ছিল। শেষ করতেই হল' বলতে বলতে আমার দু কাঁধে হাত রেখে আবার বললে, 'সরলা, দেখো, এই বই আমার জীবনে পরিবর্তন আনবে। তুমি পড়লেই বুঝতে পারবে, সরলা, আজ থেকে তোমার স্বামী মস্ত বড় সাহিত্যিক হয়ে গেল।' এই বলে সে আমার কাঁধ দুটো জোরে চেপে ধরল। ঠিক তখনই সরলাদিদি এসে জিজ্ঞাসা করলে। 'লেখা শেষ হল ?' বলতেই বেচারা রামন্না চমকে পেছনে সরে গিয়ে আমাকে দেখে বলল, 'আরে, এ মেয়েটা কে ? আমারো মনে হচ্ছিল সরলা এত রোগা কি করে হল ? কি জানি ? ভাবলাম ভাইয়ের বাড়িতে কম খেতে পেয়ে বোধ হয় শুকিয়ে রোগা হয়ে গেছে······' বলতে বলতে নিজেই নিজেকে দোষী মেনে হাসতে লাগল। কিন্তু ঘটনাটা কুমুদের মনে রেশ রেখে গেল। একটা জিনিষ সে কিছুতেই ভুলতে পারল না। সেটা হচ্ছে রামন্নার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ। কে জানে কেন—শরীর শিউরে উঠলেও মনটা যেন পরিতৃপ্তির আবেশে সুখের ঘুমে ঢলে পড়েছিল। এই ছ'বছরে কুমুদ যতবার ওই বন্ধ দরজা দেখেছে ততবারই সেই সুখের অনুভবে তার চোখের পাতা জুড়ে এসেছে। এবারও চোখ বোঁজবার সময় সেই বিচিত্র সুখের আভায় তার মুখটা মুহূর্ত কয়েকের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখের কোল বেয়ে জল ঝরে পড়ে। কিন্তু এই জল-সুখের না দুঃখের তা সে জানে না। এবার সেই অন্তরঙ্গ আবেশে মগ্নতা নেই। তাই সে চমকে উঠে মুখ মুছে এদিকে-ওদিকে চায়। দরজা এখনও বন্ধ দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাতের বইটায় মন দেয়।

তিন

খাওয়া দাওয়া শেষ হল। সিনেমা যাবার কথা তো বন্ধ। লিখতে হবে বলে দরজা বন্ধ করার পর আর বাইরে যাওয়া যায় না। কাজেই ডালকুত্তার ভয়ে গর্তে সেঁদোনো খরগোশের মতো রামন্না টেবিল-চেয়ারের মাঝখানে ছটফট করতে লাগল। শেষে টেবিলে কনুইএর ভর দিয়ে দু'হাতে মাথা রেখে লোকে যেমন করে আকাশ দেখে তেমনি করে সামনের দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইল। দেওয়ালে সরলার ছবি। জ্ঞান ফিরে পাওয়া লোকের মতো সে ছবিটা মন দিয়ে দেখল। এ কী? সরলার ঠোঁট নড়ছে? আমি লিখতে পারছি না, আমার অবস্থা দেখে ও হাসছে? 'আমি কি করে লিখি? সরলা, তুমি সব জানো, তবু হাসছো?' বলতে বলতে রামন্না বোকা ছেলের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

স্ত্রীর ছবি দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলার কারণ যে ছিল না, তা নয়। ওর লেখার সব নিয়ম সরলার জানা ছিল। শুধু কি তাই? সরলা নিজেই প্রেরণা যোগাত।

রামন্না বলত, 'সরলা, আমায় লিখতে হবে।'

সরলা জিজ্ঞেস করত, 'গল্প, উপন্যাস না নাটক—কি লিখবে ভাবছো?

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, লিখবো বললেই কেরাণীর মতো হিসেব কষতে বসবো নাকি?' রামন্না কড়া সুরে বলে উঠত।

সরলা বলত, 'না, কাল তুমি যেটা বলেছিলে না, সেটার কথাই বলছি। উপন্যাস না নাটক লিখবে?'

এইবার রামন্নার মনে পড়ত কি লিখতে হবে। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এ কথা স্বীকার করা যায় না। তাই রাগ দেখিয়ে বলত, 'পাগলী, নাটক লিখব বলিনি বুঝি?'

সরলা বলত, 'তুমিই তো বলছিলে অভিনয়ে সব জিনিষ ফোটানো যায় না। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম উপন্যাস লিখবে কিনা।'

বিচিত্র ব্যাপার। আমি মোটেই বলিনি আমি নাটক লিখব। আবার নাটকে সব কথা ফোটাতে পারব না বলার এ কথাটাও মিথ্যে। তবু এইসব মিথ্যা ভাষণের দায় এড়িয়ে আমি বলতাম, 'কালই ঠিক করেছিলাম উপন্যাস লিখব। সেটাই আজ থেকে শুরু করব।'

'এ্যাঁ! উপন্যাসই লিখবে?' বলতে বলতে সরলার চোখে মুখে খুশির ঝলক দেখা দিত। আর তার উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে রামন্না স্থির করত সে উপন্যাসই লিখবে।

'সরলা, তুমিই ছিলে আমার প্রেরণা।' সরলার ছবির দিকে চেয়ে রামন্না স্বীকার করলে।

শুধু কি দু-এক বার? কত বার কত ভাবে যে সে সরলার সাহায্য পেত তা বলার নয়। যে অংশ লেখা হয়নি সেটা লেখা হয়ে গেছে বললে সরলা দমে যেত। তার পরামর্শ নিয়েই তো সে গল্প বদলে দিত। বইয়ের পরিণাম তো তার পরামর্শ মতোই লেখা হত। লেখা শেষ করে তাকে পুরো গল্পটা শোনালে সে একেবারে হাত তালি দিয়ে বলে উঠত, 'থাক, আর বলতে হবে না। শেষটা এইভাবেই হল তো?' 'বাঃ! আমার সঙ্গে থেকে তুমিও সাহিত্যিক হয়ে উঠলে যে' বলতে বলতে রামন্না তার পিঠ চাপড়ে নিজের ঘরে চলে আসত এবং তার পরামর্শ মতোই গল্পটা লিখে ফেলত। কিন্তু কখনও স্বীকার করত না যে সে সরলার কথা মেনে নিয়েছে। চা কিংবা খাবার খেতে বসে বলত, 'তুমি যেমনটি বলেছিলে না, দ্যাখো ঠিক সেইভাবেই গল্পটা শেষ করেছি।' বলে আবার তাকে পড়ে শোনাতো।

'সরলা, সেটা ঠকানো নয়, ছেলেমানুষি। আজ সেই ছেলেমানুষি করবারও কেউ নেই। আমি কি করে লিখি?' বলে সে ছবির কাছে নালিশ জানাল।

বসে বসে রামন্নার বিরক্তি ধরে গেল। ভাবল, এখন একলা সিনেমাই বা যাই কি করে? বাঃ, এ তো ভাল ফ্যাসাদে পড়া গেল। কিচ্ছু না। এই মেয়েটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়াই আমার ভুল হয়েছে। কি করা যায়? তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত। কোথায় যাবে? তাতে কি দুনিয়ার মুখ বন্ধ হবে? সবাই বলবে, বৌ মরতেই রামন্না বেচারী অনাথ মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিল।' এখন সবচেয়ে মুস্কিল এই যে মরণকাল পর্যন্ত কুমুদের সঙ্গ ছাড়ানো যাবে না। রামন্না ভাল ভাবেই জানে, কুমুদের সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না। সরলা শয্যাশায়ী হবার পর থেকেই লোকে কানাঘুযো আরম্ভ করেছিল। শেষে রামন্নার কানেও পেঁাছেছিল। কুমুদ আর তাকে নিয়ে লোকের সন্দেহ রামন্নাকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। 'সরলা, এও তোমারই ভুল।' রামন্না সরলার উদ্দেশে ছবির দিকে চেয়ে বলে ওঠে। তার শরীর কাঁপছিল। মনে হল ছবিটা বলছে, 'তুমি কুমুদকে বিয়ে করছো না কেন?' ছিঃ, আজ এ কথা মনে হল কেন? কুমুদকে বিয়ে? অসম্ভব। 'সরলা তুমি তো জানো, আমরা ছিলুম দুটি শরীরে একটি প্রাণের মতো। আজ তুমি দেহাতীত, তো কি হয়েছে? তুমি আমার মধ্যে মিশে আছো। যতদিন বাঁচবো ততদিন তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। এখানে অন্যের জন্যে জায়গা কই? এ অসম্ভব।' কুমুদকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। শুধু কি তাই? আরেকটা বিয়ে করা সম্ভব নয়। ভাবতে ভাবতে তার চোখে জল ভরে এল। ভাবনা দূর করবার আশায় আবার বলল, 'এ সব তোমারই ভুল।'

রামন্না জানতো তার মন শান্ত থাকলে সে এসব কথা বলত না। কেন না

অন্যের ওপর দোষারোপ করা দুর্বলতার লক্ষণ। অন্যভাবে দেখা যেতে পারে ভুলটা কার। আসলে কারুরই নয়, আপনা-আপনিই হয়ে যায়। মনের মতো হলেই ঠিক, নয়তো ভুল! 'ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া।' এই কথা কি গীতায় বলা হয়নি? ভগবান সব প্রাণীতে আছেন আর তিনিই সব প্রাণীকে নাচাচ্ছেন। এখানে ভগবানের কথা হচ্ছে না, তা হলেও এ তো অন্তরেরই এক শক্তি। 'প্রবালশোভা ইব পাদপানাং শৃঙ্গার চেষ্টা বিবিধা বভূবঃ।' কালিদাসের কথাটি কত সামঞ্জস্যপূর্ণ। গাছে কুঁড়ির ফুল হয়ে ফোটা যেমন স্বাভাবিক, প্রাণীদের শৃঙ্গার চেষ্টাও তেমনি স্বাভাবিক······ধ্যাৎ। এ সব আত্মপক্ষ সমর্থনের সান্ত্বনা! এও তো দুর্বলতার লক্ষণ—এই ভেবে রামন্না চিন্তাভাবনা ছেড়ে দিল। অন্যদিক থেকে দেখলেও দোষটা যে সরলারই সে কথা ছবির দিকে তাকিয়ে সে আবার ভাবতে শুরু করল। সেদিন যে ঘটনাটা ঘটে গেল, তার কোন মূল্য নেই। অবশ্য ঘটা উচিত ছিল না, তবু অকস্মাৎই ঘটে গেল। প্রায় দু-আড়াই বছর আগের ঘটনা। বেচারী! তিন বছর ধরে রোগে দুর্বল মরণাপন্ন স্ত্রীর ঘাড়ে দোষ চাপানো কি উচিত? দোষ চাপানোর কথা হচ্ছে না, কিন্তু যা ঘটে গেল সেটা তো বুঝতে হবে। এই ভেবে সে নিজেকেই সান্ত্বনা দিল। সেদিন সরলা বিছানার ওপর ঠেস দিয়ে বসেছিল, একপাশে কুমুদ বসে। রামন্না বাইরে থেকে ফিরেই খাটের অন্যদিকে বসতে বসতে বলেছিল, 'আজও জ্বর এসেছে নাকি?' মুচকি হেসে মাথা নাড়ল। তবু রামন্নার বিশ্বাস হল না। 'এখন জ্বর নেই তো,' বলতে বলতে সে সরলার গা ছুঁয়ে যাচাই করবার জন্যে চাদরের নীচে হাত বাড়াল। ঠিক ঐ সময় কুমুদও একই কারণে হাত বাড়িয়েছিল। দুজনের হাতে হাত ঠেকে গেল। ক্ষণিকের জন্য রামন্না অবাক হয়ে গেল। মনে হল, তার ছোঁয়া হাতটা ঘামছে। মুখ তুলে সে কুমুদকে দেখল, সেও ফ্যাকাশে মুখে রামন্নার দিকে চেয়ে আছে। রামন্না নিজেকে সামলে নিয়ে বলে 'না, ঘাম হচ্ছে'। সরলাকে বলল, 'তা জ্বরটা কি ঘাম দিয়ে ছাড়ল, না হয়ইনি?' সরলার মুখ মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অসুস্থ শরীরে তাকে আরো যেন রহস্যময়ী মনে হল। সে হেসে বলল, 'জ্বর নেই, আগেই তো বললাম।' তার মৃদু হাসি রামন্নাকে সংশয়ে ফেলল। সরলা কি বুঝতে পেরেছে? পলকের মধ্যে যে ঘটনা দুজনকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে সেই অকল্পনীয় ঘটনা—তার পরিণাম কি সরলা বুঝতে পেরে গেছে? বুঝেছিল নিশ্চয়। এ বিষয়ে ওর আগেই নজর রাখা উচিত ছিল, আমাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল। ও তা করেনি। তাই আজকের পরিণামের জন্য সেই দায়ী। 'বুঝেছ? তুমি যদি একটা কথা বলে দিতে তো আমি বেঁচে যেতাম।' এভাবেই সে ছবিকে বোঝায়।

বাইরে যাওয়া নেই, লেখাও আসছে না। চোখের সামনে সরলার ছবি, তাই

তার কথাও ভুলতে পারছে না। এখন কীই বা করে—ভাবতে ভাবতে বিরক্ত হয়ে রামপ্পা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। ঘড়ি দেখে। সাড়ে আটটা, এখন শুয়ে পড়াও যায় না। শোবার কথা মনে হতেই সে আবার ছবির দিকে চেয়ে ধীরভাবে বলল, 'সব দোষ তোমার।' তারপর আবার চেয়ারেই বসে পড়ে।

চার

কুমুদ একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে। বই এক জায়গায়, মন আরেক জায়গায়। সে ভাবতে লাগল, এখন কোথায় যাওয়া যায়? আজকাল কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। কোথাও গেলেই মেয়েরা নিজেদের আলোচনা বন্ধ করে স্মিতমুখে তাকে অভ্যর্থনা করে। কুমুদের বুঝতে দেরি হয় না যে তারা তাকে নিয়েই আলোচনা করছিল। এটাই স্বাভাবিক। এ আলোচনা বন্ধ করতে চাইলেও, এতো আর নিজের সম্পত্তি নয় যে বন্ধ করা যাবে। যাই হোক আপাততঃ বেরোবার ইচ্ছে ছিল না। তার ওপর সাড়ে আটটা বেজে গেছে। যেতে চাইলেও যাওয়া সম্ভব নয়। খাওয়ার পাট চুকে গেছে, এখন শোয়া বাকী। শোবার কথা ভাবতেই কুমুদের শরীর কেঁপে উঠল। মুখে ঘামের বিন্দু! দু বছর ধরে রামপ্পা আর কুমুদ একসঙ্গে শুচ্ছে। কি প্রবঞ্চণা! বেচারী! সরলাদিদি তো শয্যাশায়ী। তার পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব ছিল না। আচমকা একদিন তার হাতে রামপ্পার হাত ঠেকে যাওয়ার পর দুজনের অজ্ঞাতেই এই ঘটনা ঘটে গেল। প্রথমে তো কুমুদ বুঝতেই পারেনি এ কী আর কী করে হল। সে তখন সুখস্বপ্নে মগ্ন। হাতে হাত ছুঁয়ে যেতে যে বিহ্বলতা এসেছিল তার ঘোর এখনও কাটেনি। সে আবার কেঁপে ওঠে। রামপ্পার জন্য সেই প্রতীক্ষা, ঘুমের আমেজের সেই সুখ কই? আজ রামপ্পার পাশে শুয়ে বিনিদ্ররাত জাগার মতো দুঃখই বা কী আছে? তবু এই দুঃখের দিনেও কমুদ সেই-সব দিনের মধুর-স্মৃতি ভুলতে পারেনি। সে কথা মনে পড়লে তার সারা গা শিউরে ওঠে। দুটি হাতের প্রথম স্পর্শের রোমাঞ্চকর অনুভূতি! তখন কুমুদের মনে হয়েছিল এই অনুভবের পর মরে গেলেও তার জন্ম সার্থক। জীবন-মৃত্যু? সেই মুহূর্তে তার বোধই ছিল না, সে জীবিত না মৃত। শরীর পুলকিত, উরুদুটো কাঁপছিল। বুকটা ধ্বক ধ্বক করছিল, জিভে জলস্বাদ। আর যে নতুন অনুভূতির লজ্জা এসে তাকে গ্রাস করছিল তা হল—তার স্তনদুটিতে এক অসহ্য সুখকর বেদনা; সেদিন থেকেই সে রামপ্পার হয়ে গিয়েছিল, দেহে নয়, মনে। যে

শুধু করস্পর্শে শরীরে নব চেতনা এনে দিয়েছে, তাকে দেহ সমর্পণ করা কঠিন নয়।

কখনও কখনও কুমুদ অবাক হয়ে যায়। এ সব কি করে হল? সরলাদিদি শয্যাশায়ী ও দুর্বল বলে, না আমি এ বাড়িতে থাকার জন্যে, না কি শুধু একটু হাতের ছোঁয়ায়? কিংবা কোন অকল্পিত কারণে সরলাদিদির ঘরে আসায় এবং হাতে হাত ঠেকায় এই অঘটন ঘটল? কিন্তু এই সব আকস্মিক ঘটনাও তো ঘটল নিয়তির মতো নির্দিষ্ট নিয়মে। কুমুদ মনে করত রামন্নার মুখে শোনা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার গল্পের মতো তার ব্যাপারটাও একটা গল্প। কোথায় রাজধানীর রাজা, আর কোথায় অরণ্যের মেয়ে? যখন কণ্ব মুনি আশ্রমে ছিলেন না, তখনই ঐ রাজা কেন এল? এ সব দেখে মনে হয়, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনে দৈবের হাত ছিল। তার মতো অনাথ মেয়ের জন্যে কি এটা দৈবের প্রভাব নয়? তার আর রামন্নার মধ্যে সহজ প্রেমই বা অঙ্কুরিত হবে কেন? পনেরো-ষোলো বছরের কুমুদের পক্ষে এই ধাঁধার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। তবু তার মনে ঐ ব্যাপারটা আলোড়ন তুলেছিল। ধীরে ধীরে প্রেমের সঞ্চার হল তাদের দুজনের মধ্যে। তার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখে সরলা মাঝে মাঝে রামন্নাকে বলত, 'বেচারী, আমার সঙ্গে ঘরে বসে বসে মেয়েটা যেন হাঁফিয়ে পড়েছে। মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। ওকে মাঝে মাঝে বাইরে বেড়িয়ে আনো না গো।' শুনে কুমুদ লজ্জা পেত। রামন্নার উৎসাহ নেই দেখে সে আরোই মাটিতে মিশে যেত। রামন্না শুধু বলত, 'আচ্ছা'।

রামন্নার সঙ্গে প্রথমবার বেড়াতে যাওয়াও অবিস্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু কি হল? ঘর থেকে বেরিয়ে আবার ঘরে ফেরা পর্যন্ত সে চুপ করেই রইল। 'সরলা তোমার এই মেয়েটা হয় কালা, নয় বোবা, জান তো?' রামন্নার কথা শেষ হতেই সে নিজের ঘরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। সবটাই যেন গল্প। 'ওকে একটু বেড়িয়ে আনতে বললাম। আর তুমি মেয়েটাকে কাঁদিয়ে ছাড়লে। ভালো কাজই করেছ!' সরলার কথায় রামন্না কুমুদের ঘরে এসে দাঁড়াল। 'আরে! সত্যি সত্যি কাঁদছো না কি?' বলে তার মুখের দিকে তাকাল। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য পিঠে হাত বোলাল। দুঃখ যতই হোক না কেন, সে পুলকে শিউরে উঠল। চোখের জল তবু বন্ধ হল না। তখন রামন্না 'চোখ মুছে নিচে চলো' বলে চোখ মোছাবার জন্যে তার আঁচলে হাত দিতেই সে লজ্জায় দূরে সরে গেল। তবু হাত ঠেকে আবারও, এবার রামন্নার হাত তার বুক ছুঁয়ে গেল। তখন তো কুমুদের পা অসাড়। কি যে হল কিছুই জানা নেই। জ্ঞান ছিল, না ছিল না তাও মনে নেই। জ্ঞান ফিরলে দেখল রামন্না তাকে পালঙ্কে বসিয়ে পাশে বসে আছে, হাতে জলপাত্র।

বেচারী! সরলার দোষ কী? কুমুদের শরীর ভাল নেই দেখে সে তাকে রামন্নার সঙ্গে বেড়াতে, সিনেমা দেখতে আর বই পড়তে উৎসাহিত করত। সে বার বার বলত, 'আমি তো বিছানা নিয়েছি, তুই কেন চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী

হয়ে ফ্যাকাশে মেরে যাচ্ছিস? এক-আধ ঘণ্টা ঘুরে আয়। আমি এত শিগ্‌গির মরছি না।' যাইহোক কুমুদর রামন্নার সঙ্গে বেড়াবার সুযোগ তো পেল কিন্তু তাতে তার কোন লাভ হল না। এক অদ্ভুত বেদনা কুমুদকে আচ্ছন্ন করে রাখত। প্রথম দিকে রামন্না কাছে না এলে খারাপ লাগত, এখন কাছে এলেই অস্বস্তি বোধ হয়। কখনো কখনো তার ইচ্ছে করত রামন্না একেবারে পাশটিতে দাঁড়িয়ে ওর গাল দুটো নিজের দুহাতে চেপে ধরে, কখনো ইচ্ছে করত ওর এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দিতে কিংবা তার লেখার সময় তার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের গালে চেপে ধরতে। এ সব ইচ্ছেকে অনেক চেষ্টা করে সামলাতে হত। সামলাতে সামলাতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ত।

একদিন সে আর রামন্না সরলার পাশে বসে। একটু পরে সরলাদিদি ঘুমিয়ে পড়লে রামন্না চাপা স্বরে বলল, 'আস্তে আস্তে আমার ঘরে চলে এস।' সরলার যাতে ঘুম না ভাঙে তাই হয়তো রামন্না নিচু গলায় কথা বলেছিল কিন্তু সেই মৃদু কণ্ঠ শুনে সে রোমাঞ্চিত হয়ে নিজের অজান্তেই পৌঁছে গেল রামন্নার ঘরে। রামন্না বোধ হয় বিস্মিত হয়েছিল।

সে প্রশ্ন করল, 'পড়বার জন্য কোন বই চাই না কি?

'হুঁ।'

'কোনটা চাই, নিজেই দেখে বের করে নাও।'

কুমুদ বইয়ের আলমারি খুলে বই দেখতে লাগল। বই দেখে, বের করে, বাছাই করার শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

রামন্না প্রশ্ন করে, 'কি, কিছু পেলে না? আচ্ছা আমিই বার করে দিচ্ছি। বলতে বলতে সে আলমারির কাছে এল। আলমারির দু পাল্লার মাঝে কুমুদ দাঁড়িয়ে, রামন্নার জন্য জায়গা ছাড়তে হবে। কিন্তু এর মধ্যেই রামন্না পাশে এসে পড়াতে তার পা অবশ হয়ে গেল। সে নড়তে পারল না, পিছন ফিরে রামন্নাকে দেখতেও পারল না। কিন্তু রামন্নার উষ্ণ নিঃশ্বাস তার কাঁধে এসে ঠেকছে। সে একেবারে তার পিছনে, খুব কাছে একটু পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে—চোখ খোলা থাকলেও এসব কুমুদের চোখে পড়ল না। পিছনের তপ্ত নিঃশ্বাস শুধু তার কাঁধ নয়, হৃদয়েও জ্বালা ধরাচ্ছিল। সে সহ্য করতে পারছিল না, দম বন্ধ হয়ে এল যেন। জলে ডোবা মানুষ যেমন ওপরে এসে নিঃশ্বাস নেবার জন্য ছটফটিয়ে ওঠে তেমনি ভাবে কুমুদও নিঃশ্বাস নেবার জন্য বইয়ের দিকে মুখ ঘোরাল।

রামন্না বলল, 'এইটা চাই?'

সে মুখ খুলল কিন্তু শব্দ বের হল না। রামন্নার মুখের দিকে অবাক চোখে চেয়ে রইল। রামন্না যেন চমকে উঠল কিংবা ভয় পেল। তার মুখের রঙও গেল বদলে। কুমুদ বুঝতে পারল তাতে অবাক হবার বা ভয় পাবার চিহ্ন নেই।

ইতিমধ্যে রামপ্পার হাত দুটো তাকে বলিষ্ঠ বাঁধনে বেঁধে ফেলেছিল। তার ঠোঁটের ওপর রামপ্পার ঠোঁট। শ্বাসরুদ্ধকারী দীর্ঘ সময় হলেও কুমুদের প্রাণে চেতনা সঞ্চার হল।

পাঁচ

লেখা যায় না, শোনা যায় না। শুধু কি তাই? সে সব দিনের কথা ভাবাও যায় না। কে জানে কবে সে পুরোনো গল্প হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, মাত্র তিন বছর আগেকার কথা। তখন লেখবার জন্যে শুধু অন্তরের প্রেরণার দরকার হত না। নতুন অভ্যাসের মতো লিখতে ভালও লাগত। এমনকি পত্রপত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লেখবার (যদি তার জন্য আন্তরিক প্রেরণার দরকার হয় না) উৎসাহও ছিল। কারণ লিখতে লিখতে শরীর-মন ক্লান্তিতে ভরে গেলেও সরলার পাশে শোবার আশায় সে লুব্ধ হয়ে উঠত। লোভী শিশুর মতো সেও একটা আশা নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত লিখে যেত। তারপর চেয়ার থেকে উঠে ক্লান্তিতে ও চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে সে যখন মাঝরাতে এসে বিছানা হাতড়াতো, (বেচারী সরলা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে) তখন আধ ঘুমের মধ্যেই সরলা জিজ্ঞেস করত, 'লেখা শেষ হল?' তার মনে হত, যেন সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। আনন্দে চোখের ঘুম উড়ে যেত।

'লেখা শেষ হল?' তার শোবার জন্য সরলা নিজের একটু জায়গা ছেড়ে সরতে সরতে জিজ্ঞেস করত।

'হুঁ।'

'খুব ঘুম পাছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কথা কানে যাচ্ছে? এখনো কি এ জগতে ফেরোনি?'

'শুনেছি। শেষ হয়েছে বলার জন্যে 'হুঁ' বললাম তো' বলতে বলতে সেও পা ছড়িয়ে দিত।

'গল্পটা বেশ জমেছে তো?'

'গল্প নয়, পত্রিকার জন্যে একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম।'

'ওহো। এই লেখার জন্যে মাঝরাত পর্যন্ত তোমার মাথায় ভূত চেপেছিল?

'কেন? এ সবই তো লেখা উচিত। শীগগির পয়সা মেলে।'

'হ্যাঃ, কার পয়সা দরকার ?'

'কার মানে ? আমার।'

'ওমা—তোমার আবার এই বুদ্ধি কবে থেকে হল গো ?'

'আমার মানে—আমার বৌ আর বাচ্চার জন্যে, বুঝলে ?'

'ওদের দরকারের কথা তোমাকে কে বলেছে ?'

'বলতে হবে কেন ? বৌ-বাচ্চা যদি সুখী না হয় তবে স্বামী লিখবে কেন ? কথা বলছ না যে।'

'আরে লেখা কি তোমার আমার ইচ্ছেয় হয় ? ওতো ভগবান জন্মাবার সময়ই কপালে লিখে দেন।'

'তার মানে তুমি সুখী, এই তো ?'

'কেন হব না ? লিখলে তুমি সুখী হও আর তুমি সুখী হলেই আমি সুখ পাই।'

'আচ্ছা, তার মানে, কৃষ্ণ যখন অর্জুনকে গীতা উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন তুমি লুকিয়ে তাঁর রথের তলায় বসেছিলে, কেমন ! হাঃ হাঃ।'

এ কথায় সরলা হাই তুলে বলত, 'এবার ঘুম পাচ্ছে। তুমিও শুয়ে পড়।' তার কথা শেষ হবার আগেই রামপ্পার নাক ডাকতে শুরু করত। 'আরে, রাত দুপুরে আমি বকে মরছি আর উনি ঘুমে কাদা। কে জানে কখন ঘুমোলো। সবসময় আমার কাঁচা ঘুমটি ভাঙিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়বে।' পরদিন যখন সরলা এ প্রসঙ্গ তুলে আপত্তি জানাত তখন রামপ্পারও ভাল লাগত। ঠাট্টা করে বলত, 'তোমার অভ্যেস ঠিক করে দিচ্ছি।' এতে সরলার 'কি অভ্যেস ?' প্রশ্নের উত্তরে সে বলত, 'এবার যখন ছেলেপুলে হবে তখন রাত জাগতে হবে তো'—এ সব কথা কখনো শেষ হত না। সরলা রাগের ভান করে তার মুখে হাত চাপা দিত। মুখ বন্ধ করলে কি হবে ? রামপ্পা দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরত।

একবার তো সরলাই তার সাহিত্যের জটিল সমস্যাকে সহজ করে দিয়েছিল। তখন সে একটা নাটক লিখছিল। নাটক না—কী যেন, হঁ্যা 'আদিমায়া' নামে একটা উপন্যাস লিখছিল। তিন ভাইয়েব গল্প, একটি প্রতিবেশিনী মেয়ে ও তারা একসঙ্গে বড় হল, পরিণামে তার গল্প আধুনিক দ্রৌপদীর গল্প হয়ে দাঁড়াবে আর কী। সমাজে হৈ হৈ পড়ে যাবে। এসব ভেবে সে একটু গর্ব করেই গল্পটা সরলাকে শুনিয়েছিল।

সে বলেছিল, 'লেখা শুরু করে দাও তো, পরে দেখা যাবে।' রামপ্পা হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'দেখবার কি আছে ? আমার জীবন বীমা করার পর উপন্যাস ছাড়তে হবে।'

'ওতে কি এমন কথা আছে ?'

'কী এমন কথা আছে ? যখন ছেলে হবে তখন তার বাবা কে হবে ?'

'আঃ ছাড়ো তো। তুমি উপন্যাস লিখছো না ক্লাবে আড্ডা মারছো?'

আলোচনার এখানেই ইতি। উপন্যাস লেখা আরম্ভ হল। রামপ্পা শুরুতে যেমন ভেবেছিল, গল্পটা সেভাবেই এগোলো কিন্তু শেষের দিকে তার মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। আমাদের সমাজে তিনজনের সঙ্গে প্রেম করা মেয়ের অবস্থা কি হয়? যদি আত্মহত্যা করে তো দ্রৌপদীর ব্যঞ্জনা অর্থহীন। আত্মহত্যা না করলে সমাজে তার গৌরব নেই। তাহলে? রামপ্পা ভেবে পেল না গল্পটা কিভাবে শেষ করা উচিত। সে শেষ পাতাটা লেখবার অনেক চেষ্টা করল কিন্তু সমাধানের কোন উপায় তার মাথায় এল না। তিন চার ঘন্টা মাথা ঘামিয়ে শেষে প্রায় রাত দুটোর সময় নিরুপায় হয়ে ক্লান্ত শরীরে শুতে গেল।

'লেখা শেষ হল?'

পরামর্শদাত্রী সরলার মুখে একথা শুনে রামপ্পার রাগ হয়ে গেল। বলল, 'হুঃ শেষ হয়ে গেল! এ তোমার রান্না করা কিনা। একটা বাঁধা সময় ধরে ফুটিয়ে নিলেই হয়ে গেল।

সরলা বলল, 'আরে! আমি কি জানি? শুধু শেষটা বাকি ছিল, তুমিই তো বললে 'শেষ করতে হবে'। তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'শুধু শেষটা মানে? সমস্ত সৌন্দর্য তো শেষপাতাতেই। সেটা অনেক ভেবেচিন্তে লিখতে হয়। আচ্ছা, অনেক রাত হল, এবার ঘুমিয়ে পড়া যাক।'

সরলা হাই তুলে বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে বটে তবু জিজ্ঞেস করছি শুধু একটা কথা জানবার জন্যে। তোমার গল্পের মেয়েটা শেষ পর্যন্ত কি করল? তোমার লেখা শেষ হয়েছে ভেবেই বলছিলাম।'

রামপ্পা নিজেকে সামলাতে পারল না। বলল, 'এটুকু শুনেই তোমার যদি ঘুম আসে তো শোনো। শেষে মেয়েটা বিষ খেয়ে মরল।'

'এ্যাঁ, সে কি! একটা প্রাণ বেঘোরে গেল?'

রামপ্পা অবাক। সরলার কথায় মনে হল তার চোখে জল আসতে বুঝি দেরি নেই।

সে কথা শেষ করবার জন্য বলল, 'উপন্যাসের একটা চরিত্র তো। ও থাকলেই বা কী, মরে গেলেই বা কী?'

'উপন্যাসের চরিত্র হলেই বা। অনর্থক মরবে কেন? কোন বিপদ নেই, অসুখ নেই।'

রামপ্পা বিরক্ত হয়ে হাই তুলে বলল, 'পাপ করেছিল, তাই মরেছে।'

'পাপ করেছিল? তা আমি কি করে জানব? তুমি যখন গল্পটা বলেছিলে তখন তো বলনি সে পাপ করেছিল।'

রামপ্পার ঘুম ছুটে গেল। সে উঠে বসে রাগ করে বলল, 'তিনজনের সঙ্গে প্রেম করা পাপ নয়?'

'কি বললে ? ভালবাসার জন্যে যে মেয়েটা জন্মাল সে ভালবাসলে পাপ হয় ?'

স্ত্রীর বোকামি দেখে রামন্না একটু তিরস্কারের সুরে বলে, 'একজনের সঙ্গে থাকে তো বিয়ে হয়, একজনের চেয়ে বেশি হলে ব্যভিচার হবে না ? ব্যভিচার কি পাপ নয় ?

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে ব্যভিচার না করে ভালবাসা যায় না।'

'যাক গে, তুমি এসব কথা বুঝবে না।'

'তুমি বলতে চাইছ, পুরুষের জন্যে প্রেম ও ব্যভিচার একই জিনিষ। আমার মতো মেয়ে এটা কি করে বুঝবে।'

রামন্না রেগে গেল। প্রেম এক জিনিষ, ব্যভিচার আর এক। এ কথায় তার মনে হল, এর মধ্যে কোন গূঢ় তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। সে আরো ভাবল তার গল্পটা ওর মতো করেই লেখা উচিত। সকাল পর্যন্ত ভাবল। বিছানা থেকে উঠে চা খেয়ে সরলার সঙ্গে কোন কথা না বলেই নিজের ঘরে গিয়ে লেখা শুরু করে দিল। গোটা গল্পটাই সে বদলে ফেলল, কিন্তু আট দিন ধরে সরলার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলল না। তার মনেও একটু ব্যথা লেগেছিল। শেষে উপন্যাসটি শেষ হল। শেষ করেই রামন্না সরলাকে বলল, 'দ্যাখো সরলা-উপন্যাসটা শেষ হয়ে গেছে।'

সরলা উত্তর দিল না।

রামন্না অপরাধীর মতো বলল, 'তুমিই তো বলেছিলে গল্পটার শেষ কিভাবে হল জানতে চাও, তাই শেষ হতেই বলতে এসেছি।'

'আমি কি করব ? আমি তো কলেজের মুখ না দেখা একটা সামান্য মেয়ে। এত বড় বড় বইয়ের আলোচনা করব কি করে ?'

'তুমি কি ভেবেছ, আমি গোটা উপন্যাসটা পড়ে শোনাতে এসেছি ?'

'না হলে আমাকে বলতে এলে কেন ?'

'উপন্যাস শেষ হয়ে গেছে। সে তুমি বুঝতেও পারবে না।' ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'আমি তোমাকে পড়ে শোনাতেও আসিনি, ভূমিকা লিখেছি, সেইটা শোনো।'

'ভূমিকা ? তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ?

'শোনোই না—' বলে সে পড়তে শুরু করে। প্রস্তাবনায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারের শেষে লেখা ছিল, 'এই উপন্যাস এখন যে রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তার সব কৃতিত্বই অন্য একজনের। তিনি আমাকে প্রথমবারের পরিকল্পিত উপন্যাসটিকে নবরূপে লেখবার পরামর্শ বলে দেন। সেইভাবেই লিখেছি এবং লেখার পর তৃপ্তি পেয়েছি। তাই শেষে তাঁকে অর্থাৎ আমার সুখ দুঃখের অংশভাগিনী, আমার সব ভাল-মন্দকে নিজের সহিষ্ণুতা দিয়ে ত্রুটিমুক্ত করে সুনিশ্চিত পথ দেখাবার জন্য যিনি হাত ধরেছেন, আমার সেই সহধর্মিনীকে—'

সরলা কৃতজ্ঞতাস্বীকারের শেষটুকু আর পড়তে দিল না। ওটা আমাকে দাও তো, একী পাগলামী' বলতে বলতে কাগজটা তার হাত থেকে টানতে গেলে রামন্না সরলাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

পুরনো সেসব দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। কেন? রামপ্পা সরলার ছবির দিকে এমনভাবে চেয়েছিল যেন ছবি কোন উত্তর দেবে। দেখতে দেখতে একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। ঐ ছবির জন্য সরলার ফটো তোলার কথা। ফটো তোলা সরলার কাছে প্রাণান্তকর। সদা হাস্যমুখী সরলা ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই ঘাবড়ে যেত। সেই ভাব লুকোবার জন্যে জোর করে গম্ভীর হবার ভান করত, তাতে আসল-নকল দুটো ভাব মিলেমিশে একটা বোকা-বোকা ছাপ পড়ত মুখে। ছবিতে সেই ভাব দেখে হাসি চাপতে পারল না রামপ্পা। এই বোকা-বোকা ভাবের জন্যে সরলাকে শিশুর মতো মিষ্টি লাগছে। সরলার সহজ-সরল রূপ রামপ্পার মন থেকে মুছে যায়নি! সর্বাঙ্গসুন্দরী না হলেও সরলাকে দেখতে ভাল লাগত। কথা বলবার সময় একটু ঠোঁট ফুলিয়ে কথা বলা ছিল তার মুদ্রাদোষ। রামপ্পা ঠাট্টা করে বলত, 'সব সময়ে উনুনের সামনে বসে উনুনে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তোমার ঠোঁট দুটো এমন হয়ে গেছে।' কথাটা ঠাট্টা করে বললেও কথা বলবার সময়েই সরলাকে বেশি আকর্ষণীয়া মনে হত। রাতে বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে কথা বলবার সময়ও রামপ্পা যেন সেই মুখটিই দেখতে পেত। তাই বোধ হয় তার কথায় রামপ্পা সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেত?

রামপ্পা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কত কথা মনে পড়ছে! না, এসব কথা তাকে ভাবতে হয়না আপনিই মনে পড়ে। যে কোন বিষয় হোক না কেন, তার কথা, তার রাগ, তার মুখভঙ্গি, হাসি—সব। রামপ্পা নিজেকে সামলে নিল। তার মন এখন হালকা। একটা কথা মনে হল, না, মনে হচ্ছে; সবটা জানলে লেখায় মন বসতে পারে। এই বিরক্তি দূর হবে। ভাববার জন্যে রামপ্পা চোখ বন্ধ করল। সব যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অবাক হয়ে দেখল সরলার স্মৃতি বলতে তার কথা তার রাগ, তার মুখভঙ্গি, তার হাসি এই তো মনে পড়ে। ছ'বছর সরস দাম্পত্য-জীবন যাপনের পরেও সরলার স্মৃতি এভাবে তাকে কষ্ট দেয়নি। তবু এ কথা মনে হওয়ায় সে যেন একটু সান্ত্বনা পেল। কিন্তু কুমুদের কথা মনে পড়লে অন্য প্রসঙ্গ মনে আসে না। সরলা যদি তার কাছে আনন্দস্বরূপা হয়, কুমুদ কি শুধুই ভোগের বস্তু? ছিঃ এ কিরকম চিন্তা! যদি সত্যি না হয়? রামপ্পা বুঝতে পারল এ শুধু এক ধরনের ভাবনার ফসল। তিন বছর ধরে যা বাস্তব, তাকে সত্য বলে স্বীকার না করাই তো পাগলামি। এ কথা সত্যি হলে সরলাকে সে ঘৃণা করত, ভালবাসত না। রামপ্পা ছবির দিকে তাকায়। মনে হল সরলা কিছু বলছে। প্রেম এক জিনিষ, ব্যভিচার আর এক। হ্যাঁ ও ঠোঁট ফুলিয়েছে। 'সরলা, আমার গল্পের সমস্যা সমাধান করতে এসেছ?' বলে সে ছবির দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইল, যেন উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ছয়

সত্যি কথা বলতে কি কুমুদের আজ সিনেমা যাবার ইচ্ছে ছিল। দু'দিন ধরে সে অবসর খুঁজছে। দুদিন আগে তার যাবার ইচ্ছে হয়েছিল, কথাটা মুখ ফুটে রামন্নাকে জানিয়েও ছিল কিন্তু সে 'চলো' না বলে 'দেখি' বলে এড়িয়ে যায়। একটু দুঃখও পেয়েছিল। মাত্র তিন মাস আগে সরলা মারা গেছে। তাই হয়তো রামন্নার সঙ্কোচ হচ্ছে ভেবে সে আর জোর করেনি। আজও সেই আশাতেই সে রাতের রান্না তাড়াতাড়ি সেরে রেখেছিল। কিন্তু রামন্নার মুখ থেকে এ বিষয়ে একটি কথাও শোনা গেল না। আবার কি তাকেই বলতে হবে নাকি? রোজ রোজ বলতে ভাল লাগে? আবার মনও মানে না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রসঙ্গ তুললেও রামন্না কোন উৎসাহ দেখাল না। কথাটা যেন কানেই যায়নি। শেষটায় হতাশ হয়েই সে যখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে, তখন রামন্না বলল, 'সিনেমা যাবে?' কিন্তু তার বিরক্ত কন্ঠস্বর, বিরস মুখ, হতাশ নিঃশ্বাস সবই কুমুদের অসহ্য মনে হল। সেও কোন আগ্রহ না দেখিয়ে ছোট্ট 'হুঁ' বলে চুপ করে রইল। তখনও রামন্না যদি বলত 'চলো' তা হলেই সব কিছু ভুলে সে যাবার জন্যে লাফিয়ে উঠত। কিন্তু রামন্না বললে, 'সিনেমা না হলে অন্য কোথাও চলো।' তার কথায় বোঝা গেল সে কেবল তাকে এড়াবার জন্যেই ঘর থেকে বেরোতে রাজী হয়েছে। তিক্ততায় মনটা ভরে গেল। কোথায় যেন একটা ভর্ৎসনা মিশে আছে। উত্তর দিতে গেলে পাছে তিক্ততা বেড়ে যায় এই ভয়ে সে কথা বলল না। রামন্না অনেক কথা বলার পর সে একটা ছোট্ট হাই তুলে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করল। ভাবলে রামন্না যা বোঝবার বুঝে নিক। শেষে রামন্না লেখবার নাম করে সেখান থেকে সরে পড়ল। মনস্থির করবার জন্যে কুমুদও এক মুহূর্ত চোখ বুঁজে ভাবল। রামন্নার সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা কুমুদের মনে যত প্রশ্নই মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক না কেন রামন্না সামনে থেকে সরে গেলেই রোদ না পাওয়া লতার মতো পাণ্ডুর অবসন্নতা তাকে গ্রাস করে ফেলত। একই অনুভবের পৌনঃপুনিকতা তাকে অবসন্ন করে তোলে। রামন্না ঘরে ঢুকে তার চোখের আড়ালে চলে যেতেই তার উতলা মনও তার পিছনে ছুটে গেল। ইচ্ছে হল তাকে ছুটে গিয়ে ধরে, দরকার হলে পায়ে ধরে নিজের দোষ স্বীকার করে (তার দোষই বা কী, তবু) তাকে ভুলিয়ে ভাঙিয়ে সিনেমায় নিয়ে যায়। সেখানে অন্ধকারে তার স্পর্শ সুখে ঘুমিয়ে পড়ে। অবশ্য ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই বিবেক বুদ্ধি এসে সুখচিন্তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বে সে নিজেই হতচকিত। বিবেকবুদ্ধি বললে 'এ আত্মদ্রোহ'। বেচারা মন, সুখ দুঃখের ফেরে পড়ে ক্লান্ত হয়ে উঠল। কুমুদ আপন মনেই বলে, 'এমন করে সিনেমা দেখার দরকারই বা কী?'

২

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেছে এক আধ ঘণ্টা আগে। এখন কুমুদ শান্ত হয়ে স্থির চিত্তে ভাবতে পারে। সে মানব মনের অতলান্ত রহস্যের সঙ্গে পরিচিত নয় কিন্তু কিছু কিছু বোঝবার শক্তি তার হয়েছে। কখনও কখনও দুটো পরস্পর বিরোধী অনুভূতি দেখে সে অবাক হয়ে যেত। আজকের ব্যাপারটা কুমুদকে বড় আশ্চর্য করে দিয়েছে। আগে রামপ্পার মুখে 'সিনেমা যাবে' শুনলেই সে আত্মহারা হয়ে যেত, তার অন্তর্নিহিত অর্থ কি বা আদপেই কোন অর্থ আছে কিনা সে কথা তলিয়ে ভেবে দেখা দূরে থাক সে চিন্তা পর্যন্ত করতে পারত না। তখন 'সিনেমা চলো' শুনে যে উৎসাহের সঙ্গে তৈরী হতো, তেমনি 'প্রাণ দাও' বললেও বোধ হয় সেই উৎসাহের সঙ্গেই তৈরী হতো। সময়ের দিক থেকে দেখলে তো মোটে দুতিন বছর কিন্তু মন দিয়ে দেখলে মনে হয় বুঝি হাজার বছর আগেকার কথা।

হাজার বছর কি? হাজার দিন আগের কথাও নয়। এখনও তিন বছর পুরো হয়নি, অর্থাৎ এখনও দিন হাজার সংখ্যা পেরোয়নি—তবু তার স্পষ্ট মনে আছে। এক রাতে শোবার আগে রামপ্পার ঘরে যাওয়া, বইয়ের আলমারিতে বই খোঁজা, সেখানে জোর করে তাকে জড়িয়ে ধরে রামপ্পার চুমু খাওয়া, তার জ্ঞান ফিরে আসা, শরীর ঘামে ভিজে যাওয়া, লজ্জায় সে ঘর থেকে পালিয়ে আসা। হ্যাঁ, সেইরাতে ঘরে ফিরেই তার মনে ভয় ও সুখের একটা মিশ্র অনুভূতি জাগল। সে সময় সে ব্যাপারটা ঠিক বুঝেছিল কি না কে জানে—তবে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার কথাটা মনে পড়লেই গায়ে যেন কাঁটা দিত। মুখে ছড়িয়ে পড়ত লজ্জার আভা। ছুটে এসে সে বিছানায় বসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়েছিল। আলোটাও নেভায় নি, ভয় করছিল রামপ্পা যদি এসে পড়ে। আর একটু পরে তার আসার কোন লক্ষণ না দেখে সে হতাশই হয়েছিল। পা টেনে টেনে দরজা পর্যন্ত গিয়েও দরজা খুলে বাইরে দেখবার সাহস হয় নি। শয্যায় ফিরে যেতে যেতেও ঘুরে দেখেছিল কোথাও দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে না তো! মন আর দেহ যেন দোলনায় দুলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কখন যে সে ঘুমে ঢলে পড়েছিল তাও জানে না। সকালে ঘুম ভাঙতেই ভয়চকিত চোখে চারদিকে চেয়ে দেখেছিল সবই ঠিকঠাক রয়েছে। রামপ্পার আসার কোন চিহ্নই নেই।

রামপ্পার সঙ্গে দেখা হওয়া কি তাকে অনুভবে পাবার মতো নিশ্চিত কোন ধারণা না থাকায় ঐ স্মৃতি দ্বিতীয় রাতে কুমুদকে আর বেশী জ্বালায় নি? কিন্তু সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে ঘরের কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিল সে কথাও সত্যি। এত কাজ সে আগে কখনও করেনি। তবু কাজ করে তার ভালই লেগেছিল, ক্লান্তি আসে নি। সরলা শয্যাশায়ী হবার পর রান্নাঘরের ভার পড়েছিল কুমুদের ওপর। অন্য কাজের জন্যে চাকর আর ঝাড়ামোছার কাজের জন্যে একটা ঝিও ছিল তবু সেদিন কুমুদ রান্না করা ছাড়াও ঘরে অন্য কাজ খুঁজে বার করেছিল।

তখন সরলাদিদি বলেছিল, 'ও কুমুদ, আমার কাছে চুপ করে একটু বোস দেখি।'

'কেউ দেখে ফেললে কি বলবে?'

সরলা কুমুদের মন না বুঝে বলেছিল, 'দেখবার কে আছে? আর বলবেই বা কেন?'

সেও ঠাট্টা করে বলেছিল, 'দেখবে কে মানে? স্ত্রী শয্যাশায়ী হবার পর থেকে একটা ঘরও গোছানো নেই, একটা কাপড়ও পরিষ্কার নেই। এ সব কথা শুনলে ভাল লাগবে?'

'বাজে কথা ছাড় তো; তোকে কি কাজ করাবার জন্যে এখানে এনেছি?'

'বাঃ, কী বলছ দিদি? কেউ তো বলছে না যে কাজ করাবার জন্যে এনেছো। কিন্তু তুমি যখন ভাল ছিলে তখন ঘরদোর কেমন পরিষ্কার ছিল, সে কি আমি দেখিনি? আমাকে এনে খাইয়ে পরিয়ে চুপচাপ বসিয়ে রাখলে লোকে তোমাকেই বলবে যে বোনকে কিছু শেখায়নি। ঘরদোর অগোছাল দেখলে লোকে কি বলতে ছাড়বে? কুমুদের সব চিন্তা ভাবনা—এই ভাবেই প্রকাশ পেল।

শুনে সরলা কী খুশিই না হয়েছিল। নিজেকে সামলাতে পারে নি। তার চোখ জলে ভরে এসেছিল। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে কথা বেরোচ্ছিল না। হাতের ইশারায় তাকে বিছানার কাছে ডেকেছিল। সে যদি তখন তার কাছে যেত তাহলে তারও অশ্রু বাধা মানত না। তাই 'একটু কাজ বাকী আছে; সেরেসুরে সন্ধ্যে পর্যন্ত তোমার কাছে বসে কথা বলব,' বলে সে আবার কাজে লেগে গিয়েছিল।

সেদিন সে সব ঘরের জিনিষপত্র বের করে ধুলো ঝেড়ে গুছিয়ে রাখল। বিশেষ করে রামন্নার ঘরের বইপত্র আর কাপড়জামা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিল। রান্নাঘরের বাসনপত্র গুছিয়েছিল। আলোর কাঁচ পরিষ্কার করেছিল। খাট বিছানার ধুলো ঝেড়েছিল। একটা কাজ শেষ করে অন্যটা ধরেছিল। কোন কাজ ঠিক হয়নি মনে হতে আবার করেছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করেও ক্লান্তি না আসায় তারি ভাল লেগেছিল। আর তখনি অনুভব করেছিল যেন তার মধ্যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। সব কাজ সেরে সরলার কাছে এলে সে বার বার তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখেছিল।

তখন কুমুদ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন দিদি, একদিন খেটেই হাত-পা ক্ষয়ে গেল ভেবে ভয় করছে নাকি?'

সরলা কোন উত্তর দিল না, হাতে করে ছুঁলে কি হবে, তার মন তখন অন্যখানে। শেষ পর্যন্ত সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। কুমুদ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দিদি কি ভাবছে কে জানে? তখন সরলা যেন বলল, কুমুদ, তুই আমার চেয়েও ভালভাবে ঘরদোর সামলাতে পারবি।

'তুমি এ সব আজে বাজে কথা বলবে না তো।'

'বাজে কথা কেন? একদিনও এমন ছুটোছুটি করেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'যার ঘর সবসময় সাজানো, তার ছুটোছুটি করবার দরকারই হয় না। আমার মত শুধু পালপার্বনে যারা কাজ করে, তাদেরই এমনি করে কাজ করতে হয়।'

'ভালই হলো। তোরও এ বাড়ীর কাজ করা অভ্যেস হয়ে যাবে, ভালোই তো'।

'একদিন এক আধটা জিনিষ এদিক ওদিক একটু সরিয়ে রেখেছি, তাতে কত প্রশংসা করছো দিদি।

'তাইতো বলছি ভালই হল। আমি কি আর কোনদিন ভাল হয়ে উঠে ঘরদোর সামলাতে পারব?'

কুমুদ সরলার মুখ চেপে ধরে বলল, 'চুপ করো দিদি, তুমি সবসময় শুধু কুডাক ডাকবে।'

'মুখে না আনলেই কি লুকোনো থাকে? কুমুদ, আমার অসুখ কি সারবার?

সে রাগ করে বলল, 'তুমি যদি এমন কথা বলো তো আমি এখান থেকে চলে যাব।'

'রাগ করিস নি বোন, তুই যদি চলে যাস তো আমি যখন থাকবো না তখন এ ঘরদোর সামলাবে কে?' এই বলে সরলা পাশ ফিরে মুখে আঁচল টেনে দিল।

এ কথায় কুমুদ একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। পাশ ফিরে মুখ লুকোবার পর সরলা অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলেনি। এইজন্যে কুমুদের একটু ভয়ও হচ্ছিল? ঘর সাজানোর উৎসাহ মিইয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল যে সরলাদিদি এমন করল কেন? তার করা কাজ কি ওর ভাল লাগেনি? কিংবা? কুমুদ ঘাবড়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ কথাটা মনেই আসেনি। সন্ধ্যেবেলা রামন্নার বাড়ি ফেরবার সময় মনে হতেই অপ্রতিরোধ্য আবেগে তার বুক কাঁপতে শুরু করেছিল একটা আকাঙ্খা যেন তার ভেতরে জেগে উঠছে। সন্দেহের কাঁটা বিঁধল যেন। বিগত রাতের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বুকটা ধ্বক্ করে উঠেছিল একবার। তবে কি সেই প্রেরণাতেই সে সারাদিন খেটেছে? তার এ পরিশ্রম রামন্নার ভাল লাগবে এই আশাতেই কী? না হলে তার ফেরবার প্রতীক্ষায় আছে কেন? নিজের বুকের ঢিপঢিপ শব্দ সে স্পষ্ট শুনতে পেল। সরলাদিদির তো সন্দেহ হবারই কথা। না হলে মরবার কথা আর মরার পর ঘর সামলাবার কথা তার মনে হবে কেন? তার নিজের ব্যবহার যেমনই হোক না কেন, সরলাদিদির মনে নিশ্চয়ই এই সন্দেহ হয়েছে—মুখ ঢেকে শোবার পর থেকে এখনও ওঠে নি, তার দিকে তাকিয়েও দেখেনি। কুমুদ সত্যিই ভয় পেল। তার বিবেক বুদ্ধি, রামন্নার জন্যে তার মানসিক দ্বন্দ্ব, এটা ভুল কি ঠিক, এসব প্রশ্ন তার মনে ওঠে নি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বা সমাজের নৈতিক জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করার ক্ষমতা তার ছিল না,

তা ছাড়া নীচের তলায় আগুন লাগলে লাফ দেবার সময় মরবো কি বাঁচবো এ তর্ক উপরতলার বাসিন্দা করে না। নীচের ঘর জ্বললে তো পাশে জানলা থাকলে সহজ ভাবেই নিচে লাফ দেয়। প্রাণশক্তি সবচেয়ে দুর্বার। কুমুদের পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব নয়। বুঝলেও কিছু করবার শক্তি তার ছিল না। কুমুদ শুধু ভেবেছিল সরলাদিদি যদি তার ওপর রাগ করে তো কি হবে? তার এই ভয়টাই ছিল। সেই ভয়েই রামন্নার ফেরার কথা ভেবে সে ভয় পেল, রামন্না এলে সরলাদিদি তাকে যদি সব কিছু বলে দেয়? তার ওপর রাগের কথা যদি বলে? শেষ পর্যন্ত সে ভেবে দেখল যে তার করবার কিছু নেই। কাজেই ওখানে থাকা উচিত নয় ভেবে সে নিজের ঘরে চলে গেল। তবু রামন্নার আসার শব্দ পেয়ে সে নিজেকে সামলাতে পারল না। দু এক মিনিট ভাবল যে রামন্না বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। কিন্তু রামন্নার জোর হাসির শব্দ তাকে অবাক করে দিল। মনের মধ্যে অজস্র কৌতুহল ফেনিয়ে উঠলেও তবু বেরোতে সে ভয় পেয়েছিল। তাই রামন্নার হাসির কারণ সে বুঝতে পারে নি। শেষে রামন্না 'সরলা ডাকছে' বললে তাকে যেতেই হল। সরলার সামনে গিয়ে দাড়ানোর সময় তার মনে হচ্ছিল পাদুটো যেন পাথর হয়ে গেছে আর মাটির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। সে নিজেও যেন তলিয়ে যাচ্ছে।

কুমুদ 'হুঁ' বলেই চোখ মেলে দেখল। তার হাতে বই, সে চেয়ারে বসে আছে, লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। সে দিনের স্মৃতি চোখের সামনে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ঘড়ি দেখল—রাত সাড়ে ন'টা। যাক্ শোবার সময় হয়েছে। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে সিনেমা যেতে চাইছিল না? ভালই হয়েছে! পুরোণো স্মৃতির সিনেমা দেখা হলো ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে চলে গেল।

সাত

রামন্নার অবস্থা হয়েছিল কাদায় পড়া লোকের মতন। স্ত্রীর ফটোর সামনে বসতেই পূর্বস্মৃতি বাধা মানল না। এক স্মৃতি থেকে অন্য স্মৃতি জেগে ওঠে। তার কেবল মনে হচ্ছিল যে সরলার মৃত্যুর পর এক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না যে সমস্যাটা কি? এতদিন সে মুখ ফুটে তাকে বলেও নি। এখন ভাবতে বসে সরলার ছবিকে সম্বোধন করে বলে, 'আমার জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্যে এই সান্ত্বনা দিচ্ছো?' ফটোর দিকে চেয়ে থাকতে

থাকতে যখন এই কথাগুলো ধীরে ধীরে তার মগজে ঢুকল, তখন তার অবস্থা হল ক্লোরোফর্মের প্রভাবে থেকে জেগে ওঠা আচ্ছন্ন লোকের মতো। এতদিন তার মনে হয়নি যে কুমুদ তার কাছে এক সমস্যা। অনেক বছর ধরে মেয়েটা তার বাড়ীতে আছে বলে তার উপস্থিতি একটা অভ্যাসের মতো হয়ে গিয়েছিল। প্রথমবার সে যখন এ বাড়ীতে আসে তখন কি তাকে একটা ছোট্ট মেয়ের মতোই মনে হয়নি? সেই ছবিটাই মনে গাঁথা ছিল। বাড়ন্ত বয়সের কুমুদ অল্পদিনেই পূর্ণ বিকসিত হয়ে এক নারীতে পরিণত হয়েছে। সরলার সঙ্গে থাকার ফলে কুমুদের এই পরিবর্তন হয়তো তার চোখে পড়েনি। ছোট মেয়ে ভেবে তার সঙ্গে মাঝে মাঝে সে হাসি ঠাট্টাও করত। তা ছাড়া, সরলার কাছে বসে থাকার সময়ই শুধু তার দেখা হত। এই সব কারণে কুমুদ সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহল হয়নি। এই পরিস্থিতির মধ্যে আকস্মিকভাবে ওই ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় সে যেন চমকে উঠল। একটু ভয়ও পেয়েছিল। সেদিনের সেই ঘটনার কথা সে কোনদিন ভুলতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি সেদিনের সঙ্গে অন্যদিনের কোন তফাৎ ছিল না। কুমুদ তার ঘরে কতবার এসেছে, লেখার সময় কতবার এসে তার সঙ্গে কথা বলেছে, বই নিয়ে গেছে, শক্ত বই হলে গল্পটা তার কাছে আগেই শুনে নিয়েছে, আর কতবার সে নিজে তাকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনিয়েছে। এ সব সত্যি। কিন্তু সত্যিই বা কি করে বলা যায়? শুধু একবার হাতে হাত ঠেকে যাওয়ায় এবং চোখে চোখ মেলায় সে সব কথা স্বপ্নের মতন ভুলে গিয়েছিল। তখন থেকেই কুমুদকে অন্য রকম লাগছিল। বয়সে, জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায় সে তো বড়ই ছিল। তাই কুমুদ বড় হলেও তার চোখে ছোট মেয়েই ছিল। এই ভেবেই সে সান্ত্বনা পেয়েছিল। কিন্তু ফল হলো কী? সে রাতে আগের মতো যখন সে বই নিতে এল, তখন আলমারির সামনে সে কি তার সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার করে নি? দু তিন বছর পরে যদিও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, তবু রামন্নার কাছে স্পষ্ট হল না। সে দিন কেন তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল? রামন্নার মনে হল যে বুদ্ধি যতই পরিণত হোক, মত যতই সুসংস্কৃত হোক না কেন, দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ কখনও সম্ভব নয়। 'মনরূপী বাঁদরকে বশে আনা যায় না।' সন্ত কবি দাসোঁর এই কথাটাই বা কি রকম? তিনি বোধ হয় দেহের এ রহস্য বুঝতে পারেন নি। মনকে আটকানো যায়, বুদ্ধিমানকে বোঝানো সম্ভব; কিন্তু দেহকে কি বশ করা যায়? 'জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি' একথা মিথ্যা নয়। দেহ মূর্খের সমান, বোঝালে বোঝে না, পশুর মতন প্রকৃতির নিয়ম পালন করে শুধু। গাছের মত দেহও জন্মাবার পরই বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেহের এই শক্তিই সেদিন তার বুদ্ধি আর মনকে হারিয়ে দিয়েছিল। যে দেহ জন্মায়, সেই আবার অন্য দেহ সৃষ্টি করে, এটাই দেহের স্বাভাবিক গুণ। তার দেহও সে রাতে ঠিক তাই করেছিল। সরলা শয্যাশায়ী হবার পর দেহের ক্ষুধা

বোধ হয় বেড়েছিল, সরলার কাছে বসা, তার হাত ছোঁওয়া, তার সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি ঘনিষ্ঠতার ফলে তৃষ্ণা জেগেছিল কিন্তু তার নিবৃত্তি হয়নি। না হলে খাবার দেখেই চিলের ছোঁ মারার মত সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত না। সেদিন হঠাৎ জড়িয়ে ধরলে কুমুদও অবাক হয়ে গিয়েছিল। জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো বারবার চুমু খেতে দেখে সে বোধ হয় তাকে রাক্ষস ভেবেই ভয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

তার হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে কুমুদের পালিয়ে যাওয়াতে রামপ্পার হুঁশ হল। প্রথমে সে বুঝতেই পারল না যে সে কি করছে। ঘাম দিয়ে জ্বর-ছাড়া রোগীর মত তার যেন জ্ঞান ফিরে এল। আর তখনই নিজের ভুল বুঝতে পারল। একদিকে শয্যাশায়ী সরলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা অপর দিকে কুমুদের প্রতি আশ্রয় দেবার দাম নেওয়ার মতো অন্যায় ব্যবহার। এই কথা মনে জাগতেই রামপ্পার মুখে গ্লানির তিক্ত হাসি ফুটে উঠেছিল। মানব সংস্কৃতিতে কতো আত্ম-বঞ্চনা আছে ; সত্যকে লুকোনোই বুদ্ধিমত্তা—এই সব স্পষ্ট করে দেখাবার কত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিশ্বাসঘাতকতাও অন্যায়। শব্দ দুটো সে উচ্চারণ করল কিন্তু সে শুধুই শব্দ। বরং সত্য ছিল তার সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মধ্যে, সেই ঘেমে ওঠায় নিজের ঠোঁটে, বুকে বলিষ্ঠ হাত দুটোতে তার স্পর্শ পাওয়ায়, এই কি সত্য? এটা তো তামসিক সমাধান, এ ভাবনা—ছিঃ! আবার শুনল—যাকগে কেন? একবার কিছু ঘটে গেলে সতর্ক থাকতে হবে, দ্বিতীয়বার না ঘটে। এতো নৈসর্গিক ব্যাপার নয়। ঘটনাটা ঘটেওছে আকস্মিক ভাবে। এ সব ভেবে বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সে নিজের কাজে লেগে গেল।

কিন্তু ভোলা সম্ভব হলো না। শত চেষ্টাতেও মন অন্য কাজ করতে রাজী হল না। কুমুদের আলিঙ্গনের স্মৃতি ভোলবার জন্যে মনকে সে বশে আনতে পারল না। শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে নিজেকেই গাল দিতে লাগল। লাভ হল না কিছুই। নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েই মন শান্ত হবে ভেবে সে ঠিক করল যে কুমুদের কাছে ক্ষমা চাইবে। তার ঘরের দিকে দু'পা এগিয়েই থেমে গেল। সে কি ক্ষমা চাইতেই যাচ্ছে? না কি শরীরের খিদে মেটাবার জন্যে? সে নিজেকে সামলে নিল। আহা বেচারী! হাজার হোক আশ্রিত তো বটে, বয়স অল্প, আমাকে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করে। না জানি কত ভয় পেয়েছে? কি ভাবছে? তাকে সান্ত্বনা দেবার তার কর্তব্য মনে করে সে পা বাড়াল। কিন্তু সান্ত্বনা দেবার কথা মনে জাগার আগেই সে অনুভব করল যে তার হাত তাকে ছোঁওয়ার জন্যে আকুল হয়ে উঠছে। এই বুঝে সে এক পা পিছিয়ে এল। হতাশ হয়ে নিজের উপরেই রেগে গেল। তার শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিচারবোধ—এ সব কোথায় কোথায় গেল? তার মনে তাণ্ডব সৃষ্টি হল কেন? একবার মনে হল যে এই সবের নৈতিক অনৈতিক দায়িত্ব রুগ্ন সরলারই। সে নিজেকে

বিচার করে দেখল যে এতদিন একথা ভাবার অবকাশই ছিল না—এ সব কুমুদের সান্নিধ্যে আসাতেই হয়েছে। কাম তাকে উপহাসের পাত্র করে দিয়েছে। এই ভেবে সে ছটফট করতে লাগল। তখন যে ভাবেই হোক সে কাহিনী সেখানেই শেষ হয়েছিল। কিন্তু দু-তিন বছর পরে আজ তাকে স্বীকার করতে হল যে তা শেষ হয়নি। বিছানায় ছটফট করতে করতে হঠাৎ মনে হল কুমুদ পালিয়ে কোথায় গেল? নিজের ঘরে না সরলার কাছে? সে যে অবাক হয়ে গিয়েছিল তাতে তার সন্দেহ নেই। হতভম্ব মেয়েটা যদি সরলার কাছে গিয়ে থাকে তবে? যা ঘটেছে সব যদি তাকে বলে থাকে?······রামন্না বসে বসেই এমন কাঁপতে লাগল যেন তার জ্বর বাড়ছে। সে ভাবল, 'গিয়ে দেখে আসবো?' ধীরে ধীরে উঠে ঘরের বাইরে এল। এক মিনিট দাঁড়াল। তখন সে ভাবল, একবার দেখে নেওয়া উচিত যে কুমুদ নিজের ঘরে আছে কি না। তারপরই ভূতে পাওয়া মানুষের মতো সরলার ঘরের দিকে ছুটে গেল। কুমুদের ঘরে গেলে না জানি সে কি করে বসবে তার বিশ্বাস নেই। সেই ভয়েই সে সরলার ঘরের দিকে যেতে সাহস পেয়েছিল। ঘরে ভূত দেখলে ভীরু লোকের অন্ধকারে পালাবার সাহস হয় না? যাই হোক, সরলার ঘরে কোন শব্দ নেই। কে জানে, তার ভয়ে কুমুদ যদি সেখানেই শুয়ে থাকে? দেখেই নি! এই ভেবে সে আস্তে আস্তে দরজা খুলেছিল।

'কে?'

সরলার কথায় সে চমকে উঠল। হয়তো তার মনে হয়েছিল যে কোন কথা বললেই ভর্ৎসনা শুনতে হবে! তাই চোরের মত সে বলল, কে? কেউ না, আমি।'

'কেন? আজ লিখতে মন বসছে না?'

রামন্নার কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়ল।

'না—লিখছিলাম তো। মনে হল তুমি ডাকছ! হয়ত তোমার কিছু দরকার—তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম।'

'ওঃ, আমিও একটা শব্দ শুনলাম।...কুমুদ শুয়ে পড়েছে নাকি?

'আমি তো দেখিনি, লিখছিলাম। ওকে ডাকবো নাকি?

শেষ কথাটা বলতেই তার মনে হল যে জিভটা কেটে ফেলা উচিত।

'অ্যাঁ? ওকে কেন ডাকবে? বেচারী! ছেলে মানুষ। ঘুমোতে দাও?'

'না, না, তোমার হয়ত কোন কিছুর দরকার আছে, তাই বলছিলাম।' কথা শুনে সরলা মুচকি হাসল।

'আমার আর কী দরকার? তুমি আছ, কুমুদ আছে। দুজনে মিলে সংসার চালিয়ে নেবে। আমার আর কোন চিন্তা নেই! এখন শুধু চোখ বুজলেই হয়।'

মেঘগর্জন নয়, সেটা তার বুকের ধকধকানির শব্দ। এ কথা শুনে রামন্নার হৃদয়

গুঁড়ো হয়ে গেল। এ কথা কেন? সরলা কি বুঝতে পেরেছে? তার ওপরেই কি সন্দেহ হল? এই ভেবে রামন্না স্ত্রীর ফ্যাকাশে মিষ্টি মুখের দিকে তাকাল। তার মন যেন অস্বস্তিতে ভরে গেল। সরলার কাছে গিয়ে সে তার মাথায় হাত রাখল।

'পাগলী, আমি বলছি তুমি পাগল হয়ে গেছ। আলো ছাড়া কি গাছপালা বাঁচে? তোমার চোখের আলোই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, আর সবই আলেয়া।'

সরলা তার হাত ছুঁয়ে প্রশ্ন করেছিল—

'একজন প্রসিদ্ধ লেখকের পক্ষে এমন মিষ্টি কথা বলা কি শক্ত?'

'মিষ্টি কথা? মিষ্টত্ব আমার কথায় নেই।'

'তবে কিসে আছে?'

তখন রামন্না ঝুঁকে তার মাথায় চুমু খেল।

'মধু থাকে কোথায়? সে তো ভ্রমরই জানে, পদ্মফুল কি করে জানবে?—বলতে বলতে সে সরলার চাদর ঠিক করে দিল।

'ও বাবা—এখন মরণ আসা উচিত নয়? কত ভাগ্য আমার!'

'কি বললে? ভাগ্য?'

হেসে সরলা মাথার চুমু-খাওয়া জায়গাটা দেখাল। তারপর নিজের ঘরে এসে রামন্না ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এই সব কথা স্মরণ করে রামন্না আবার ছবির দিকে তাকায়, সরলা, সেদিন তুমি বলেছিলে যে তোমার ভাগ্য কত ভাল। পরে কিন্তু আমায় ছেড়ে চলে গেলে। কিন্তু আমার ভাগ্যের কথা কি তুমি কল্পনা করেছিলে?' মৃত পত্নীর ছবির দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করল। শুদ্ধ চিত্ত সরলার কথায় তার ক্ষুব্ধ মন শান্ত হয়েছিল! মন হালকা হওয়ায় রাতে গাঢ় ঘুম হওয়া সত্ত্বেও পরদিন ঘুম থেকে উঠে রামন্নার মনে কষ্ট হয়েছিল। আজ সে কথা স্বীকার করতে ভয় কী? সরলার বিষয়ে তার মনে আর কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু পরের দিন ভয় হল কি করে কুমুদের সামনে দাঁড়াব? রাত্রে রাক্ষসের মত ব্যবহারের পর কি করে তাকে মুখ দেখাব? মুখ লুকোবই বা কি করে? সকালের চা থেকে রাতের খাওয়া—সবই তার হাতে। শেষপর্যন্ত সে সরলার শরণ নিয়েছিল। সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে সে সরলার কাছে গিয়ে বসল, সেইখানেই চা খেল। কিন্তু রামন্নার অস্বস্তি কাটল না। কুমুদকে সে কি ভয় করেনি? কিন্তু কুমুদের ব্যবহার দেখে তার মনে হল যে ওকে ভয় করবার কোন কারণ নেই। কুমুদের মুখে একটা গোপন পরিতৃপ্তির আভাস রয়েছে। রামন্নার সন্দেহ হল, তবে কি কুমুদ তাকে অন্য চোখে দেখে? না কি তার মুখের ভাবই এমন? সাহস করে সে তাকে মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করতেই সে একটু লাজুক হাসি হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

রামন্না নিজের মাথাটা ঝাঁকায়—যেন সেই স্মৃতির ভার সইতে পারছে না। চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করে সে জোর করে বলে, 'সেদিন সে মুচকি হেসে মুখ

ফিরিয়ে নিয়েছিল। এতদিন পরেও সে দৃশ্য সে ভোলে নি। কিন্তু সেই কুমুদকেই আজ সিনেমা নিয়ে যাবার জন্যে সে তৈরী ছিল। সেদিন সরলা বেঁচেছিল তবু সে কুমুদকে চেয়েছিল। 'এখন এটা কী হলো?' এ প্রশ্ন করার জন্যে সরলা বেঁচে নেই। কিন্তু তার অবস্থা শিকারীর তাড়া খাওয়া হরিণের মতো। এই কি কালচক্র? সেদিন তো কুমুদের লাজুক হাসি দেখে ভেবেছিল যে সেটা প্রকৃতির ফাঁদ। আজকের মতো সংশয় জাগেনি তো। তাকে শুধু প্রকৃতির মায়া ফাঁদ ভেবে সন্তুষ্ট হয়েছিল। সে যাই করুক না কেন, কুমুদের কাছ থেকে কোন ভয় নেই জেনে উল্লাসিত হয়ে সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফেরার পর এক মজার ব্যাপার হল। সেদিন মজার মনে হয়েছিল; এখন বুঝতে পারছে যে সেটা অন্য ব্যাপার! সন্ধ্যায় সে দেখেছিল ঘরের নকশাই বদলে গেছে। সব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে-ফিটফাট। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আরে, কি ব্যাপার! আজ ঘরটাই যেন ধোপার হাতে পড়েছে!'

এতে সরলা ঠাট্টা করে বলেছিল, 'কেন? ধোপার কথা মনে পড়ল কেন? তুমিও কি রামের মতো স্ত্রীত্যাগ করবে?' মিনিট খানেক রামান্না হতবাক হয়ে গেল—এই ফাঁকে সরলা বলে চলল—

'এমন করে দেখছ কী? ঘর পরিষ্কার করার অন্য লোক আছে। তোমার বৌয়ের আর সে শক্তি নেই। তাই বলছিলাম—এই বেকার বৌকে ছেড়ে—'

সরলার কথা তখনো শেষ হয় নি। কেননা পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে হো হো করে হেসে উঠেছিল। বুঝতে পেরেছিল—সব কাজ কুমুদই করেছে। কিন্তু সেদিন তার হাসিটা কি সরলার ঠাট্টা তামাসার জন্যে? নাকি নিজের মনে কুমুদের সম্বন্ধে বিশ্বাস হওয়াতে? আজও রামন্না সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে নি। ঘরের মধ্যে পায়চারি করা বন্ধ করে ঘড়ির দিকে তাকাল—সাড়ে নটা বেজেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবল, সিনেমা যাবার ব্যাপারটা চুকে গেছে। আর এই বাজে পুরোণো কথা ভাবা নিরর্থক। একটা বই নিয়ে সে আবার চেয়ারে বসে পড়ে। তারপর চেয়ারে ঠেস দিয়ে টেবিলে দু পা তুলে আয়েস করে বই পড়তে লাগল।

আট

প্রথমে কুমুদ ভেবেছিল যে পুরোণো স্মৃতিগুলো আজ তার কাছে ছবি হয়ে গেছে, কিন্তু পরে বুঝল যে এটা তার ভুল। কেননা সেই স্মৃতি ভোলবার জন্যে ঘরে বিছানায় এসে বসতেই তার আবার সিনেমার কথা মনে এল। একবার সে সরলাদিদির কাছে বলেওছিল, 'সিনেমায় অভিনয় করতে খুব ইচ্ছে করে!' সেদিন

—সেটা কবে? হ্যাঁ, যে রাতে 'কিছু' ঘটে যাওয়ায় খুশির ঝোঁকে ঘরদোর পরিষ্কার করেছিল, তার আগের দিন। সেদিন সরলাদিদি কিছু বলতেই সে ছুটে নিজের ঘরে পালিয়ে আসে। পরে রামণ্ণা ফিরেছিল। পাছে সে কিছু বলে—সেই ভয়ে সে লুকিয়ে বসেছিল।

তখন কি রামণ্ণা হেসেছিল? হ্যাঁ—সেই দিন। রাতে খাবার সময় কিছু কথা হয়েছিল। খাবার সময় নয়—হ্যাঁ, মনে পড়ছে। রামণ্ণা খেয়ে সরলাদিদির কাছে বসেছিল। রান্নাঘরে সে একলা বসে খাচ্ছিল। সেই সময় বাইরে স্বামী স্ত্রীর কথা তার কানে এল। অন্যসময় এ রকম আলাপ তার কানে এলে সে তাতে কান না দিয়ে অন্য কাজে লেগে যেত এই ভেবে—স্বামী স্ত্রীর আলাপ আলোচনা শোনা ঠিক নয়। না জানি কেন সেদিন একটু কৌতূহল হল। তা ছাড়া খেতে খেতে অন্য কাজ করাও যায় না। কিংবা তার সন্দেহ হয়েছিল যে তার সম্বন্ধেই হয়ত কথা হচ্ছে। এইজন্যে চিবোনোর শব্দ বন্ধ করে সে দুজনের কথা শুনতে লাগল। সরলাদিদির গলা শোনা গেল।

'আজ দেখলে তো—কুমুদ কেমন ঘরদোর পরিষ্কার করতে পারে?'

রামণ্ণা প্রশ্ন করল, 'কেন? তুমি বলেছিলে নাকি?'

'বাজে বোকো না। আমি কি পাগল নাকি যে তার ঘাড়ে এত কাজ চাপাব?'

'তবে আজ এই উৎসাহ হল কেন?'

'উৎসাহ আবার কি? তোমার বাড়ীতে তো ওর সময় কাটে না। আমি তো বিছানায় পড়ে আছি। সবসময় আমার চারপাশেই ঘুরছে। বাইরে বেরোতেও পায় না। তুমি তো নিজেকে নিয়েই মেতে আছ।'

'তবে আমাকে কি করতে বল? ওর সঙ্গে খেলব?'—রামণ্ণা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিল আর তা শুনে কুমুদের গায়ে যেন কাঁটা দিয়েছিল।

'বাজে কথা বলো না। তোমার তো কাউকে দরকার নেই। যদি তোমার নিজের ভাই কি বোন আসত তবে তুমি কি তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারতে?'

'না—তা কি করতে হবে বল না।'

'কি করতে হবে বলছ কেন? মেয়েটা এত বছর ধরে বাড়ীতে রয়েছে। ও কি বাইরের কেউ? ওর কি আর কেউ আছে? যদি আমরাই ওর দিকে নজর না দিই?'

রামণ্ণা কথার মাঝেই বলেছিল, 'নজর দেওয়া মানে? যেখানে যাবো, সেখানে ওকে পকেটে করে নিয়ে যাবো?'

'আমি তো সাহিত্যিক নই। তোমার মতো কথার ফুলঝুরি ছড়াতে জানি না। সব লোকে যেমন বলে আমিও তেমনি বলেছি। পকেটে নেবার কথা কেন? আমি জানি তোমার নজর সবসময় নিজের পকেটের উপরেই থাকে।'

'আরে! কোথাকার কথা কোথায় টেনে নিয়ে গেলে! তোমার বোন থেকে কথা শুরু হয়ে আমার পকেট পর্যন্ত এসে গেল? হাঃ হাঃ হাঃ!'

এ কথা শুনে কুমুদের হাসি পেয়েছিল। সেই হাসির কথা মনে পড়ায় আজও কুমুদের মুখ হাসিতে ভরে গেল। সরলাদিদি কথাবার্তায় কত পটু ছিল!

'হ্যাঁ, তুমি তো কারো জন্যে এক পয়সা খরচ করতে চাও না।'

'কোন জিনিষের দরকার আছে?'

'আমার কি দরকার? বিছানায় পড়ে পড়ে এমন হাল হয়েছে, বিষ খাওয়ার জন্যে পয়সার দরকার পড়লেও পড়তে পারে।'

শুনে কুমুদের গলা দিয়ে গ্রাস নামল না—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

'দ্যাখো সরলা, এদিক সেদিক কথা বাড়িয়ে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। স্পষ্ট বলছ না কেন? তোমার জন্যে খরচ করতে আমি কি দোনা মোনা করেছি?'

"আমার কি দরকার? সেই কথাই তো বলছি তবু তুমি আমার দরকারের কথাই বলে চলেছ। কুমুদের জন্য বলছিলাম। সারাদিন খাটছে। তাতেও যদি সময় না কাটে তো অন্য কাজ করতে হয়। কখনো কি বাইরে যেতে পায়? একটা সিনেমাও দেখতে পায় না। বাড়ীতে ছেলেপেলে থাকলে তবু ওর সঙ্গী মিলতো—'

'ছিঃ—পাগলী কোথাকার। বলছি বেশী কথা বললে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তবু তুমি কান্না জুড়ে দিলে। ও কি সিনেমা যেতে চায়? যখন খুশী যাক না—এতে আর কি আছে? আমি ভয় পেয়ে ভাবছিলাম বুঝি কোন বিশেষ ব্যাপার। এর জন্যে কাঁদবার কি আছে?'

এরপর সরলা বললে 'চুপ করো, ও কথা থাক।' সে এইটুকুই শুনতে পেয়েছিল! তার খাওয়া শেষ হবার আগেই রামন্না নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। পরের দিন সরলাদিদি তাকে বলেছিল রামন্নার সাথে তাকে সিনেমা যেতে।

'ওরও একলা যেতে ভাল লাগবে না। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি বলেছি তোমাকে নিয়ে গেলে কোন আপত্তি নেই।' সরলার কথা শুনে কুমুদের মুখে হাসি ফুটেছিল। পরদিন সন্ধ্যায় সিনেমা থেকে ফিরে সে সোজা সরলার কাছে ছুটে এলে সে জিজ্ঞাসা করেছিল—

'দেখে এলি?'

'দেখে এলাম দিদি, ইংরাজী ছবি ছিল। খুব ভালো।' উৎসাহের সঙ্গে সে উত্তর দিয়েছিল।

'ইংরেজী ছবি? গোটা গল্পটা বুঝতে পেরেছিস?'

'উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'আচ্ছা······গল্পটা কি ছিল?'

'বড়-বউয়ের গল্প। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুব প্রেম ছিল। একবার স্বামী এক ধূর্ত মেয়ের ফাঁদে পড়ে। সেই থেকে সে আর স্ত্রীর মুখ দেখতে চায় না। আট বছরের একটা ছেলে আছে; স্ত্রী আর ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়,

অনেকে ঐ রকম স্বামী ত্যাগ করবার পরামর্শ দেয় কিন্তু স্ত্রী তাতে রাজী হয় না। তার ধারণা যে স্বামী এখনও তাকে ভালবাসে; আজ না হয় কাল ধূর্ত মেয়েটা যখন স্বামীকে কষ্টের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যাবে তখন তাকে বাঁচাতে হবে। সেই পথ চেয়ে থাকে। কিন্তু স্ত্রীর জন্যে স্বামীর কোনও চিন্তা নেই। বৌ-ছেলের খাওয়া পরার অভাব দেখেও তার আক্কেল হল না। শেষ পর্যন্ত সেই ধূর্ত মেয়েটা স্বামীর অনেক পয়সা নষ্ট করে বাকীটা নিয়ে সরে পড়ে। স্বামী হতাশ হয়ে ভাবে কোথায় যাবে? কি করে জীবন কাটবে? স্ত্রীকে মুখ দেখাতে তার এখন লজ্জা। শেষে হতাশ হয়ে সে আত্মহত্যা করতে যায়। তখন স্ত্রী আসে। পরে সকলে সুখে দিন কাটায়।'

'দিদি, শেষে তো চোখে জল এসে পড়েছিল। মেয়েটা এত ভাল অভিনয় কি করে করল? আমার মনে হয় মেয়েটা সত্যিই ঐরকম।'

সরলা হেসে বলল—'দূর পাগলী কোথাকার।'

তখন কুমুদ বিব্রত হয়ে বলেছিল, 'না হলে এত ভাল অভিনয় কি করে করল?'

'তাতে কী? ওরা ঐরকম মেয়েই হয়। ওরা সিনেমার অভিনয় ছাড়া আর কিছুতেই খাঁটি নয়।'

'এমন স্ত্রীর পার্ট করে যে মেয়ে—?'

'না জানি কতোবার বিয়ে করেছে।'—সরলার এই কথা শুনে সে যেন অথৈ জলে পড়েছিল; তার মুখ দেখে সরলা হাসতে লাগল।

'এতে অবাক হচ্ছিস কেন? মিথ্যে বলছি না। না হয় ওঁকে জিজ্ঞাসা করে আয়। ওদের কতোবার বিয়ে হয় আর কতোবার ছাড়াছাড়ি হয়।'

'এ রাম! এই ব্যাপার?' তার কথায় নৈরাশ্য ফুটে উঠেছিল। এ কথায় সরলা জিজ্ঞাসা করেছিল,—'তোর এত খারাপ লাগল কেন?'

তখন কুমুদের মুখে দ্বিধার ভাব ফুটে উঠল। সিনেমার গল্পের পরিণাম দেখে কুমুদ ভেবেছিল যে অভিনয় করা বেশ ভাল কাজ।

'যদি এমন ঘটে তো গল্পও তেমনি লেখা উচিত। তবে বিয়ে করে সুখে থাকাই ভালো এমন গল্প লিখল কেন, তাই না?' সরলার এই কথা শুনে কুমুদের ভ্রম দূর হল।

সরলার কথা তখনো শেষ হয়নি। নিজের দেখা কয়েকটা ছবির কথা শুনিয়ে বলেছিল—

'দ্যাখ্, কুমুদ, তোর দেখা ছবির গল্পের মতো স্ত্রীর কাছে স্বামী আর ছেলে ছাড়া কোথাও সুখ নেই। স্ত্রীর হৃদয়ে সব সময় মায়ের হৃদয়ই প্রধান হয়ে থাকে। তুই দেখলি তো। এতো কষ্ট পেয়েও স্ত্রী স্বামীকে বাঁচাল। পুরুষদের স্বামী হবার যতই অহংকার থাক না কেন, কষ্ট পেলে হাত ধরে সান্ত্বনা দেয় স্ত্রীই।

উনিও তো কতো গল্প লেখেন। ও'র লেখা এমন একটা গল্পও কি পড়েছিস যাতে স্ত্রী সুখী হয়েছে? আমি একবার বলেছিলাম—'মেয়েদের এত কষ্ট দাও কেন?' তাতে উনি বলেছিলেন, 'ওরা নিজেদের কর্মফল ভোগে।' কর্মফল-টল বাজে কথা—এ সব মনগড়া গল্প। স্ত্রীর কি চাই? এটা না জেনেই লেখক সব সময় ভুল দেখায়। লেখক ভুল পথে গেলে তার চরিত্রও ভুল পথে চলবে। তুইই বল, এটা ঠিক কিনা? উনি তো 'তুমি কি জানো? তুমি তো সে যুগের মেয়ে' বলে হেসে উড়িয়ে দিলেন। তখন আমি বললাম, 'এতে এ যুগ সে যুগের কথা কেন? স্ত্রী তো সব সময় স্ত্রীই থাকে। এ যুগে তাদের কি গোঁফ গজায়?' সরলার কথা শুনে কুমুদ হেসে লুটোপুটি খেয়েছিল। কিন্তু সেদিন যেকথা হাসির মনে হয়েছিল আজ তা তত্ত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে—কিন্তু বলবে কাকে? সরলাদিদি তো সুখ-দুঃখের পারে চলে গিয়েছে। আজ সে বেঁচে থাকলে সে কি তাকে এই সব বলতো? কি করে বলতো? 'তোমার স্বামীকে আমার ভাল লেগেছে। তোমার স্বামী আমার সঙ্গে প্রেম করেছে। যদি আমি চাই তো স্বামী-সন্তান পেতে পারি। তোমার ইচ্ছেই আমি পূর্ণ করেছি দিদি।' এ কথা কি সে দিদিকে বলতে পারতো? স্বামী, সন্তান—সরলাদিদি এই দুজনের জন্যেই না বলেছিল? বিয়ে না করা স্বামীর ছেলে হলে সুখ মেলে না। বিনা সন্তানে স্বামী থাকলে তাতেও সুখ নেই। ছেলেও থাকে, স্বামীও থাকে তবু বিবাহ বন্ধন না থাকলে তাতেও সুখ নেই! নারীজীবন কতো পরনির্ভর আর কতো ঝঞ্চাটে ভরা। সরলাদিদির কথা স্মরণ করে কুমুদের মনে হল, ছেলে না হওয়াতে সরলাও সুখী হয় নি। এই জন্যেই হয়ত সিনেমায় কাজ করার ইচ্ছা তার মনে হয়েছিল। কিছুতে যদি সুখের আশা না থাকে তবে সিনেমায় নামলে ক্ষতি কি? যদি যোগ্যতা থাকে আর চেষ্টাও করে তবে তো পয়সাও মিলবে আর নামও হবে। কম করে এটুকু তো হবেই।

চিন্তার স্রোতে ভাসতে ভাসতে তার খেয়াল হল যে সে বিছানা ছেড়ে টেবিলে রাখা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আনমনে নিজের প্রতিবিম্ব চিনতে না পেরে অন্য কেউ এসেছে ভেবে চমকে উঠল। পরক্ষণেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ওর কাছে কে আসবে? লোকে তো কবে থেকে কানাঘুষো শুরু করেছে। প্রতিবেশীরা তাকে দেখে এমন ভাব দেখায় যেন কোন অস্পৃশ্যকে দেখে ফেলেছে। তার কেউ নেই। এমন কি রামন্নাও তার নয়। সে কি রকম পাগল? এক সময় রামন্নাকে সে নিজের ভেবেছিল। তার স্থির বিশ্বাস ছিল যে রামন্নার জন্যে সে যতটা পাগল, রামন্নাও তার জন্যে ততটা পাগল। শুধু কি এইটুকু? সে স্বপ্নের তাজমহল তৈরী করেছিল।

সে আবার আয়নার দিকে তাকাল। এ কার মুখ? এই শুষ্ক বিবর্ণ মুখ

তো তার নয়। সরলাদিদি বার বার বলেছিল, 'কুমুদ তোর ওপর আমার সর্বনেশে নজর না লেগে যায়।' মরবার একমাস আগে একই কথা আবার বলেছিল। মাত্র চারমাস আগের কথা; এরি মধ্যে কতো বদলে গেল। মরে যাওয়া সরলাদিদির নজর কি তার ওপর লেগেছে, না কি সরলাদিদির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে তার অভিশাপ লাগল?

কুমুদের মনে হল যে তার চালচলনে কোথাও কোন খুঁত নিশ্চয় আছে। সরলা মারা যাবার পর এই কথাটাই তার মনে বিঁধছে। শয্যাশায়ী স্ত্রীর স্বামীকে, তাও আবার তাকে পালনকারিণী সরলাদিদির স্বামীকে দখল করা তো বিশ্বাসঘাতকতা, পাপ। নিজের প্রতিবিম্বকে সে বলল, 'তুই পাপ করেছিস, তোর মুখ দেখতে নেই।'—বলেই সে রাগ করে আবার বিছানায় বসল। সে 'না' করেছে—আর যদি করেও থাকে তো কি? সেটা কেমন পাপ? তার কি দোষ? এমনি দেখলে তার কোন দোষ নেই। তার এখনও মনে আছে। যাকে সে পাপ বলছে, তার আরম্ভ কেমন করে হল, কার দ্বারা হল, তা আজও তার চোখের সামনে ভাসছে। তা স্মরণে রাখার দরকার নেই, তবু মনে পড়ছে।

সিনেমা দেখে ফেরার দিনের ঘটনা। সিনেমা দেখার ফলে হোক কিংবা রমন্নার সঙ্গে বসার ফলেই হোক পরের দিন কুমুদের বড় উৎসাহে কেটেছিল। উৎসাহ বাড়বার আরও এক কারণ ছিল। অনেক চেষ্টার পর যখন একবার রামন্নার চোখে তার চোখ পড়ল তখন তার মনে হল যে সে হাসিমুখে তাকে দেখছে। লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে যখন সে তার নজর এড়াতে চাইল, তখন মনে হল কেউ যেন জোর করে তার মুখ ওর দিকে ঘুরিয়ে দিল। তখনও তার মুখে সেই হাসি লেগেছিল। সারাদিন তার পা যেন মাটিতে পড়ছিল না। তার চলাফেরায় যেন নাচের ছন্দ এসেছে। অনেকক্ষণ চড়া রোদের পর যদি মেঘ করে, তাতে অবাক হবার কি আছে? সেইরকমই একটা মেঘ এসেছিল। তার আগের দিনের কথা নিয়ে সরলাদিদি রামন্নার সঙ্গে গল্প করছিল। সন্ধ্যায় রামন্না বেরোবার উপক্রম করছে তখন সরলাদিদি বলেছিল, আমাদের কুমুদ সিনেমায় নামতে চায়। তখন রামন্না বলেছিল, 'তাই নাকি?' আরও বলেছিল। হাসি ঠাট্টার কথা হলেও মনে বেজেছিল সেটা। কথাটা কি? (মুখে আগুন; যে কথা মনে করতে চাই, চেষ্টা করলেও তা মনে পড়ে না, আর যা চাই না তাই করাতের মত চিরে চলেছে)। যাক গে, কথাটাই মুখ্য নয়। সে কথায় সরলাদিদির হাসি আর সেজন্যে তার দুঃখ পাওয়াটাই আসল কারণ। কথা বলে রামন্না চলে গেল। কুমুদের খেতে ইচ্ছে হল না। সে অন্য কাজ সারতে লাগল। বাইরে থেকে সরলাদিদি হাসতে হাসতে বলেছিল, 'শুনলি তো কুমুদ।' সে কোন উত্তর দেয়নি। কাজ সেরে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কিছু চাই, সরলাদিদি?'

তখন সরলাদিদি চমকে উঠে বলল, 'আরে এতো শিগগির খাওয়া হয়ে গেল?'

'না—আমার খিদে নেই।'

'কেন? খিদে নেই কেন?'

'জানি না। আমার মাথা ধরেছে।'

'মাথা ধরা? বাজে বকিস না। এই তো কথা বলছিলি আর হাসছিলি।'

'না, সত্যি আমার মাথা ধরেছে।' জিদ করেই সে বলেছিল। সরলা এক পলক তাকে দেখে বলল, 'ওর কথায় রাগ হয়েছে বুঝি?'

'কার কথা?'

তার কথার প্যাঁচ হয়তো সরলাদিদি বুঝেছিল। সে বলল, 'বাজে কথা ছাড়। আমি বুঝতে পেরেছি।'

'না, সত্যিই আমার…'

'পাগলী, এতদিন এ বাড়ীতে আছিস আর ওর স্বভাব বুঝতে পারলি না? ও তো কথা বলেই মজা পায়। মনে কোন দাগ পড়ে না।'

'না দিদি, জানি না তুমি কি করে বলছ?'

'আরে! আমার কাছে কেন ঢঙ করছিস? আমি সব বুঝেছি। ওর ওপর তোর রাগ হয়েছে। পাগলী, ও যা বলে তা ওর মনেই থাকে না। ওর মনে মনে ফুর্তি হলে কিংবা লেখার জন্যে কোন নতুন জিনিষ মনে এলে শুরু না করা পর্য্যন্ত যাকে সামনে পায় তাকে নিয়েই ঠাট্টা তামাসা করে। এই ভাবেই ও বলেছে। ও তো তোর কথায় কান দেয়নি। আমি কি জানি না? আজ না হয় কাল তুইও ওর স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে যাবি।' হাসতে হাসতে সরলাদিদি আরো বলেছিল, 'যা, তোর থালা এখানে নিয়ে আয়। আমার সঙ্গে কথা বলতে থাক্। দেখি তোর কেমন খিদে নেই।'

কিন্তু তার ইচ্ছে হল না। মনের দুঃখে সেখানে বেশীক্ষণ থাকতেও পারে নি।

'না, বড় মাথা ব্যথা করছে। কিছু দরকার হলে ডেকো, আসবো।' বলে সে নিজের ঘরে পালিয়ে গিয়েছিল।

ঘরে এসেও মন স্থির হল না। অন্ধকার হয়ে গেলেও সে ঘরের আলো না জেলে বিছানায় পড়ে রইল। তার সারা মন পড়ে ছিল সদর দরজায়। শেষ পর্য্যন্ত সদর দরজায় শব্দ হল। সে ধীরে ধীরে উঠে নিঃশব্দে সরলার ঘরের দরজার কাছে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরে কথা হচ্ছিল। স্পষ্ট শোনা গেল না। শেষে রামন্নার গলা পাওয়া গেল, 'ছি, ছি, এ কী? ওর যদি দুঃখ হয়ে থাকে তো আমি মাফ চেয়ে নিচ্ছি…। ডেকে আনছি।' কথাটা শুনেই ওর মনে হল যে রামন্না তার ঘরের দিকে যাচ্ছে। তাতে সে ভয় পেয়ে পা টিপে ছুটে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কাল অনন্ত—এ কথার অর্থ কুমুদ সেদিন বুঝেছিল। রামন্নার আসতে যে দু

এক মিনিট লাগল তাতে তার মনে হলো যেন সে অনাদি কাল থেকে তার পথ চেয়ে আছে। হকচকিয়ে ছুটে আসার জন্যে তার বুকটা ধবক ধবক করছিল। এই ধুকপুকুনি রামপ্পা যেন না শোনে ভেবে সে দু হাতে বুক চেপে ধরেছিল। এই সময় রামপ্পা এসে গেল, ঘরে আলো না দেখে সে ইতস্তত করে চাপা গলায় 'কুমুদ, কু-মু-দ' বলে ডেকেছিল। সে কোন উত্তর দেয় নি। কী বা উত্তর দিত? ভয় ছিল যে সে যদি উত্তর দেয় তবে ও দরজায় দাঁড়িয়েই কথা বলবে, ভিতরে আসবে না। নিজের ধুকপুকুনি শুনতে শুনতে সে শুয়ে রইল। রামপ্পা ভিতরে এল, আর আবার নাম ধরে ডাকল, 'কোথায় কুমুদ? শুয়ে পড়েছ নাকি?' বলতে বলতে বিছানার ধারে এসে বসল। 'তোমার মাথা ব্যথা করছে নাকি?' বলে সে আঙুলি দিয়ে তার রগ টিপল। মোক্ষ কি? সুখ-দুঃখ দেশ কালের তারতম্যের অতীত এক সত্য ও সাত্ত্বিক সুখদ অবস্থা—কুমুদ এটা জানত না। জানলে বুঝত সেই মুহূর্তেই মোক্ষলাভ হয়েছে। তখন কুমুদের মনে হল যেন সে এই জীবনেই অমর হয়ে গিয়েছে।

'তোমার মাথা ধরেছে? ছিঃ পাগলী! মাথা ধরার জন্যে প্রথমে তো মাথা থাকা দরকার। যদি মাথা থাকতো তো আমার কথা ঠিক বুঝতে। তাই না? চলো, উঠে খেয়ে নাও। বেচারী সরলা কত কষ্ট পাচ্ছে।'

প্রথম কথাটায় কুমুদের হাসি পেল, পরে সরলার কথা শুনে অনুতাপ হল। কিন্তু সে উঠল না। ফিসফিস করে কথা বলে রামপ্পা যখন তার হাত ধরল তখন তার শরীরে যেন বিদ্যুতের শিহরণ লাগল। হাতের ছোঁয়ায় তার বুক আরো জোরে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। তার হাত ধরবার জন্যে উদ্যত রামপ্পার হাত অনুকূল অবস্থা পেয়ে আরো নিবিড় হয়ে গেল···। তখন কুমুদের মনে এক মুহূর্ত যেন এক যুগ—কিন্তু এই সময়ে 'অন্ততঃ সরলার খাতিরে খেয়ে নাও। চাও তো আমার ভুলের জন্যে পরে ক্ষমা চেয়ে নেবো,' বলে রামপ্পা তার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সে রাতে খাবার সময় তার হুঁশ ছিল না। যখন সরলাদিদি বলল, 'ভালই হলো বোন, পেট ভরে খাওয়া তো হলো,' তখন তার খেয়াল হল যে তার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। 'এখন তো আর মাথা ব্যথা নেই? বেশী খিদে পেয়েছে বুঝতে না পেরে মেয়েটা বোধ হয় মাথা ব্যথা বলে ফেলেছে।' সরলাদিদির ঠাট্টা শুনে তার মনে হল সে না জানি কত খেয়ে ফেলেছে। 'পেট ভরে খেলে কারো কথা গায়ে বিঁধবে না,' বলে সরলাদিদি একচোট নিয়েছিল। কোনরকমে খাওয়া শেষ করে সরলার মনের দুঃখ ঘুচিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে এল। একটা ঝঞ্ঝাট মিটে গেল ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিছানায় এলোমেলোভাবে শুয়ে পড়ল। আলো জ্বালালে পাছে মনের রেশটা কেটে যায় এই ভয়ে সে আলো জ্বালল না। তার

মনে একটা কথাই জাগছিল। রামন্না বলেছিল, 'পরে আমি মাফ চেয়ে নেব।' সে কি আবার তার ঘরে আসতে পারে? তার মনে হল আলো জ্বালিয়ে রাখাই উচিত। কিন্তু আলো থাকলে রামন্না তার লজ্জাভরা মুখ দেখতে পাবে। তাই সে আলো না জ্বালানোই স্থির করল। অন্ধকারে দরজার দিকে চেয়ে শুয়ে রইল। সত্যিই যদি রামন্না আসে? সত্যিই যদি ক্ষমা চায়? তার কি বলা উচিত? ছিঃ, এ কেমন পাগলামি? রামন্নার মত লোক তার কাছে ক্ষমা চাইবে কেন? আমারই প্রথমে বলা উচিত ছিল যে দোষ আমারই। রামন্নার কথা বলার কায়দা কেমন মজার! 'তোমার তো মাথা নেই।' বলবার সময় মাথাতেই হাত বোলাচ্ছিল। সেই সময় 'কুমুদ'-কথাটা শুনেই সে চমকে উঠল। রামন্নার গলা! 'হায় ভগবান, এসেই গেল' বলতে বলতে সে উঠতে চাইলেও পা দুটো তার ইচ্ছেয় সায় দিল না। ক্ষমা চাইবার ইচ্ছা হলেও মুখ দিয়ে কথা বের হল না। ঘরের অন্ধকারে তার দুরবস্থা দেখা গেল না। রামন্না হয়ত বুঝতে পেরেছিল যে সে ওঠে নি। সোজা এসে সে বিছানার ধারে বসল।

'মাথাধরা ছাড়ল?'

এখন কি জবাব দেবে? রামন্না তার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। তাই মাথায় কিছু ঢুকল না। উত্তর দেবে কী?

রামন্না আবার বলল, 'তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি, কুমুদ। যতক্ষণ না তোমার মুখ থেকে 'হ্যাঁ' বের হবে, আমি এখান থেকে নড়ব না।'

ওর তো অন্ততঃ 'হুঁ' বলা উচিত ছিল। সেই শব্দের ওপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হল না।

'আমি তো বলেছি যে না শুনে যাবো না,'—বলে রামন্না পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কুমুদের শরীর থরথর করে কাঁপছিল। সেটা রামন্না বুঝতে পারল না। 'আরে, সত্যি সত্যি জ্বর আসছে না তো?' বলে সে কুমুদের পেটের ওপর হাত রাখল। তার শরীর কাঁপছিল।

'তুমি হুঁ বলবে না। এ কি জিদ তোমার?' রামন্না তার কানে কানে বলল। রামন্নার মুখ এখন ওর মুখের কাছে। 'ওঠো, আর ন্যাকামি করো না,' বলে বাঁ পাশ ফিরে ডানহাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। জানি না তখন মুখের অবস্থা কেমন হয়েছিল। তার ঠোঁট আধ-খোলা হয়ে গেলেও কোন শব্দ বের হল না। 'তুমি মুখ বন্ধ করেছ তো আমিও মুখ বন্ধ করবো,' বলে তার মুখে মুখ রেখে রামন্না তাকে আরো চেপে ধরল।

সে রাতে কুমুদের এক অদ্ভুত ভয় হয়েছিল। প্রকৃতি স্ত্রীলোকের যে ধর্ম সৃষ্টি করেছেন, সে সম্বন্ধে তার না-ছিল কোন কল্পনা, না-ছিল কোন জ্ঞান।

তার একবার মনে হল, ধর্মের পথ অবশ্যই সুগম নয়। বাস্তব সত্যটা কি? দেহের জন্যে কষ্ট অথবা মনের জন্যে আনন্দ? কখনো কখনো কষ্টও আনন্দ দেয়। এ বোঝবার ক্ষমতা তার ছিল না। রামণ্ণার হাত যখন তার বুকে ঠেকল তখন সে হাতের স্পর্শ কেমন? সে স্পর্শে সুখ না দুঃখ কি ছিল তা সে বুঝতে পারে নি। তার মুখের ওপরে মুখ রেখে সে যখন কুমুদের নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল, তখন ওর মনে হল যে রক্তের সঙ্গে সুখও ফুটে বেরিয়ে আসছে। একটা অসহ্য বেদনা কিন্তু সেটা যে ব্যথা নয় তা বোঝাতেই যেন তৃপ্তি ভরা শীৎকার বের হল। রামণ্ণার মুখে 'কুমুদ, কুমুদ' শব্দ শুনেই কুমুদ তাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরল। রামণ্ণার দেহের সঙ্গে নিজের দেহটা মিশিয়ে দলে পিষে এক হয়ে যাবার দুর্বার প্রেমে সে যেন পাগল হয়ে গেল।

'প্রেম' শব্দটা মনে পড়তেই যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে পুরোণো স্মৃতি তাড়াবার জন্যে মাথা ঝাঁকাল। লম্বা নিঃশ্বাস নিল। 'প্রেম'—দু বছরে সে এই শব্দের শিকার হয়ে গিয়েছে। 'কুমুদ কুমুদ' বলে আঁধার রাতে যে তার হৃদয় কেড়ে নিয়েছিল সেই রামণ্ণা আজ—দূর হোক গে! সে ভাবল, এখন আর সে কথা ভেবে লাভ কী? সেই প্রথম রাতে সে তো দোষ করেনি। রামণ্ণা যদি অমন আচরণ না করত তো তার সাহসই হতো না। তার দোষ ছিল না। স্বেচ্ছায় সে পাপের পথে পা বাড়ায় নি। এ সব মিথ্যে। যা ঘটেছে তাই শুধু সত্যি। সে দীর্ঘশ্বাস টেনে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। জেগে থাকলে এই স্মৃতি তার পিছু ছাড়বে না। এই ভেবে সে শোবার জন্য তৈরী হল। হঠাৎ কি ভেবে চাদর সরাতে সরাতে মাঝপথেই হাত থামিয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

নয়

সুলভ বস্তুর প্রতি প্রথমে খুব টান হয়, পাওয়ার পর তার ওপর বিতৃষ্ণা আসে। রামণ্ণা চমকে ওঠে। একথা কেন মনে হল? হাতে যে বইটা ছিল, সেটাই পড়ছিল। ঐ বইয়ের জন্যে কি? তা তো সম্ভব নয়। তবে যে বইটা সে লিখছে সেজন্যে কি? কেননা কয়েকবার এইরকমই তার মনে হয়েছিল। কোন কথা বেশ দামী মনে হলেই তা লিখে ফেলার জন্য ছটফট করত। কয়েকদিন বাদে তা শেষ করার পর সেটার ওপর বিতৃষ্ণা জাগত। কেন? অল্প কয়েক-দিনের মধ্যে লিখে ফেলা বই কি করে দামী হতে পারে? কিন্তু এ কথাই

যা এখন মনে হল কেন? তার হাতে বই আছে বলে কি? হ্যাঁ, বোঝা গেল। আসলে বই হাতে নিয়েই এতক্ষণ সে স্মৃতিচারণ করছিল। ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ছিল যে দু আড়াই বছর আগে কুমুদ তার 'হাতে' এসেছিল। তার অবচেতন মনে কুমুদের প্রতি একরকম বিতৃষ্ণা জেগেছিল আর সেজন্যে সে যেন স্বস্তি অনুভব করছে। সুলভ জিনিষের আকর্ষণ বেশী হয় এটা সত্যি। তার আর কুমুদের সম্বন্ধের ব্যাপারে এ কথা খুবই সত্যি। সেদিন আলমারির সামনে তাকে জড়িয়ে ধরার সময় তার মুখের ভাব দেখে রামন্নার আশা হয়েছিল যে কুমুদ আগে থেকেই তাকে পছন্দ করে। তবু নিজের হৃদয়ের কথা রামন্নার পুরো বিশ্বাস হয়নি। কে জানে সরলাই যদি তাকে বলে থাকে? এই ভেবে সে ভয় পেয়েছিল। সে কথা মনে পড়লে আজও রামন্নার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। পরদিন সে সরলার কাছে ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু তার চোখে মোটেই ভয় ছিল না, রাগও ছিল না, বরং রামন্না কুমুদের দিকে তাকালে তার ভুরু জোড়া যেন তাকে স্বাগত জানাচ্ছিল। এতে তার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। তখন শুধু প্রথম ও শেষবার সে নিজের মনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে ওর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই ভালো। সরলার পাশে বসে গল্প করবার সময়েও গত রাতের সুখস্পর্শের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সরলার হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরেই সে সেই সুখস্মৃতি ভুলতে চেয়েছিল। ব্যাপার দেখে সরলা মুচকি হেসে বলেছিল, 'ভগবান আমাকে শক্তি দাও।' বুঝতে না পেরে রামন্না চমকে উঠে বলেছিল, 'কি বললে?' আগের মতোই হাসিমুখে 'কিছু না' বলে সরলা নিজে অশক্ত হলেও তার হাতে চাপ দিয়েছিল। সেদিন ঘর সাজাবার কথা নিয়ে আর একটা বিশেষ কথা হয়েছিল। কী কথা, হ্যাঁ মনে পড়েছে, পরদিন কুমুদকে সিনেমা নিয়ে যাবার কথা! সেও তো সরলার জন্যেই!

সে কথা মনে পড়তেই রামন্না ছবির দিকে ঘুরে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'পাগলী! আমি কতো চেষ্টা করেছিলাম, তুমি সে সব বদলে দিলে। তুমি নিজের জীবন নিজের হাতেই অন্যের হাতে তুলে দিলে। তাই বলছি, 'সরলা, এসব তোমারই ভুল।' সে যেন ছবিকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

যা ঘটে গেছে তার জন্যে সরলাকে দোষী করার সময় সরলার সরলতার কথা ভেবে রামন্না কষ্ট পায়। সরল মনে বলা কথাকে কি ভুল বলা যায়? কেন বলা যাবে না? বাস্তবের গতি যদি বিপরীতমুখী হয়, তো জীবনের রীতিও কেন বিপরীত হবে না? পাপের রোজগারের টাকায় কেউ মন্দির গড়লে লোকে কি তাকে 'পুণ্যাত্মা' বলে না? পাপের টাকায় যদি পুণ্য করা যায় তবে সৎ প্রেরণার আড়ালেই বা পাপ করা যাবে না কেন? কোন কাজ করার সময় মনের ভাবই প্রধান, না কি তারপর যে অনর্থ ঘটে সেটাই প্রধান? দেশকালের

সীমাতীত জগতে ক্রিয়াই প্রধান। তাই অনর্থই বড় হয়ে ওঠে। রামন্না আর ভাবতে চাইল না। সে পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো? কী এমন কথা? কী এমন সমস্যা যে সমাধানের জন্যে সে তত্ত্বজ্ঞানের পাহাড় হাতড়াচ্ছে? এই স্বভাবের জন্যেই মানুষ জ্ঞানকে নিজের দখলে রাখার বদলে শেষ পর্যন্ত সেই পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে গুঁড়ো হয়ে যায়। নিজেকে তিরস্কার করে তিক্ত হেসে সে আবার ছবিকে বললে, 'সরলা, দেখছো তো তোমার স্বামীর অবস্থা? তুমি ভাবতে যে সে যা খুশি তাই করতে পারে, কিন্তু যা করা উচিত নয় তাই করে সেটা সামলাতে না পেরে সে এখন পস্তাচ্ছে।' আস্তে আস্তে উঠে সে পায়চারি করে। হাত দুটো পিছন দিকে ধরা। মুখ নিচু করে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'হতচ্ছাড়া সিনেমায় গিয়েই এসব হল।' তাদের সিনেমা পাঠিয়েছিল তো সরলাই। তখন তার রাগ হল কিন্তু বুঝতে পারল না কার ওপর সে রাগ করছে। সেই রাগে সজোরে চেয়ারটা টেনে নিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে।

তার অন্তরে ছিল সিনেমার চিন্তা, সামনে ছিল দেওয়াল। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেদিন কুমুদকে সিনেমা নিয়ে যাবার কথা আবার তার মনে হল। চেয়ারে বসে থেকেই বাঁদিকে একটু ঝুঁকল যেন কুমুদ তার বাঁদিকে বসে আছে। সেদিন পাশে বসা কুমুদের শরীর ছোঁবার, তার হাতটা নিজের হাতে নেবার, কখনো বা বাঁ হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছে তার মনে জেগেছিল। কিন্তু সে সব চেপে রেখে কুমুদকে গল্পটা বোঝাতেই ব্যস্ত হয়েছিল সে। সেদিন কতো কথাই বলেছিল কিন্তু কুমুদ তো 'হুঁ' পর্যন্ত বলেনি। তবে অন্ধকারে কথা বলার সময় সে যখন এক আধবার তার দিকে তাকিয়েছিল আর সিনেমার আবছা আলোয় তার চোখ দুটো চকচক করছিল তখন তার মুখটা উঁচু করে ধরে চুমু খাবার ইচ্ছে হয়েছিল। তখন ঢোক গিলে কথা বলা বন্ধ করেছিল। এ দোষটা কার? তার নিজের না সরলার? এতদিন পরে রামন্না নিজেকেই সে কথা জিজ্ঞাসা করল।

দোষ যারই হোক, ঘটনা যেন ছকে বাঁধা নিয়মে ঘটতে লাগল। কুমুদের সিনেমা দেখার নতুন অনুভূতি আর রামন্নার কুমুদকে দেখার সুখ। পরদিন সে কি বলতে কি বলল কে জানে! কথাটা এত তুচ্ছ যে আজ তা মনেই নেই কিন্তু তা থেকেই এক অবিস্মরণীয় গল্প শুরু হয়ে গেল। কুমুদ রাগ করেছিল কিংবা তার মাথা ধরেছিল। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে রামন্না যখন তার ঘরে গেল তখন তার ধারণা ছিল যে নিজেকে সে সংযত করতে পারে। এখনো সেই প্রথম অনুভূতির কথা মনে আছে। তার হাত ধরে তোলবার জন্যে যখন সে হাত বাড়াল তখন যা ঘটে গেল তা এখনও মনে আছে। সে কথা মনে পড়তেই বুঝল তখন সে সভ্য

মানুষ ছিল না, পশু ছিল। (কিন্তু পশুদের কি স্মরণ শক্তি থাকে!) এখনও শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কুমুদও বুকের ওপর হাত রেখে শুয়েছিল। তার হাত ধরবার জন্যে হাত বাড়াতেই তা আঙ্গুল ছুঁয়ে তার বুকে ঠেকে গেল। কুমুদ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে কি না এই ভয়ে সে সন্ত্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু কুমুদ হাত সরিয়ে নিয়ে তার হাতেই যেন নিজেকে ছেড়ে দিল। রামন্না বড় কষ্টে নিজেকে সামলাল। সরলাকে বলে এসেছিল, 'কুমুদকে ডেকে আনছি।' কিন্তু যে সুযোগ মিলল সেটাও যে ছাড়া যায় না। তাই ভাবল, কী সুন্দর কথাই না বলেছিল? খুশি মনে বলেছিল, 'এখন তো সরলার কথামতো খেয়ে নাও, পরে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব।' তখন তার মনে হয়েছিল এর চেয়ে বেশী সুখ কোথাও নেই। কাম পরিতৃপ্তির জন্যে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ করার প্রাকৃতিক গুণ থেকেই বুঝি সুখ জন্মায়।

তা ছাড়া সুখের কথা ভাবারও এক বিশেষ কারণ ছিল। কুমুদের কাছে অভিজ্ঞতা ছাড়াও সে এক নতুন শক্তি পেয়েছিল। তখন সে একটা নতুন বই লিখতে শুরু করেছিল। আগের চেয়েও বেশি মন দিয়ে সে ঐ বইটা লিখছিল। এ ব্যাপারে রামন্না নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। সমাজের চোখে অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টিতে সে যা করেছিল তা অপরাধ, পাপ। কিন্তু তাতে মনে উল্লাস জেগেছিল, শরীরে শক্তি অনুভব করেছিল। কেন? সে কি কুমুদের প্রেমে পড়েছিল?

পরদিন সকালেই সে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিল। নিশ্চিত উত্তরটা ছিল—কুমুদের সঙ্গে তার প্রেম হয় নি। কেন না, সকালে উঠেই সে সরলার কাছে ছুটে গেল আর তার নতুন শুরু করা বইটার কথা বলল। তা শুনে সরলা যখন তার দিকে তাকাল তখন তার মনে হল যে সংসারে শুধু সরলা আর সে—এই দুজনই আছে, আর কেউ নেই! শুধু এইটুকুই নয়, সারাদিন সে সরলার কাছেই বসে রইল। যখন সরলা জিজ্ঞাসা করল, লিখবে না?' তখন উত্তর দিয়েছিল, 'রাতে লিখব।' পরে সরলা ঠাট্টা করে বলল, মিছিমিছি আমার কাছে কেন বসে আছ?' তখন উত্তরে বলেছিল, 'কারণটা বাইরে নেই, ভিতরে আছে, কারণ তুমিও ভিতরে আছ।' তাতে সে লজ্জা পেয়ে বলেছিল, 'শুরু হয়ে গেল তো তোমার মিষ্টি বুলি?' 'মিষ্টি নয়, সত্যি কথা। পাগলী, তুমি যদি ভিতরে না থাকতে তবে বই বাইরে আসত না,' বলে সে তার মাথায় চুমু খেয়েছিল। এই সব কথার জন্য যখন সে ভাবছিল যে সরলার উপরেই তার দৃঢ় প্রেম রয়েছে তখন সংশয় পিশাচ তার মনে প্রবেশ করল। সে ভাবল যে সরলার সঙ্গে প্রেম থাকার জন্যেই কি সে এমন ব্যবহার করছে? না, তার প্রতি যে অন্যায় করেছে তার ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে? বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সংশয় বাড়ল। সকাল থেকে সে যতই কুমুদের নজর এড়াচ্ছিল ততই তাকে দেখার ইচ্ছা বাড়ছিল। উচিত আর অনুচিত এই দোটানায়

মন এখন তৃতীয় পথ ধরে কুমুদকে আড়চোখে দেখতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রাতের খাওয়ার পর কিছুক্ষণ সরলার সঙ্গে গল্প করে 'এবার লিখতে যাই,' বলে চট করে উঠে পড়েছিল। বাইরে বের হবার সময় দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, 'কাল জানাব কতটা হল।' কিন্তু সে সময় তার চোখ ছিল ভিতরের দরজার দিকে। সেই দরজার পিছনে কুমুদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে 'এখন আমি আমার ঘরে যাচ্ছি,' বলে যেন কুমদকেই জানিয়ে দিয়েছিল।

দেহ আর মনের এই সংঘর্ষে অল্পদিনেই রামণ্ণা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দেহের ক্ষুধার তৃপ্তি পাওয়া যেত। অনেক সময় মনের প্রতিবন্ধকতায় দেহের ক্ষুধা আরো বেড়ে যেত। কিন্তু একথা বলা যায় না যে দেহ আর মন পরস্পর বিরোধী হয়ে সংঘর্ষ বাঁধাচ্ছে। কেন না প্রত্যেকবার যখনই শরীর তৃপ্ত হত, তখন মন হয়ে উঠত সতেজ-তীক্ষ্ন। এতে লেখক রামণ্ণা যেমন অবাক হল তেমনি ভয়ও পেল। মানুষের শিক্ষিত মনের ওপরে তাহলে শরীরের প্রভাব থাকতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে তো নীতি জিনিষটা আত্মপ্রবঞ্চনা হয়ে যাবে। ছিঃ ছিঃ! এটা ঠিক হচ্ছে না। মানুষ ক্ষুধার সময় যা পায় তাই খায় না। আকালের সময় এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তবে কাম বাসনার জন্যেও কি এটাই সত্যি? স্ত্রী শয্যাশায়ী হওয়াতেই কি তার আকালের অবস্থা হয়েছে? নয়ই বা কেন? প্রত্যেক নৈসর্গিক কামনা যদি ঠিক সময়ে তৃপ্ত না হয় তো সেটা মানুষকে পাগল করতে পারে।

নিজের জীবনকে রামণ্ণা প্রথমবার এভাবে বিচার করল; আর শেষবারও বলা যায়। কুমুদ এখনও বাড়ীতে আছে। সরলার বাধাও আর নেই। কিন্তু তার মন কুমুদকে চাইতে রাজী নয়। আজ তার মনে সিনেমা যাবার তীব্র ইচ্ছা ছিল, না গিয়ে ভালই হয়েছে। গেলে পুরোণো কথা মনে পড়ে যেত আর সে হয়ত পাগলের মতো পালিয়ে আসত। চেয়ার ছেড়ে সে আবার পায়চারি করে। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কি ভেবে মাথা নেড়ে বলে।

'বিড়বিড় করে কি বকছি?' রামণ্ণা নিজেকেই প্রশ্ন করে। ঐ কথাটা কেন তার মনে পড়ল? ওহ্! কাম শব্দটা মনে ঘুরছে বলেই এমন হল। জোর দিয়ে বলল, 'সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি।'—এটা এক ঋষি লিখলেও তার বুদ্ধি কতকটা বিকৃত ছিল। তা হলেও উপনিষদের যুগের এই বৃদ্ধ ঋষির কথায় কত না সত্য লুকোনো আছে। সংসার কি করে সৃষ্টি হয় তা সকলেই জানে আর সেইটে দাড়ীওলা গম্ভীরভাবে বললেও এতে বিকৃতি ছাড়া আর কি আছে? প্রথমে 'তিনি স্বয়ং' ছিলেন না অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিরূপে ছিলেন। তিনি কামনা করলেন, আমি অনেক হব, উৎপন্ন করব, তখন সৃষ্টি হল। জগতের মূল কতই সুগম! কিন্তু এতে নতুন কথা কি আছে? জগতের সৃজন শক্তি হচ্ছে কাম কিন্তু সেই জায়গায় যদি 'কাম বাসনা' শব্দ প্রয়োগ করা হয় তবে অসহ্য লাগে। যাই

হোক উপনিষদে কাম আর কাম-বাসনা দুটো শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। তাহলে কি দুটোই এক শক্তি নয়? একেই মূল শক্তি বলে মহর্ষির ঠাকুরদাদার বাবা উপকারই করে গিয়েছেন। ভালই হল যে তার সমস্ত কাজের জন্যে উপনিষদে সার্টিফিকেট পাওয়া গেল।

রামন্না চেয়ারে বসে আবার ঘড়ি দেখল। এগারোটা বেজে গেছে। সেও যেন পাগল! এতক্ষণ ধরে মাথা খারাপ করছে। সে সরলাকে ভালবাসত না কুমুদকে? কী প্রয়োজন এই প্রশ্নের? সরলা তিন মাস হল মারা গেছে। কুমুদের প্রতি তার আর কোন আকর্ষণ নেই। এ জেনেও এ বিষয়ে চিন্তা কেন? ঘুম না আসা পর্যন্ত একটা সংস্কৃত বই পড়া যাক। উপনিষদের কথা মনে পড়ে উপকারই হল। ভাবতে ভাবতে টেবিলের সামনে রাখা শেলফ থেকে বই বাছতে থাকে।

দশ

শোবার জন্য তৈরী হয়ে বিছানার চাদর সরাতে হাত তুলতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কুমুদ চমকে উঠল। এগারোটা বেজে গেছে। সময়টা মনে হতেই কুমুদ স্তব্ধ হয়ে গেল। ঠিক এই সময়টা কখনও ভুলতে পারা যায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে কোন রকমে বিছানায় বসে পড়ল। একটু আগেই ভেবেছিল সে সরলাদিদির প্রতি কোন অন্যায় করে নি। ভুল ভেঙে গেল। রাত এগারোটার কথা মনে পড়তেই অতীতের এক ছবি তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। নিজের সততা সম্বন্ধে যে বিশ্বাস, সেটা চলে গেল; রাত এগারোটা, সেদিনও এই সময় ছিল। রামন্নার বাহু বন্ধনে ধরা দেবার দু তিন দিন পরের কথা। প্রথমে ভয় পেয়েছিল, শুরুর কথা মনে পড়তে ভয় আরো বেড়ে গিয়েছিল। পরদিন ওঠবার সময় পা থরথর করে কাঁপছিল। সরলাদিদির সামনে যাবার সাহস তার হল না। রামন্না কি এখন তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে? অন্ধকারে যে মুখে সহানুভূতি ছিল, চোখে ছিল বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বলতা, সে সব কি এখন অন্যরকম দেখাবে? সে কি ওঁর সামনে দাঁড়াতে পারবে? এই সব ভাবতে ভাবতে সে নিজের কাজে লেগে গেল। কিন্তু রামন্না বা সরলার কোন পরিবর্তন না দেখে সে অবাক হল। পরের রাতেও রামন্না এসেছিল। সেদিন আর কথা বলার অবসর ছিল না। শুধু তৃতীয় রাতে না জানি কি করে ধৈর্য ধরেছিল।

সে রামন্নার প্রতীক্ষায় বসেছিল। রামন্না এসেই বললে, 'প্রেরণা দেবী, কৃপা দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ তো?

কথা বলার ইচ্ছে হলেও অধীর আগ্রহে সে শুধু মাথা নেড়েছিল।

রামন্না কাছে এসে তার মুখটা ধরে মুখের কাছে এনে বলল, 'মাথা নাড়া যদি শক্ত হয় তো মুখেই বল।'

এরপর সে বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতা আমার···' কথাটা শেষ করতে পারে নি।

'তুমি কি ভাবো, মুখ থেকে শব্দ বের হলেই তা কথা হয়?'

'মানে?'

রামন্না বললে, 'মানে আবার কি? এ চার দিন আমার চেয়ে তুমিই তো বেশি কথা বলেছ।'

'এ সব আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'ও বাবা! না বুঝেই এত কথা বলেছ। বুঝলে না জানি কত কথাই না বলতে।'

কুমুদ ভয় পেয়েছিল, সে হয়তো ঘুমের মধ্যে কিছু বলে থাকবে।

'স্বপ্নের মধ্যেই কি···' সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রামন্না হেসে উঠল।

'পাগলী! স্বপ্নে? আরে এতো আমার কাছে স্বপ্ন! তুমি তো জেগেই আছ। এত ভয়ে ভয়ে আমায় দেখছ কেন? এইজন্যেই তো বলেছিলাম যে মুখ থেকে শব্দ বের হলেই কথা বলা হয় না। তোমার চলাফেরা, তাকানো, তোমার আধখোলা ঠোঁটেও কথা ঝরে পড়ে। শুধু কি তাই, তোমার মৌণতাও মুখর হয়ে ওঠে। এই সবের জন্যেই কি আমি পাগল হয়ে যাইনি? বলো, বলো, মুখ খোল' বলতে বলতে সে নিজের মুখ নামিয়ে এনে কুমুদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। রাতে অন্ধকারে যখন দুজনে শুয়েছিল তখন রামন্না চুপিচুপি কত কথাই না তাকে বলেছিল। 'তুমি আমার প্রেরণা দেবী। মিথ্যে বলছি না। বিশ্বাস না হয় আমার ঘরে গিয়ে দেখে এস। তোমার কাছে প্রেরণা পেয়েই আমি নতুন বইটা লিখতে শুরু করেছি।'

'হ্যাঁ···পাগলী আমার! এক রাত যদি তোমায় না দেখি তো আমার কলম বন্ধ হয়ে যায়···তোমার জন্যেই আমার মনে নতুন চিন্তা এসেছে···তুমিই আমার সাহিত্য জীবনের প্রাণ।' মনে পড়ে না সে আরো কি কি সব বলেছিল। শুনতে শুনতে সেও জ্ঞান হারিয়েছিল। পাছে রামন্না তাকে ছেড়ে যায় এই ভয়ে সেদিন সে নিজেই তাকে স্বীকার করেছিল। এ সবের জন্য পরের দিন সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

রামন্না এখনও আসে নি। ঘড়ি দেখল। ঠিক এগারোটা বেজেছে। এত দেরী?

রোজ যে তাড়াতাড়ি আসে সেই রামপ্পা আজ এখনও এল না! প্রতীক্ষা অসহ্য মনে হল। এক মিনিট দম বন্ধ করে কান খাড়া করল। কোথা থেকে যেন ফিস ফিস করে কথা বলার শব্দ আসছে। এ সময় কে কথা বলছে? সরলাদিদি তো ন'টার সময় ঘুমিয়ে পড়ে। হ্যাঁ, রামপ্পা হয়তো কিছু পড়ছে। তাতেই মগ্ন হয়ে হয়তো এদিকে আসার কথা ভুলে গেছে। তখন কুমুদের মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল! আমাকে ভুলে রামপ্পা বই পড়ছে? চুপি চুপি গিয়ে দেখা দরকার। বলবো, আপনিই তো আমাকে প্রেরণা দেবীর সার্টিফিকেট দিয়েছেন আর ঘরে এসে দেখতে বলেছিলেন, তাই এসেছি। তাকে দেখে রামপ্পা চমকে যাবে। এ কথা কল্পনা করে সে খুশি হয়ে নিজের মনেই হাসল। নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে পা টিপে টিপে রামপ্পার ঘরের কাছে গেল। তারপর যেন বজ্রাহত হয়ে দেখল ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতরে আলো জ্বলছে। এ দেখে সে যত না হতাশ হল, তার দ্বিগুণ রাগ হল অন্য এক দৃশ্য দেখে। সেই ফিস ফিস শব্দটা সরলার ঘর থেকে আসছিল। দরজা অর্দ্ধেক খোলা, ভিতরে জোরালো আলো। এই দেখেই তার রাগ। ইচ্ছে হল, তখনই ঘরে ফিরে খিল লাগিয়ে আলো নিভিয়ে বিছানায় মড়ার মত পড়ে থাকে। এতে রাগ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এক অজানা কৌতুহল তাকে সরলার দরজার কাছে টেনে নিয়ে গেল। একবার মনে হলঃ রামপ্পা সরলার সঙ্গে গল্প করতে করতে তাকে ভুলে গেছে। পরক্ষণেই মনে হলঃ রামপ্পা নিজের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছে, এসব ভাবতে ভাবতে সে দরজার কাছে পেঁছে গেল। তখন তার কানে গেল সরলার একটা কথা। 'এইটুকু হলেই আমি সুখে চোখ বুঁজতে পারি।' শুনেই কুমুদ ভয় পেল—'দিদির কি অন্তিম দশা ঘনিয়ে এসেছে।' ঘরে ঢুকতে যাবার উপক্রম করতেই রামপ্পার কথা কানে এল, 'এখন আমার যে সুখ এরচে বড় সুখ আমার নেই।' কুমুদের আর সহ্য হল না। সে ঘরের ভিতর একটু উঁকি মারতেই যে দৃশ্য দেখল তাতে ঝড়ের ঘায়ে আছড়ে পড়ার মতো ঘরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

হাতের ঘড়িটা দেখে কুমুদ আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে জানত, যতক্ষণ না মন শক্ত করে সে ঘুমিয়ে পড়ছে ততক্ষণ এই পুরোণো স্মৃতিগুলো তাকে জ্বালাবে। সে সব স্মৃতি সত্যিই কষ্টের। তার উপর সরলাদিদির মৃত্যুতে সে ভীষণ আঘাত পেয়েছিল। সেদিন খুব অন্যায় করেছিল। সে দৃশ্যটাই বা কেমন? যাক গে, এমন কুৎসিত কৌতুহলই বা কেন হয়েছিল তার? বেচারী সরলাদিদি মাসের পর মাস বিছানায় পড়ে আছে। তার মনে কতো না দুঃখ। এই সময়ে স্বামী যদি তাকে একটু সান্ত্বনা দেয় তাতে দোষটা কি? অপরের সেটা অন্যায় বলবার কি অধিকার আছে? তা ছাড়া তখন সে কীই বা দেখেছিল? স্বামীর কোলে মাথা রেখে সপ্রেম দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে শুয়েছিল সরলা। স্বামী একহাতে

তার চুলে হাত বোলাচ্ছিল আর অন্যহাতে তার একটা হাত নিজের গালের উপর রেখে হাসিমুখে তার মুখ দেখছিল। শুধু এইটুকুই তো সে দেখেছিল সেদিন।

কিন্তু সে দৃশ্য দেখে সে জ্বলে উঠেছিল, না! নানারকম ভাবনা তার মনের মধ্যে পাক খেয়েছিল। জীবনে আর কোনও সুখ নেই। দ্বিতীয়বার তাকে আর নিজের ঘরে পা রাখতে দেওয়া উচিত নয়। তার হাত যেন এ শরীর আর না ছোঁয়। সে কেমন করে দেখছিল। বুকে যেন শেল বিঁধেছিল। ধাপ্পাবাজ, মিথ্যুক! সে এখানে পথ চেয়ে বসে আছে, ওদিকে উনি রুগ্ন স্ত্রীর বিছানায় বসে আছেন। মরে গেলেও চোখ তুলে ওর দিকে আর চাইব না। ওর সঙ্গে আর কথা বলাও উচিত নয়। আসতে হয় তো আসুক—পরে মনে হল যে সে ঘরের ছিটকিনি বন্ধ করেছে। তবে সে আসবে কি করে? না এলে মনের কথা শোনাবেই বা কি করে? দরজা বন্ধ দেখে বাইরে থেকেই 'ভালোই হলো' ভেবে চুপি চুপি ফিরে যেতে পারে তো! ওকে এ সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না। ওকে এখানে ঢুকতে দেওয়া উচিত যাতে সে তাকে শুয়ে থাকতে দেখে। তারপর দেখা যাবে। এই ভেবে শুধু খিল নয়, দরজাও খুলে আলো জেলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিবি তো বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, আর কাকে ভয়। নিজের মনেই সে বলেছিল।

কতক্ষণ যে সে শুয়েছিল তা মনে নেই। এখনি আসবে, এক মিনিটের মধ্যেই আসবে। এলেও সে তাকে মুখ দেখাবে না। সেই ভেবে সে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইল। এখনও রামন্না এল না। থেকে থেকে মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখেছিল।

সে রাতে নিজের আচরণের জন্য কুমুদ আজ অবাক হল। তার কতই না রাগ হয়েছিল। তাতে কি? শেষে যখন রামন্না এল তখন কি হল? ভেবে রাখা কথাগুলোর একটাও কি বলতে পারল? এ কারণে রামন্নার উপর রাগ হল তার। রামন্না আসবে, এসেই তার সঙ্গে কথা বলবে, দেরির জন্যে তার রাগ দেখে নানা কৈফিয়ত দেবে, তখন সে কথা না বলে মুখ ঘুরিয়ে থাকবে আর শেষে মুখ ঝামটায় তার মন ঝাঁঝরা করে দেবে। শুয়ে শুয়ে এইসবই ভেবেছিল সেদিন।

কিন্তু রামন্না এসেই প্রথমে দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দিল। এর ফলে কুমুদের যেন একটা অস্ত্র হাতছাড়া হয়ে গেল। কেন না, অন্ধকারে কথা না বলে কি করে আর রাগ দেখানো যাবে? এইজন্যেই তো সে মুখ ঘুরিয়ে শুয়েছিল। রামন্নার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। ওঃ! এটাও ঠকাবার একটা ঢঙ ভেবে সে অন্ধকারেই চোখ বুঁজে পড়ে রইল। ভেবেছিল সে মোটেই নরম হবে না। শক্ত হয়ে থাকবে। দু এক মিনিটের মধ্যে রামন্না পাশে এসে শুয়ে পড়ল। সে দূরে সরে গেল। তখন সে হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিল। মনে ভালো লাগলেও

অন্ধকারের জন্য সে রামম্লার দিকে মুখ ফেরাল না! ভাবল একবার কথা তো বলুক তখন দেখাব। কিন্তু রামম্লা কথাই বলল না। নিজের অভিজ্ঞ হাত তার শরীরে বুলিয়ে বুলিয়ে সাপুড়ে যেমন করে সাপকে বশে আনে তেমনি ভাবে সে তাকে বশে আনল। রামম্লার স্পর্শে তার শরীর যেন বরফের মত গলতে আরম্ভ করল। তার শরীর মিশে গেল রামম্লার শরীরের সঙ্গে এক হয়ে। প্রকৃতির সামনে কৃত্রিম ক্রোধ জল হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সব কিছুকে ভুলে গিয়ে তাৎক্ষণিক সুখে মগ্ন হয়ে গেল। এমন অভিজ্ঞতার অনুভূতি যে দিয়েছে সেই রামম্লার উপর সে কি রাগ করতে পারে? পূর্ব জন্মের কোন পুণ্যের ফলে সে এখন এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেল? এই সব কথা ভেবে কুমুদ রামম্লাকে জড়িয়ে ধরার জন্য হাত বাড়াল। কেউ নেই। এ কি? স্বপ্ন না ভৌতিক কাণ্ড? ভাবতে ভাবতেই সে শব্দ পেয়েছিল যেন কেউ চুপি চুপি দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। রামম্লা চলে গিয়েছিল।

এ কী? এমন কেন হল? কুমুদ ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসেছিল। সে কেন এল? আবার চলেই বা গেল কেন? এ সব প্রশ্নের উত্তর কুমুদের কি জানা ছিল না? হয়ত রামম্লার আর তাকে দরকার ছিল না। গায়ের এলোমেলো কাপড়, মাথায় ঝরে পড়া ঘামের ফোঁটা, ধক ধক করে কাঁপা বুক, ভিতরে ও বাইরে আঘাত পাওয়া স্তন, কম্পমান উরু, এই সব ছিল রামম্লার এসে চলে যাওয়ার সাক্ষী। কিন্তু তার এসে চলে যাবার কারণ কি এই? দেহ ছাড়া তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই?

একবার মনে হয়েছিল যে সে রেগে আছে ভেবেই রামম্লা এভাবে চলে গেছে। সে হাঁফাচ্ছিল। বেচারা! তার হয়ত মনস্তাপ হয়েছে। কী হবে? একটু আগে সে সরলার কাছে বসেছিল। সেখানে কিছু হয়নি তো, সরলাদিদি তাকে কোন কটু কথা বলেনি তো? এই কথা মনে আসতেই কুমুদের মনে হল যে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে। যদি সরলাদিদি জানতে পারে? একটা ভয় শিরশিরিয়ে উঠল। পরক্ষণেই তার পুরোণো রাগ যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। শয্যাশায়ী মৃতপ্রায় সরলা রামম্লার মতো লোকের মনে নিশ্চয় কষ্ট দিয়েছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল। হ্যাঁ, সে কিছু বলেছিল ; কি বলেছিল? এইটুকু হলেই আমি সুখে চোখ বুঁজতে পারি। এইটুকু মানে কতটা? কী? চিরকালের রুগী কি ভাবছে যে তার স্বামী তার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকবে? তার সুখদুঃখের দরকারই বা কী? সে চোখ বুঁজলেই তো অপরের সুখ হয়—

কুমুদ অস্থির হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সে কাঁপছিল। পুরোণো স্মৃতি তাকে যেন মোচড় দিচ্ছে। সেদিনের কথা মনে পড়ায় কুমুদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তার মনে হল যে সেদিন সরলাদিদির সম্বন্ধে সে যা

ভেবেছিল তাতে পাপ ছিল। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তাকে করতে হচ্ছে। বেচারী সরলাদিদিকেই সে কি নিজের সুখের পথের কাঁটা ভাবে নি? আজ তো সরলাদিদি কোনও বাধা হয়ে নেই, তবু তার সুখ নেই। এখন কুমুদ বুঝতে পেরেছে, কারও সুখ আর দুঃখ অপরের হাতে থাকে না। ক'বছর আগে অর্থাৎ সরলাদিদি যখন বেঁচে ছিল তখন যদি তা জানতো? কিন্তু তখন তা জানা সম্ভবই ছিল না, কেননা তখন তার সুখের কল্পনাই ছিল না, রামন্নার সান্নিধ্যেই তার সুখ ভেবে রামন্নাকে সরলা-দিদির কাছ থেকে নিজের দিকে টেনে আনাই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। রামন্নাকে পাওয়া যে রামন্নার উপর নির্ভর করে এ কথা তখন তার মনে জাগে নি। সে এক পাগলামি। সান্নিধ্য বলতে শুধু দেহের সান্নিধ্যের সুখটাই বুঝেছিল, এখন সেই সান্নিধ্য অসহ্য লাগছে।

নিজের সুখের পথ কোনটা তা নিজেই তো জানত না। সে সময় সে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছিল। এখন সে বুঝছে যে সেটা তারই ভুল। সরলাদিদির সম্বন্ধে যা তা ভাবা পাপ।

কুমুদের মনে হল যে এসব কথা ভুলে যাওয়াই উচিত কিন্তু কথাটা তার বারবার মনে পড়ায় এই ভেবে সে সান্ত্বনা পেল যে যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে, এখন অনুশোচনা করলেই প্রায়শ্চিত্ত হবে। সে রাতে রামন্নার সেই রকম যান্ত্রিক পুতুলের মত এসে ফিরে যাবার পর রাগ, হিংসা, দ্বেষ সব যেন ভূতের মত একের পর এক তাকে চেপে ধরেছিল। সে নিশ্চিত হয়েছিল যে রামন্নার সঙ্গে তার সত্যি প্রেম হয়েছে; আর সরলা সেই প্রেমের পথে কাঁটা। রামন্না তার জীবন। তাকে ছাড়া সে চোখে অন্ধকার দেখে। এ বিষয়ে তার প্রত্যয় যতো বাড়তে থাকে, সরলার সম্বন্ধে তার ভয় ততো কমে। এমন প্রেমের সামনে কি সরলাদিদির মতো অশক্ত নির্জীব রুগী দাঁড়াতে পারে? যত ঘুম আসতে লাগল, কুমুদের মনে সরলার জন্যে ততো করুণা হল। তার সম্বন্ধে অকারণে চিন্তা কেন? যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না তাকে তার ভয় কি? রামন্না তার কাছে কি সুখ পেত? তার বেঁচে থাকা আর না থাকা দুইই সমান। তার সঙ্গে এখনকার মত ব্যবহার করে গেলেই তার কোন সন্দেহ হবে না। এই যুক্তিতে সে নিজের মনেই খুশি হয়ে উঠেছিল। রামন্না তার সমস্ত হৃদয় অধিকার করে রয়েছে। সেখানে আর কারও স্থান হতে পারে না। এই ভেবে সে একটু সান্ত্বনা পেয়েছিল।

কিন্তু রামন্নার দীর্ঘশ্বাসের কথা মনে করে সে আবার ভাবতে বসল। তার মনে নিশ্চয় কোন কষ্ট আছে। সেটা কি? সেটা তো দূর করতে হবে। স্ত্রীর কোন কথায় কি তার মনে হতাশা জেগেছে? সরলাদিদি হয়ত জানতে পেরেছে কিংবা সরলাদিদি জেনেছে এ কথা জানলে আমি ভয় পাব তাই হয়ত রামন্নার

সন্দেহ হয়েছে? সেইজন্যেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। ছিঃ, যদি এই কথাই হয় তবে সে মনস্তাপ কতক্ষণের জন্য? যদি কেউ আমাকে শেষনাগ দিয়ে জড়িয়ে আটটা দিগ্‌গজ দিয়েও টানে তবু আমার মন রামন্নাকে ছাড়বে না। এ কথা কি সে জানে না? কুমুদ সে রাতে ভেবেছিল রামন্নার প্রতি তার প্রেম কত গভীর! শেষে শোবার সময় সে প্রার্থনা করেছিল, 'হে ঠাকুর, এইটুকু করো, আমি তাকে যেমন ভালবাসি সেও যেন আমায় তেমনি ভালবাসে। এইটুকুই যথেষ্ট। তাহলে আর কাউকে আমার ভয় নেই, আমি আর কিছু চাই না।'

সবই কুমুদের এখন অসহ্য মনে হল। সেদিন কি দুর্বুদ্ধি হয়েছিল? না সদ্‌বুদ্ধি? 'সে যেন আমাকে ভালবাসে' এই কথাই সেদিন তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল। সে কথায় যে অর্থ লুকোনো ছিল দু আড়াই বছর পরে আজ তা কুমুদ বুঝতে পারল। রামন্না যে তাকে ভালবাসে না এ আশঙ্কা তখনও তার মনে ছিল। তাই তাকে নিজের দিকে টানবার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়েছিল। এতে যে আশঙ্কার কিছু নেই সেটা তখন সে বুঝতে পারে নি। এখন বুঝেছে···কথা শেষ না করেই কুমুদ বিছানা থেকে উঠল। ঘুম পাবার জন্যেই হোক বা মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বেই হোক—যন্ত্রের মত বিছানা ঠিক করে নিয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে নিঃশব্দে একটা হাই তুলল।

এগার

দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি, জলনিধের্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি, বিধিরভিমতভিমুখীভূতঃ॥

রামন্না চোখ রগড়ে দুবার দেখল। এ কী? কতক্ষণ ধরে ঐ শ্লোকটা সামনে রেখে সে বসে আছে? তার মনে আছে—আজে বাজে চিন্তা দূর করার জন্যে সংস্কৃত বই পড়বে ঠিক করেছিল। খুঁজতে খুঁজতে শ্রীহর্ষের রত্নাবলী তার হাতে এল। প্রথম যৌবনে নাটকটি তাকে প্রভাবিত করেছিল, সেটি হাতে আসায় তার বড় আনন্দ হয়েছিল। চেয়ারে আরাম করে বসে টেবিলে পা তুলে দিয়ে বইটা পড়তে শুরু করেছিল। সূত্রধার প্রস্তাবনার পরে 'দ্বীপাদন্যস্মাদপি' শ্লোকটা বলছে। ঐ শ্লোকের অর্থ সবসময় তার মনকে প্রভাবিত করত। বুদ্ধি ও তর্কে বিশ্বাসী রামন্নার কাছে ও-দুটোর চেয়ে বড় এক অঘটনঘটনপটিয়সী প্রকৃতির যুক্তি (হয়তো শক্তি হবে) সব সময় মজার ঠেকত। সেই কথাটা শ্লোকে

ছিল বলে ঐ শ্লোকটা তার ভাল লাগত। বিধি বলতে বোঝাচ্ছে প্রকৃতির ঐ যুক্তি (অথবা শক্তি)। যদি সে চায় তবে দুই আলাদা দ্বীপ থেকে অথবা দশ দিগন্ত থেকে কোন প্রসঙ্গ কিংবা লোককে এনে নিজের প্রভাব দেখিয়ে দেয়। মানুষের কাছে যে ঘটনা আকস্মিক বলে মনে হয়, প্রকৃতির কাছে সেটা সুনিয়ন্ত্রিত ঘটনা। যেমন মজাদার, তেমনি খাঁটি। এটি সর্বোৎকৃষ্ট শ্লোকের দলে পড়ে। 'দ্বীপাদন্যম্…' পড়তে গিয়ে রামন্না নিজেকে সামলে নিল। ও সব তো ঠিক আছে। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল, এতক্ষণ সে এই শ্লোকটার চারপাশেই ঘুরছে। কেন এমন হল? রামন্না দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ঐ বইটার সাহায্যে যে কথা ভোলবার চেষ্টা সে করছিল, এই শ্লোক দিয়েই সে কথা আবার তার কাছে ফিরে এল। দাঁতের ফাঁকে আটকানো তরকারির খোসার মতন সেটা তাকে জ্বালাতন করছে। জিভ নানা ভাবে ঘুরিয়ে তাকে বের করা দরকার, না হলে স্বস্তি নেই। কিন্তু কোন কথাটা? একটু আগেই না সেটা মগজ তোলপাড় করছিল? সেই স্মৃতিটাই।

একটু আগে সে নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল, 'সে কি সরলাকে ভালবাসে, না কুমুদকে?' পরে 'এ সবে কার দরকার?' বলে কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছিল। এই সেই প্রশ্নই শ্লোকের মারফৎ অনর্থ সৃষ্টি করছে। 'এ সবে আর কার দরকার' বলে আজ সে উদাসীন হতে পারে, কিন্তু দু বছর আগে তার মনের অবস্থা ছিল অন্যরকম। তখন সে প্রশ্ন দুটোর মধ্যে একটার উত্তর নিশ্চয় করে জানতে চেয়েছিল। একদিন, না একরাতে বলা উচিত--এই প্রশ্নগুলো তাকে বেশ কষ্ট দিয়েছিল। একবার একটা, পরে অন্য উত্তরটা তার ঠিক বলে মনে হয়েছিল। সে রাতে মনের এই দ্বন্দ্বে ক্লান্ত হয়ে সে যেন পশু হয়ে গিয়েছিল। রামন্না সেদিন ভেবেছিল যে মানুষ আর পশুর পার্থক্য শুধু বুদ্ধির জন্যেই। বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হলেই মানুষ পশুর স্তরে পৌঁছে যায়। হ্যাঁ, সে রাতে সেই শ্লোকটাই তার মনে পড়েছিল।

সে রাতে কুমুদের সঙ্গে সে পশুর মত ব্যবহার করেছিল। এ কথা আজও তার মনে হচ্ছিল। সেদিনও মনে হয়েছিল। সেদিন কেন এমন হল? হ্যাঁ, সেদিন তার মন গোলমালে পড়েছিল। তখন তিন চার দিন থেকে কুমুদের সঙ্গে রাতে কিছু সময় কাটাচ্ছিল। ইন্দ্রিয় সুখের জন্য, নাকি যুবতী নারীর সঙ্গলাভের উৎসাহে? কারণ যাই হোক না কেন, একটা নতুন অনুভূতির স্বাদ সে পাচ্ছিল। তিন চার দিন পর্যন্ত সেটা বন্ধ হয়নি। সেদিন রাত প্রায় সাড়ে দশটার পরে কুমুদের ঘরে যাবার জন্য সে উঠল। নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে সে আবার দরজা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় সরলার ঘর থেকে কাশির শব্দ শোনা গেল। সেই অপ্রত্যাশিত শব্দে সে চমকে উঠল। হাত কেঁপে যেতে দরজা নিঃশব্দে বন্ধ

হল না। তৎক্ষণাৎ কিছু ভেবে নিয়ে সে সরলার ঘরে গেল। তার ব্যাপারটা যেন সকলেই বুঝতে পারে। হঠাৎ বের হতে গিয়ে শব্দ হয়েছে। কিন্তু সরলার ঘরে ঢুকতেই সে নিশ্চিন্ত হল। সরলার মুখে ক্লান্তির চিহ্ন। চোখের কোণে একটু কালি পড়েছে। দুর্বলতার জন্য শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। তা সত্ত্বেও তাকে দেখে সরলা হাসবার চেষ্টা করল। কি আশ্চর্য নিজের কষ্ট হলেও তা দেখাতে চায় না। অপরকে খুশি করবার ইচ্ছা জাগে। এই দেখে রামন্নার মনে হল তার গলায় কিছু যেন আটকে গেছে। ঘরে ঢুকেই সে তার পাশে বসে সর্বাঙ্গে হাত বোলাতে শুরু করেছিল।

সে বলেছিল, 'কি হয়েছে আমার যে তুমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলে?'

রামন্নার মুখ দিয়ে উত্তর বের হল না।

'লেখা ছেড়ে উঠে এলে তো?

রামন্না প্রসঙ্গ বদলে উত্তর দিল, 'কী এমন দামী লেখা লিখছিলাম?'

'মিথ্যেই আমার বেঁচে থাকা! নিজেরও সুখ নেই অপরেরও সুখ নেই,'' এই বলে চোখের জল আটকাবার চেষ্টা করতে করতে সে পাশ ফিরল।

রামন্না মিনিট খানেক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার চির অভ্যস্ত হাত সরলার পিঠের উপর ঘুরছিল, রামন্নার স্পর্শে সরলার কষ্ট একটু কমল। সেই মৌনতার মধ্যে দিয়ে দুটি হৃদয় এক হয়ে গেল। রামন্না প্রথমে বলেছিল, 'সরলা, শরীরটা কি বেশি খারাপ লাগছে?'

শুয়ে শুয়েই মাথা নেড়ে সরলা জানাল, 'না তো।'

'তবে এখনো ঘুম এল না কেন?' এই সময় বুকে কাঁটার জ্বালা অনুভব করে সে আবার বললে, 'আমাকে ডাকলে না কেন?'

সরলা চুপ করে রইল।

রামন্না তাকে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে চিবুক স্পর্শ করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বলো কি হয়েছে?'

'কিছু না তো!'

'না, মিছে কথা বলছ। মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু হয়েছে।'

সে হেসে বলেছিল, 'কিছুই তো হয়নি।'

'তবে ঘুম এল না কেন?'

'কত ঘুমোব? ক' বছর ধরে তো চলছে। না জানি কবে শেষ হবে।'

'ছিঃ পাগলী! যত বলি এ সব কথা ভেব না, তবু যা তা ভাব।'

'আমিই বা কি করি? নিজেরই এত বিরক্তি লাগে। আর অপরের না জানি কত খারাপ লাগে।'

'এক জায়গায় পড়ে থাকার জন্যই তোমার এমন লাগছে। আমার খারাপ লাগবে কেন? তুমি শিগগির ভাল হয়ে যাবে এই আশাতেই তো আমার দিন কাটছে।'

'আমি আবার ভাল হবো! বাজে কথা। সব রকম ওষুধ ইনজেকশন হল, কোন ডাক্তার দেখানো বাকি নেই'—

'তাতে কি? তুমি সেরে উঠবে না জেনেও কি আমি এ সব করছি?'

'তুমি তো নিজের কর্তব্য করছ। কিন্তু যে রোগ সারবার নয়, তাতে আর কে কি করতে পারে?'

রামণ্ণা হেসে প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করল। 'কর্তব্য মানে? এত বছর ধরে স্ত্রী হয়ে থাকলে, রেঁধে বেড়ে খাওয়ালে, ঘরদোর সামলালে, আমার ছেঁড়া কাপড় সেলাই করলে, জামার ভাঙা বোতাম বদলে দিলে, এ সব হিসেব করে এত দিনের যত বিল হয়েছে সেই টাকা চিকিৎসার জন্যে'—

'বাজে কথা ছাড়। তুমি কি জাননা আমি তা বলতে চাইনি—যে গাছ মরতে বসেছে কুঁয়ো থেকে জল তুলে তাতে দিয়ে কি হবে?

'দ্যাখো সরলা, তুমি মরার কথা বলো না। তোমাকে কি করে বাঁচিয়ে তুলবো সে ভার আমার। ঠিক কি না? আর একটা কথা। বিছে দেখতে পেলেই 'আস্তিক আস্তিক' বলে ডেকো।'

সে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'সে আবার কী?'

'এ সব কথা মনে এলেই আমায় ডেকো। আমি এসে তোমার পাশে বসে থাকব।

একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরলা বলল, 'আমি তো তাইই বলছি।'

কথাটা বুঝতে না পেরে রামণ্ণা জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

'তাই তো বলছি যে অপরকে কষ্ট দিতে হয়।'

'আমি কি বলেছি যে এখানে এসে বসতে আমার কষ্ট হয়?'

'তুমি তো বলনি। তোমার কষ্টও হবে না। তবু আমি তোমায় ডাকতে পারি না।'

'কারণ আমি লিখি। সেটাকে তুমি নিজের চেয়েও দামী ভাবো তাই তো?'

'নাই বা কেন? তুমি যা লেখ তাতে তুমি সুখী হও আর লোকেও আনন্দ পায়। সে সব ছেড়ে আজ না হয় কাল যে মরবে তার বিছানার পাশে বসে থেকে কি হবে বল?'

'তুমি যদি লেখিকা হতে তো ঘরের লোকের যা দুর্দশা হত তা বলার নয়।' হাসতে হাসতে বলে রামণ্ণা, সরলাকেও হাসায়।

'তবু না জানি কেন, চার পাঁচ দিন থেকে মনে অদ্ভুত সব চিন্তা আসছে। আমি কতো চেষ্টা করি—'

'দ্যাখো সরলা, কোন চিন্তা যদি মনে কষ্টে দিতে থাকে তো তোমাকে একটা উপায় বলছি। মনে এলেই সেটা বের করে দাও। হাঁচির মতই চিন্তার বিষয় মনে আসে। তাকে যদি আটকে রাখি।'···

'বের করবে কি করে? কেশে না হেঁচে?

'অপরকে, মানে, আমাকে জানিয়ে দিয়ে। ভালো কথা, কাল পরশুর কথা থাক, আজ কি ভাবছ তাই বল।'

'না।'

'দ্যাখো, ওষুধ না খেলে কি রোগ সারে?'

'তুমি হাসবে।'

'না।'

'তুমি রাগ করবে।'

'না, না, বলি হাসির কথা? না রাগের কথা? বিষয়টা কি?

'বলে কি লাভ?'

'প্রথমে বলেই তো। ওতে কি লাভ হবে তা কি বলিনি?'

'না, শুধু মুখে বললেই তো মন থেকে দূর হবে না।'

'তবে কি করলে দূর হবে?'

'তুমি যদি সেটা পূর্ণ করবে বলে কথা দাও তো···' একটু থেমে সে বললে, 'যাক গে সে কথা, তুমিও অনর্থক সময় নষ্ট করছ। এগারোটা বাজে। আমারও ঘুম আসছে।'

রামন্না দু এক মিনিট তার দিকে চেয়ে রইল। মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়ে সে সরলার মাথায় হাত বুলোতে লাগল—তার যেন বুক ফেটে যাচ্ছে। ধীরে তার মাথাটা নিজের কোলে রেখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সেও চোখ মেলে তাকে দেখল। চোখে চোখ মিলল। তার মনের কথা রামন্না হয়তো বুঝতে পারল।

রামন্না হেসে বললে. 'ঐ কথাটা ছাড়া যা বলবে তাই করব।'

সে ঠাট্টার ভঙ্গীতে বলল, 'কোন কথাটা ছাড়া?'

'তোমার মনে এখন যে কথাটা আছে, ঐটে।'

সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি জানতাম।'

'সেটা যে সম্ভব নয়, তা তোমার আগেই জানা উচিত ছিল।'

'কোনটা সম্ভব নয় বলছ?' ক্লান্তি থাকলেও তার স্বরে জেদ ছিল।

'কোনটা মানে? দেখো সরলা, তোমার কিছুই হবে না। তুমি এ চিন্তা ছাড়?'

'কিছুই হবে না!' সরলা নিজেকেই যেন কথাটা আবার বলল। 'কিছুই হবে না, এটা তুমি কোন সুখের কথা ভেবে বলছ? এক বছরের বেশি বিছানায় পড়ে আছি। ঘর খাঁ খাঁ করছে। আমাকে দিয়ে তোমার কিছুই পাওয়া হল না। কিছুই হবে না বললেও ওটা কি হবে না? তুমি কি বুড়ো হয়ে গিয়েছ? বাচ্চা না থাকলে আর ঘরের মূল্য কি?'

'আরে পাগলী, আগে তো বৌ থাকবে, পরে বাচ্চার কথা উঠবে?'

'আমার মত বৌ থাকতে তো সে কথাই ওঠে না।'

রামন্না তখন কোন উত্তর দিতে পারল না। সরলা মাঝে মাঝে এ কথা বলত। কিন্তু এখন সে কি করবে ঠিক করতে পারল না। ভয় পেয়ে সরলার ধারণা হয়েছিল যে এ যাত্রায় তার আর রক্ষা নেই। তার মন থেকে এ ভয় দূর করা রামন্নার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ কথা সে ভাবতেও চাইত না। সেই চিন্তায় সে কয়েকবার ভয়ও পেয়েছিল। সে কথা মনে পড়ায় এখনও তার শরীর কেঁপে উঠল।

সরলা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?' হয়তো তার কেঁপে ওঠা সরলা বুঝতে পেরেছে। রামন্না একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বলেছিল, 'তোমার অমঙ্গল চিন্তা মনে এলেই শরীর কেঁপে ওঠে। মুখে আনা তো দূরের কথা। আমিই বা কী করি? তুমিই বলে দাও সরলা, 'কথাগুলো বলে সে থামল।

শুয়ে শুয়েই তার গালে হাত বুলিয়ে হেসে সরলা বলল 'এবার কাকে পাগল বলা উচিত? বাজে কথা? আমি কেন আজেবাজে কথা ভাবতে যাব? আমার মরার পর তুমি কি করবে তা কে আর দেখতে আসছে? যদি আমাকে মরতে না হয় তবে আমার চোখের সামনেই আমার ইচ্ছে পূর্ণ কর—'

সরলার কথা শেষ পর্যন্ত না শুনেই উৎসাহিত হয়ে সে বলে উঠল, 'তবে বল-তুমি যা চাও তাই করব।' কী ভুলই না হয়েছিল!

তার মুখ থেকে কথাটা বের হতেই সরলা বলেছিল, 'সে সৌভাগ্য দেখার জন্যে ভগবান যেন আমায় বাঁচিয়ে রাখেন। সত্যি কথা রাখবে? সত্যি বলছ?' সে তখন মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল। তখন সরলা বলেছিল, 'তবে আর একটা বিয়ে—'

'কী'! বলে রামন্না এমন চমকে উঠেছিল যেন মাথায় বাজ পড়েছে।

'না না, আমি তোমার কাছে হাত জোড় করে বলছি। এইটেই আমার ইচ্ছে। অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে কর। বাড়ীতে ছোট ছেলে দেখে তবে মরতে চাই।'

যন্ত্রের মতো সে মাথা নাড়ছিল, কিন্তু মন বলছিল, 'এ হতে পারে না।'

'এইটুকু-শুধু এইটুকু পেলেই আমি সুখে চোখ বুজতে পারি।' সরলা যেন সত্যি সত্যি ভিক্ষে চাইছিল।

'এখন যে সুখে আছি তার চেয়ে বেশি সুখ আমি চাই না।' রামন্না উত্তর দেয়।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারে না। সরলার চোখে জল। রামন্নার বড় কষ্ট হল। সে বললে, 'সরলা তুমি কি জাননা যে এ কথায় আমি কত কষ্ট পাই?' সরলা নিজেকে সামলে নিয়ে 'যদি তোমার কষ্ট হয় তবে থাক', বলে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

এতক্ষণ কথা বলার পর ক্লান্তিতে কিংবা মনের কথা বলে ফেলায় মন হাল্কা

হয়ে যেতে সরলা দু মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটু পরে নিজের কোল থেকে তার মাথা ধীরে ধীরে সরিয়ে বালিশের উপর রেখে রামন্না পা টিপে টিপে বাইরে চলে এল।

সরলার ঘর থেকে বের হতেই, বহুদূর থেকে আসা যাত্রী এক অপরিচিত স্টেশনে পেঁৗছে যেমন দিগ্ভ্রান্ত হয়, রামন্নার তেমনি অবস্থা হল। 'এ কী? কোথায় এলাম আর কোথায় বা যাচ্ছি?' বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে তার চোখ পড়ল কুমুদের দরজার উপর। 'হ্যাঁ কতদিন আগে, না, না, কয়েক মিনিট আগে আমি এই ঘরের দিকেই যাচ্ছিলাম' বলে ওদিকে দু পা বাড়িয়েই 'ছিঃ! এ কী?' বলে নিজেকে শাসন করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে পড়ল। কিন্তু একটা অস্বস্তি তাকে বসতে দিচ্ছিল না। শূন্য দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে সে ভাবল, 'অন্য কোন দিন দেখা যাবে।' পা উঠল না। সরলার করুণ কথাগুলো তার কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে মনকে নাড়া দিয়েছিল, এখনও তার রেশ রয়ে গেছে। সরলা আজ তাকে এমন ভাবে বলল কেন? আমার জন্যেই কি বলেছিল? শুধু এইটুকু পেলেই আমি সুখে চোখ বুঁজতে পারি। বলেছিল বটে, কিন্তু কেন? ও কি সব জানতে পেরেছে? আমার ছলনায় সে কতই না আঘাত পেয়েছে? এমনও হতে পারে যে সে জানে না। আগেও তো সে এইকথাই বলেছিল। কিন্তু কখনও এত কাতর হয়ে বলেনি। আমি বেঁচে থাকতেই দেখে যেতে চাই। ওঃ! তার মনে হয়ত নিজের আত্মীয় কুমুদের সঙ্গেই তার বিয়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল। পরে আমি আর কাউকে পাছে বিয়ে করি এই ভয়েই সে নিজে বেঁচে থাকতেই বিয়ে দিতে চেয়েছিল। বেচারী! কী পবিত্র মন! কত সরল স্বভাব! এমন স্ত্রীর সাথে ঘর করার পরেও যে আমি অন্য বিয়ে করতে রাজী হব সেটা সে কি করে বুঝল? মন একটু হালকা হলে রামন্নার নিজেরই হাসি পেল। আবার বিয়ে! কী বোকাই না সরলা! অন্যকে বিয়ে করার কথা চুলোয় যাক, কুমুদের সঙ্গে তো—তখন রামন্না আবার যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তার মনে হল যে কিরকম সব চিন্তার জালে সে জড়িয়ে পড়ছে। কুমুদকে বিয়ে করবই না, এ চিন্তা মনে এল। তবু তার ঘরের দিকে যাচ্ছি কেন? যে মন ওর ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেই মনই তাকে বিয়ে করতে চায় না। ছিঃ! এ ঝঞ্ঝাট এখন এড়িয়ে যাওয়া উচিত। যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। আজ থেকে আর কুমুদের ঘরে পা রাখব না।

কিন্তু তাতে কি হবে? রামন্নার এই যুক্তি তার মন স্বীকার করল না; তুমি নিজের মনেই যদি যাব না ভেবে বসে থাক তো সে জানবে কি করে? দুজনে একমত হয়েই তো কথাটা পাকা করেছ। একজনের সেটা কি পালটে দেওয়া উচিত? তা ছাড়া কুমুদ যদি তোমাকে বিয়ে করতে চায় তবে তোমার এই যুক্তির কি

কোন মানে হয়? কিন্তু যদি ওরও বিয়ে করার ইচ্ছে না থাকে? তা হলে আর কি? পাগলামি করো না; যাও, সে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।' তার মন তাকে এইভাবে উত্তেজিত করতে লাগল। সে এক পা সামনে বাড়াল, এখন 'বাচ্চা ছাড়া সংসার মানায় না; অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে বিয়ে কর। বাড়ীতে ছোট ছেলে দেখে মরতে পারব।'—সরলার এই কথাগুলো তাকে পিছনে টানতে লাগল। 'তুমি পাগল হয়েছ। সরলাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য যখন উচিত মনে হবে তখন বিয়ে করো। কিন্তু কোনও কথার ভয়ে আজকের সুখ নষ্ট করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? চলো' বলে মন তাকে আবার উত্তেজিত করেছিল। 'সত্যিই আমার কথা রাখবে? শুধু এইটুকু হলেই আমি সুখে চোখ বুঁজতে পারি'।—সরলার কথাটা তার যাবার পথ আটকাল। ওঃ, সরলার কথা এত কেন মনে পড়ছে? 'তুমি কি বুড়ো হয়ে গিয়েছ?' যে বলেছিল সেকি তোমার দরকার বোঝে নি? তোমার সুখের জন্যই কি সে এটা বলে নি? তোমার জন্য সুখ এখন বিছানায় প্রতীক্ষা করছে। আর দেরী করো না।' মনের তাড়নায় সে দু চার পা এগিয়ে গেল। সরলার কথায় পিছিয়ে পড়ল। পিছন থেকে অস্পষ্টভাবে শোনা গেল, 'পাগল এখন যে সুখ তার চেয়ে বড় সুখ আমার নেই। এ কথা তুমি সরলার সামনে স্বীকার করেছ। এখন যে সুখ তাকেও যদি ছেড়ে দিই তবে আর কোথায় সুখ পাবো?' বলে মন তাকে জোর করে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল।

রামন্নার প্রথমে দুঃখ হল, পরে রাগ হল। এত ভেবে ভেবে কেন মাথা খারাপ করছি? বিয়ের কথা কেন? ন্যায় বিচারই বা কেন? প্রকৃতিই তো এই পথ দেখিয়েছে। এই ভেবে সে কুমুদের ঘরে ঢুকল। আলো জ্বলছিল। দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় তার প্রতিবিম্ব দেখা গেল। সেটা দেখে তার নিজেরই হয়তো ভয় লেগেছিল। সেই আলোয় কুমুদের সামনে যেতে কি তার লজ্জা করছিল? কুমুদের মুখ দরজার দিকে ফেরানো ছিল না। এই সুযোগ দেখে ঘর থেকে সরে পড়বার চিন্তা জাগল। কিন্তু তাতে পুরুষ রামন্নার যেন অপমান মনে হল। 'কেন পালিয়ে যাব? আমি কি এই মেয়েটাকে ভয় পাই? আমার উদ্দেশ্য ওকে স্পষ্ট জানাব।' এই ভেবে সে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে পুরুষের অধিকার আদায় করে নিয়ে ঘরে থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

সে ভাবল যে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু বাস্তবিক সে চোরের মত ঘর থেকে পালিয়ে এসেছিল। সাময়িক উন্মাদনা কেটে গেলে রামন্না অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল। এ কি সে করে ফেলল? এ কথাটা মনে এলেও সে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্ষমা চাইল না কারণ তাতে তার অহঙ্কারে ঘা লাগত। সেই জন্যই সে চুপিসাড়ে চলে এসেছিল। নিজের ঘরে এসেও তার আলো ভাল লাগছিল না, তাই সে অন্ধকারেই বসে রইল। নিজের মনেই বলল 'পশু'। পরক্ষণেই মনে হল যে এটা তো পশুর

পক্ষেও অপমানকর। কোন পশুই মানুষের মত অতি কামী হয় না। সে তো প্রকৃতির বাঁধা নিয়ম ধরে চলে—এই বলে সে নিজেকেই ধিক্কার দিল। তারপর তার মনে আর এক ভাবনা এল—কত ভেবে চিন্তে ঠিক করেছিল যে কুমুদের সঙ্গে সহবাস না হলেও তার জীবনে কোন অভাব হবে না, তবু সে কুমুদের দিকেই ছুটেছিল। মিনিট খানেক আগে সেখানে অপ্রত্যাশিত ব্যবহার পেয়েও কুমুদের উপর তার রাগ হল না। তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবার ইচ্ছা হল। সেদিনের অনুভূতি ভুলে আগেকার কথা মনে করে ভাল লাগল। কুমুদের উপর তার আসক্তি জন্মেছে। তখন তার মনে পড়ল রত্নাবলী নাটকের শ্লোকটা। কেন এমন হয়? সেটা কিভাবে আর কেনই বা হার মানে? মানুষের চেয়ে 'বিধি' বড়—এটা বদলে 'কাম' শব্দ জুড়ে রামন্না সেদিন সেই শ্লোকের অর্থ আরো ভালো ভাবে বুঝতে পেরেছিল! যদি 'কাম' চায় তবে অন্য দ্বীপ থেকেই নয়, সাগর পার থেকেও নয়, বরং পৃথিবীর বাইরে থেকেও একটি মেয়ে হঠাৎ এসে আপনার হৃদয় অধিকার করে নেবে।

কুমুদ কি এমন করেই অধিকার করেছিল? এই চিন্তায় মগ্ন রামন্না সারারাত চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এই সব কথা মনে করে রামন্না চেয়ার ছেড়ে উঠল। সেদিনের মতো আজ চেয়ারে বসে ঘুমোবার দরকার নেই। সেদিন সুখের স্বপ্ন ছিল, আজ স্বপ্নেও সুখ নেই। বলতে বলতে হাই তুলে বিরক্তিতে হাতের বইটা টেবিলে ফেলে দিল। তার কানে এল দূরে কোথায় ঘড়িতে বারোটা বাজছে।

বারো

হাই ওঠা ঘুম আসার লক্ষণ—কথাটা কুমুদের মিথ্যা মনে হল। বার বার হাই উঠলেও ঘুমের কোন লক্ষণ নেই। ঘুম না আসার বিরক্তিটা ভিতরে হয়ত লুকিয়েছিল আর এখন হাই এর রূপ ধরে বেরিয়ে আসছে। দূরের কোন ঘড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। এক, দুই, তিন···বারো। রাত দুপুর হল। এবার তো ঘুম আসবেই। কতোবার ঘুম আটকাবার চেষ্টা করেছিল। এমন সময়ও গেছে যখন রাতের নীরবতার মধ্যেও ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেত না। তখন সে ঘুমও চাইত না। সে সব এখন যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি। কিন্তু সেটা তো মাত্র দু বছর আগের কথা। তখন কত রাত সুখ স্বপ্নে বিভোর

হয়েই জেগে থাকত। একটা দিনের কথা তো আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেদিন তার জীবনে সূর্যোদয় হয়েছিল। এমনি ভাবেই সেদিন সে সকাল পর্যন্ত জেগেছিল যেন রাত আর আসবেই না। জেগে স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা সেদিন তার পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সে স্বপ্নও আজ অন্য স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। যাক গে, তবু আজও সে স্মৃতি সুখের ভেবে তার মুখে খুশির আমেজ ফুটল। অতীতকে দেখার প্রবল ইচ্ছেতে পরিবেশ ভুলে গিয়ে পরোক্ষে কিছু দেখবার জন্যে আকুল হয়ে উঠল। কতদিন আগের কথা? যাক গে। সময়টা আসল নয়, ঘটনাটাই আসল। সেদিন রাতে……।

সে রাতে সত্যিই কুমুদ খুশি হয়নি। কয়েকদিন থেকে যে সুখ সে অনুভব করছিল তাতে যেন একটু বাধা পড়ল। স্বামী-স্ত্রীর সেই গোপন দৃশ্য, সে রাতে রামন্নার তার শরীরটাকে তুচ্ছ ভেবে উপভোগের পর যেন তাকে অপমানিত করে চলে যাওয়ায় কুমুদের মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। একদিকে তার মনে রামন্নার প্রতি বিদ্বেষের ভাব ছিল, অন্য দিকে তার সান্নিধ্যে সে নির্লজ্জের মতই তৃপ্তি পেত। রামন্না যখনই আসত, তাই বা বলি কেন? প্রথম প্রথম তিন চার দিন তো রামন্না এলই না। সেটাও সে কোনরকমে সহ্য করতে পারত। হয়ত সে নিজের ব্যবহারে লজ্জা পেয়েছে ভেবে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারত, কিন্তু রামন্নার ব্যবহার মনে খটকা লাগাবার মতই হয়েছিল। সেই তিন চার দিন সে তার দিকে চোখ তুলেও তাকায়নি, তার কাছেও আসে নি। যদি সে লেখা নিয়ে ডুবে থাকত তবে কুমুদ হয়ত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারত, কিন্তু সে নয়। রামন্না সারাদিন সরলাদিদির ঘরে বসে রইল আর মন দিয়ে তার সেবা করতে লাগল। রাতে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত গল্পে মেতে রইল। কুমুদের সন্দেহ হল যে সে হয়ত সেবা করার জন্য সেখানেই বিছানা পাতছে। কেন? যখন সেবা করার জন্যে সেই রয়েছে, তখন সব কাজ ছেড়ে রামন্না কেন ঐ কাজে লেগে আছে; এ কিরকম সেবা? এটা তো শুধু সেবার ভান। এটা শুধু তাকে দূরে সরিয়ে রাখার একটা চাল ভেবে কুমুদের দুঃখ হল। তার মনে হল যে এ বাড়ীতে তার জন্যে আর জায়গা নেই। যদি তাকে দিদির সেবার অযোগ্য বলে ভাবা হয়, তবে তার আর প্রয়োজন কী?

সে একলা বসে কেঁদেছিল, দুঃখিত হয়েছিল। শোবার সময় সকালে উঠেই এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে—এ সব ঠিক করে রাখত। কিন্তু এখন সে সব কিছুই করবার সুযোগ মিলত না। অবশ্য শীঘ্রই সুযোগ এল। একদিন ভোরে রামন্না ছুটে এসে 'কুমুদ—কুমুদ' বলে ডাকল। আধো ঘুম ঘোরে কুমুদ ঠিক বুঝতে পারল না যে রামন্না সত্যিই তাকে ডাকছে, না সে স্বপ্ন দেখছে? স্বপ্ন নয়, রামন্না সত্যিই তাকে ঠেলে জাগিয়েছিল। সে ধড়মড় করে উঠে অবাক হয়ে তাকে দেখেছিল। 'শিগগির সরলার ঘরে এস', বলে রামন্না ছুটে চলে গেল। যখন

সে সরলার ঘরে পৌঁছল তখন সে কোট পরছিল। ঘরের এক কোণে রামন্নার বিছানা পাতা রয়েছে সেটাও তার নজরে পড়ল। 'তুমি বস, আমি ডাক্তারকে নিয়ে আসছি', বলে সে ছুটে চলে গেল।

সেদিন কুমুদের মনে হচ্ছিল যে তার কুঁয়োয় ঝাঁপ দিয়ে মরা উচিত। সে নিজেকেই খুব করে গাল দিল, 'কি নির্লজ্জ স্বার্থপর কসাই সে।' তিন চার দিন থেকে সরলাদিদির বুকের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ছে এটা কি তার বোঝা উচিত ছিল না? এটা সত্যি, রামন্না সেখানে সবসময় থাকত বলে সে সেখানে বসতে পারত না। কিন্তু তাতে কি? তার নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে সে সরলাদিদির কথা একেবারেই ভাবে নি। কি কুলাঙ্গার সে। বেচারা! রামন্না তিন চারদিন একলা কি করে সামলেছে? আজও তাকে ডাকবার নেহাৎ দরকার পড়েছিল বলেই সে এসেছিল। সেদিন ভোরে সরলাদিদি কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার জ্ঞান ফিরিয়ে একটু সান্ত্বনা দিয়ে তাকে সেখানে বসিয়ে পরে রামন্না ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল।

সেদিন সন্ধে নাগাদ সরলাদিদির অবস্থা একটু ভাল হয়েছিল। কুমুদের সৌভাগ্যবশেই এমনটা হয়ত হয়েছে। 'সবার' সৌভাগ্যের মধ্যে তারটাও কি যোগ করা উচিত? সারাদিনের ছুটোছুটি আর মানসিক দুশ্চিন্তায় রামন্না ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। কুমুদের মনে হল যে এটা তারই সৌভাগ্যের ফলেই হওয়া সম্ভব। সেদিন রাত নটার সময় সে নামে মাত্র খেতে বসেছিল। ততক্ষণে সরলাদিদির অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ডাক্তার তাকে ঘুমোবার বড়ি দিয়ে 'এখন আর ভয় নেই' বলে চলে গিয়েছিলেন। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে সরলাদিদি ভালো আছে স্বচক্ষে দেখে কুমুদ নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। সে জেনেশুনেই একটু তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরেছিল। সারাদিনই সে রামন্নার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তার মুখের ভাবভঙ্গী দেখে তার মনোগত ভাব সে বুঝতে পেরেছিল। তাই স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ দেবার জন্যেই তার সেখান থেকে সরে আসা। সে বুঝেছিল যে রামন্না নিজের পরিশ্রমের ফললাভের আনন্দ পেতে চায়। সেদিন ঘরে ফেরবার সময় তার মন বেশ খুশি ছিল। রামন্না আর সরলাদিদি নিজেদের মধ্যে কত প্রফুল্লমনে গল্প করছে ভেবে তার মনে আনন্দ হচ্ছিল। দেহের ক্লান্তিতে মনের আনন্দ—এই অবস্থায় সে জেগে চোখ বুঁজে এক বিচিত্র শান্তি উপভোগ করছিল। কতক্ষণ যে এইভাবে মগ্ন ছিল তা মনে পড়ে না। যখন তার চোখ খুলল সে দেখে যে রামন্না একেবারে তার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে। ক্লান্ত অথচ উজ্জ্বল মুখে মৃদু হাসি—রামন্নার মুখের এই ভাব দেখে তার মন একটু হালকা হল।

কুমুদের মনে হল যে জন্ম জন্মান্তরের ফলে সেদিন সে রামন্নাকে পেয়েছে। কী

শান্ত ভাব! কত পরিষ্কার মনে সে কথা বলেছিল। সেদিন রামন্নার গায়ে হাত বুলিয়ে সে তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল। অজানা দুঃখে ক্লান্ত শিশুর মতো রামন্নাও তার কাছে সরে এসেছিল। এটা বুঝতে তার দেরি হয়নি। কথা বলতে বলতে সে তার বাহু বন্ধনেই ঘুমিয়ে পড়ল। তার ঘুম এসেছিল দেরিতে। সকালে রামন্না তার মাথায় চুমু খেলে তার ঘুম ভাঙে! চমকে উঠে চোখ খুলেই একে অপরকে দেখেছিল। রামন্না মৃদু হেসে ঠোঁটে হাত দিয়ে চুপ করে থাকার ইশারা করেছিল। সেদিন কুমুদের মনে হয়েছিল যে তার নারী জন্ম সার্থক হয়ে গেছে।

রামন্নার মুখের হাসি দেখে কুমুদের মনে হয়েছিল যে তার জন্যে একটা হৃদয় শান্তি পেয়েছে। সেদিনের প্রসন্নতা সেখানেই শেষ হয়ে যায় নি। যদি ঐ টুকুতেই শেষ হতো, তাহলেও সে তার জন্ম সার্থক বুঝত। সুখ বা দুঃখের অনুভব সীমিত সময়ের জন্যেই থাকে; স্মৃতিই থাকে অনেক দিন। এ ছাড়া অনুভবের সময় সুখ ভাল লাগে, দুঃখ কষ্ট দেয়; কিন্তু স্মৃতিতে সুখ আর দুঃখের প্রভাব সমান। দুঃখের স্মৃতিতে চোখে জল এলেও হৃদয় হালকা হয়ে গেলে সুখ মেলে। এ সব কথা কুমুদ স্পষ্ট করে জানত না। (জানলে পরে সে হয়ত সুখ-দুঃখাতীত হয়ে যেত।) সেই সন্ধ্যায়, রামন্নার প্রিয় মুখটাই বারবার মনে এল। তার মনে হল যে রামন্নার সম্বন্ধে কত কিই না ভেবেছিল। সারাদিনের দেহমনের ক্লান্তি নিয়ে সে তার কাছে এল, তার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা কইল, তার পাশে ছোট ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়ল। কেন? ওর জীবনে তার জন্য নিশ্চয় একটা জায়গা ছিল। না হলে দুঃখের সময় আসবে কেন? তার আর কুমুদের হৃদয় হয়ত এক হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন আগের দৈহিক সম্বন্ধের চেয়ে এই হৃদয়ের সম্বন্ধে সে বেশি সুখ পেয়েছিল। মাত্র বারো ঘন্টার মধ্যে কুমুদের কান্তি প্রেমরসের পালিশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তার মনে হচ্ছিল সে যেন একটা নদী। আশ পাশের ছোট খাটো শাখা প্রশাখাকে নিয়ে পথ খুঁজতে খুঁজতে সমুদ্রের সঙ্গে মেলবার জন্যে চলেছে।

সেই সব কথা বারবার মনে পড়ায় কুমুদের মুখে একটা কমনীয় আভা ফুটে উঠল। সে সব দিনে তার মনে হত যে সরলাদিদি তাকে ভালবাসার চোখে দেখছে। বারবার তাকে নিজের কাছে ডাকত, তার হাতে হাত রেখে বালিশে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকত। একদিনকার কথা তো সে কখনই ভুলতে পারে না— ঐ ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সরলাদিদি স্নেহের সুরে 'কুমুদ' বলে ডেকেছিল। সে সুর তাকে এমনভাবে টেনেছিল যেন মা তার লুকোনো ছেলেকে খুঁজে কোলে নিয়ে আদর করছে।

কুমুদ থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ব্যাপার কি দিদি?'

'আমার জন্যে সবার কষ্ট হচ্ছে, না রে?'

'তোমায় কে বলেছে?'

'কারুর বলার দরকার কি ? আমি কি বুঝতে পারি না ?'

'তোমার কষ্ট হওয়া উচিত নয়, অপরের চিন্তা তোমার হবে কেন ?'

'আমারও কষ্ট হয় কুমুদ। আমার আর কোনও আশা নেই। এই হতচ্ছাড়া শরীর নিয়ে এভাবে বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকা।'

'দিদি, তুমি এটা ভুলো না যে কতো লোকের দরকার তোমাকে।'

'তুই পাগল কুমুদ! কার কাকে দরকার? যতক্ষণ আছ ততক্ষণই লোকে চায়।

মরার পর সকলে ভুলে যায়। না হলে দুনিয়া চলবে কি করে?'

'মানা করলেও তুমি বারবার ঐ কথাই ভাবছো দিদি।'

'আর কি করবো ? তুই বল্ কুমুদ। কাল যখন শরীর খুব খারাপ হল তখন ভয় হল যে এবার হয়ত শেষ হয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, এমনি বল দিদি। মরতে ভয় পাওয়াটাই খুশির কথা।'

'ভয় আমি নিজের জন্য পাইনি কুমুদ। আমাকে দিয়ে কারও ভাল হয়নি। প্রার্থনা করি যেন কারও খারাপও না হয়।'

'এখন কার খারাপ হচ্ছে ?'

'তবু মরার আগে কিছু ভাল যদি ঘটে যায়—'

'সেটা কী ?'

'তোর বিয়ে।'

'যাও দিদি! আগে তুমি ভালো হয়ে ওঠো। পরে হবে।'

এইটুকু বলেই কুমুদ থেমে গিয়েছিল। তারই বিয়ের কথা ওঠাতে প্রথমে তার স্বাভাবিক লজ্জা হয়েছিল। কিন্তু তখনই তার মনে অন্য চিন্তা এসেছিল। তার বিয়ে? দিদির এ কথা মনে হল কেন? তাকে ভালবাসে বলেই কি? অথবা অন্য কোন কারণে? দিদি কি ভেবেছে যে তার মরার আগে তার বিয়ে হয়ে যাক। তবে কি অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে?

কুমুদ বলেছিল, 'দিদি যতক্ষণ না তুমি সেরে ওঠো, ততক্ষণ এ সব বাজে চিন্তা মাথায় ঢুকিয়ো না। আমি তো কখনই রাজী হবো না।'

'ওঁকেও বলেছি, তোকেও বলছি। আমি নিজের চোখে দেখে মরতে চাই।' এই বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

ওঁকেও বলেছি! কুমুদের হৃদস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল। সরলাদিদি কী বলেছিল? কিংবা সরলার এই কথার পর কি অপরের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে? রামপ্পার কাল রাতের ব্যবহারে শুধু স্নেহই প্রকাশ পেয়েছিল? সে কি আর কিছু মনে ভেবেছে? এ আবার কি নতুন বিপত্তি এল?

'দিদি তোমার কাছে হাতজোড় করে বলছি, তোমার ভালো হওয়া পর্যন্ত—'

'তুই পাগল কুমুদ। আমার ভালো হবার কথা ভুলে যা। এখন তোর যে দিদি মরছে তার জন্যে, আমার ওপর তোর যে ভালবাসা আছে তার জন্যে—'

'দিদি, আমার দিব্যি, যদি এ কথা আবার বলো।' কুমুদ নিজের মনের কথা বলে ফেলল।

সরলা বলল, 'কেন কুমুদ? যাক গে। ওঁকেই বলেছি, উনিই তোর সঙ্গে কথা বলবেন।' তার এ কথা শুনে কুমুদের যেন প্রাণ উড়ে গেল। সে ভাবল কথাটার মানে কেমন ভাবে উল্টে গেল। কোন রকমে প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করল। তিন চার দিন ধরে রামন্না সরলাদিদির কি রকম সেবা করছিল; যেদিন সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সেদিন সে কতো ছুটোছুটি করেছিল। রাতে খাবার কথা পর্যন্ত মনে ছিল না—এই সব কথা সে বেশ রসিয়ে বলেছিল। আনন্দ ও গর্বভরা মুখে সরলা কথাগুলো শুনতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে কুমুদের ভরসা হল যে বিয়ের প্রসঙ্গ আর উঠবে না। তখন সে থেমে গিয়েছিল। শেষে সরলাদিদি বলেছিল, 'এই ব্যাপার! তুই সব খুঁটিয়ে দেখে রেখেছিস।' পিঠে হাত বুলিয়ে আরও বলেছিল, 'বোন, আমার ভাগ্যও অতো খারাপ নয়।'

শেষ কথাটা শুনে কুমুদ অবাক হয়েছিল। কোন প্রসঙ্গে সরলাদিদি এই কথা বলেছিল? সে তো রামন্নার খুব প্রশংসা করেছিল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে 'যখন আমার স্বামীই এমন, তখন আমার কপাল খারাপ হতেই পারে না,' এই বলেছিল হয়ত। সেই সঙ্গে কুমুদের মনে এ চিন্তাও জাগল যে 'কপাল খারাপ নয়' কথাটার মানে কি বোঝায় যে তারই ইচ্ছামত কুমুদের বিয়ে হবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বেশী চিন্তা করবার মতো মানসিক অবস্থা কুমুদের ছিল না। সরলার মুখে তার বিয়ের কথা উঠতেই তার মনের গুপ্ত চিন্তাগুলো তাকে ঘিরে ধরল। বিয়ে! কি আশ্চর্য! এতদিন তার মনে এ চিন্তাই জাগে নি। কুমুদ সরলার কথাগুলো মনে করবার চেষ্টা করল। নিজের মৃত্যুর আগে এ বিয়ে হয়ে যাওয়া চাই। সরলার এই জিদের জন্য কুমুদের মনে সন্দেহ জাগছিল। হয়তো সরলাদিদি রামন্নার সঙ্গে তার বিয়ের কথা ভেবে রেখেছে। মানে আমাদের দুজনের সম্বন্ধে সরলাদিদির সন্দেহ হয়েছে। ছিঃ! দিদির স্বভাবে একটুও কপটতা নেই। সে বলতে চায় যে স্ত্রীর সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য হচ্ছে স্বামী আর সন্তান। নিজের সন্তান না থাকায় তার দুঃখ হত। ঘরে শিশু থাকলে সে সুখ পেত। কুমুদের চিন্তার স্রোত কোথা থেকে কোথায় চলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে ভেবেও তার তৃপ্তি হল না। চোখ বন্ধ করলেই সে ছবির মতো দেখতে পায়, সে আর রামন্না সিনেমা যাচ্ছে। তাদের ছেলেমেয়েরা ঘরে খেলা করছে। সামনে বিছানায় শোয়া সরলাদিদি প্রসন্নমুখে বাচ্চাদের দেখতে দেখতে 'এখন আমার জন্ম সার্থক

হয়েছে। এখন তোমরা সিনেমা যাও কি বিলেত যাও যেখানে খুশি, আমার কাছে এইই স্বর্গ,' বলছে। কিন্তু কুমুদ চোখ খুলতেই এ দৃশ্য মিলিয়ে গেল।

স্মৃতিচারণের রসাস্বাদন করতে করতে কুমুদ উঠে বসে। তার মনে হল তখন ঘুম না এলে কত ভাল লাগত। কিন্তু এখন? তখন যে ঘুম তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলত, সে ঘুম আজ দুষ্মন্তের মতোই তাকে ভুলে গেছে। দুষ্মন্ত শকুন্তলা! আরে! এ কথা তার মুখ থেকে কি করে বেরোল? হ্যাঁ, এক রাত্রে! ঘুরে ফিরে সেই কথা। কুমুদের পালিয়ে যাবার ইচ্ছে করে। পা ছুড়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে সে।

তের

রামপ্পার ছুঁড়ে ফেলা বইটা টেবিলে ধাক্কা লেগে উলটে পালটে মেঝেয় গিয়ে পড়ল, যেন কেউ বেহুঁশ হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ওপর থেকে নীচে পড়ল। বইটাকে দেখেই যেন রাগ করে বলে বসল, 'সংসারে আজ পর্যন্ত যত লোক জন্মেছে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে এক একটা বই থাকলেও আমার সমস্যা সমাধান করার মতো বই নেই কেন? সাহিত্য জীবনের সমস্যার সমাধান করে! এটা পাগলামি! জীবনের সমস্যা অসংখ্য। তাদের সমাধান করার মানে কি?' ভাবতে ভাবতে সে নিজেকে সাহিত্যিক বলে ধিক্কার দিল।

তার সমস্যাটা কি? এমনিতে কিছু লোক বলতে পারে যে এটা কোন সমস্যাই নয়। আবার কিছু লোক 'এটা কি একটা সমস্যা হলো' বলে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে। হুঃ! মূর্খের দল! জ্ঞানহীন! এটা ওদের দুর্ভাগ্য যে ওরা নিজেরাই জানে না যে ওরা জ্ঞানহীন। কেউ জিজ্ঞাসা করবে, সমস্যাটা ঐ কুমুদের বিষয়েই তো? এতে আর সমস্যা কি? প্রিয় স্ত্রী মারা গেছে, এখন দাম্পত্য সুখের জন্যে বা প্রেম করার জন্যে মন রাজী নয়। এখন কোন বন্ধন নেই। ওকে অনায়াসে ছেড়ে দেওয়া যায়। ছেড়ে দেওয়া মানে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া নয়। মনে এত অশান্তি কেন? যেহেতু স্ত্রী তার পালন পোষণ করেছে, তাই তাকে কোন স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। এ আর এমন কি বড় সমস্যা?

ওরা মূর্খ। এসব কথা যারা বলে তারা সমস্যাটা বুঝতেই পারে না। প্রিয়

স্ত্রী চলে গেছে এটা সত্য। কিন্তু কুমুদ তাকে ভালবাসে কি না তা কে জানে? কেউ কি তাকে সেটা জিজ্ঞাসা করেছে?

কুমুদ যদি ভালবেসে থাকে তো তাকে বিয়ে করা উচিত। এতে আর ভাবনা চিন্তার কি আছে?

ছিঃ! যে এমন কথা বলে সে মূর্খ। প্রেমের রহস্যই সে জানে না। প্রেম হয়েছে কি হয়নি সেটা কি করে বলা যেতে পারে? ভরা পেটে আরো খেতে না চাইলে তো খাবারটা খারাপ বলা যায় না। ভাল যে লেগেছিল তার সাক্ষী সে নিজেই। কুমুদের মনেও ভালবাসা আছে।

রামপ্পা সাধারণতঃ এই সব প্রশ্ন ভাবত না, কেননা এদের উত্তর পাবার আগেই ঐ বিষয়ে আরো প্রশ্ন তার চোখের সামনে উপস্থিত হত।

সেটা কোন্ দিন ছিল? সেই দিন কী? হ্যাঁ……সরলা একদিন সকালে ভয় পেয়েছিল। সেই দিনই। সেদিন সে যন্ত্রের মত কাজ করেছিল। রাত্তির নাগাদ সরলার অবস্থা আগের মত ভাল হল, ডাক্তার তিন চার বার এসে ভরসা দিল যে উপস্থিত ভয়ের কিছু নেই। এতক্ষণ তার পা চলেছে, হাত কাজ করেছে, চোখ দেখেছে, কান শুনেছে—কিন্তু এ সবের একটুও বোধ তার ছিল না। সব ঠিক হয়ে গেলে নামমাত্র কিছু খেয়ে নেবার পর যেমন একদিকে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, অন্য-দিকে তেমনি ঘুমও পেয়েছিল। মনে হল যে সরলার মতো তারও পুনর্জন্ম লাভ হয়েছে। আনন্দে তার মনে হচ্ছিল কোথাও বসে প্রাণভরে কাঁদে, অন্য কারও কাছে মনের কথা প্রকাশ করে। তখন সে কুমুদের ঘরে গিয়েছিল। তার বেশ মনে আছে যে সেদিন সে কুমুদকে স্নেহের চোখে দেখেছিল। সম্ভোগের বস্তু বলে তাকে দেখে নি। সে রাতের কথা মনে পড়তেই রামপ্পার আশ্চর্য মনে হল; মনে পড়ে না যে পরদিন ভোরে তার কেমন লেগেছিল। সে কুমুদের মাথায় চুমু খেয়েছিল না? তখন তার মনেই হয়নি যে কুমুদের মুখ একজন স্ত্রীলোকের মুখ।

সেদিন নিজের ওপর রামপ্পার পুরো বিশ্বাস ছিল। তাতে কী? মনের জগৎ হচ্ছে এক বিচিত্র জগৎ। কথায় বলে না যে তুমি ভাবছ এক আর অন্য কিছু ভাবছে দৈব। কুমুদ যে অন্য কিছু চায় তাতে রামপ্পার কোন সন্দেহ ছিল না। কুমুদের সম্বন্ধে যে চিন্তা আজ পর্যন্ত তার মনে ওঠে নি, সেটা এখন রামপ্পার মনে হল। কুমুদ তাকে ভালবাসছে, এ কথা মনে আসতেই তার বুক কেঁপে উঠল। তার মনে হল এ আবার কি? তবু কুমুদ যদি তাকে ভালবাসে তো সে কি করতে পারে? সে যে এ ব্যাপারে পরাধীন এটা ভেবে তার নিজের ওপর রাগ হল। নিজেকেই দোষী করে সে বলল, যদি তার ব্যবহার কুমুদকে উৎসাহ যুগিয়ে থাকে তো সেটা নিজের কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত

হবে। সে মূর্খ, মহামূর্খ। শুধু কামতৃপ্তির জন্য তার সারল্যের সুযোগ নিয়ে তাকে নিজের দিকে টানবার সময় তার মনে আর কোন চিন্তা ছিল না। কুমুদও অনায়াসে তার দিকে আকর্ষিত হচ্ছিল। তখনই তার বোঝা উচিত ছিল যে কুমুদ তাকে মোহিত করছে—এই ভেবে সে মাথা চাপড়াল। আর একবার সমগ্র স্ত্রী-জাতির ওপরেই রাগ হল। বাসনা জাগলেই মেয়েরা বিয়ে করতে চায়। তারা বাসনা মেটাতে চায় না। সেজন্য তার নৈতিক বন্ধন দরকার। অন্য কোনও প্রাকৃতিক বাসনা মানুষের মনে এত গভীর পরিণাম, এমন পাপ-পুণ্যের বোঝা চাপিয়ে দেয় না। কুমুদ তাকে ভালবাসে। এখন আমি কোন পথে যাই?

বিপদ একের পর একটা এসেই যায়। প্রকৃতির এ কেমন নিষ্ঠুর নিয়ম। ডাক্তার বলেছিল যে বিপদ কেটে যাবার পর খুব সাবধানে রাখতে হবে। ‘ওর আর কোন আঘাত সইবার শক্তি নেই। উনি যা চান তাই দিয়ে ছোট ছেলের মতো ভুলিয়ে রাখতে হবে।’ রামণ্ণার পক্ষে ভালই হয়েছিল। কুমুদ তাকে ভালবাসে এই সন্দেহ হবার পর যত বেশি সম্ভব সময় সরলার সঙ্গে কাটিয়ে কুমুদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এড়াবার সুযোগ পেয়েছিল। ‘ডাক্তার বলেছে তোমায় ছোট ছেলের মত ভুলিয়ে রাখতে হবে। তাই তোমার কাছেই বসে থাকব। চকোলেট চাইলে তাও কিনে এনে দেব।’ ঠাট্টা করে সে সরলাকে বলেছিল।

তখন সরলাও বলেছিল, ‘তোমার কথা কি চকোলেটের মতোই সহজলভ্য?’

রামণ্ণা হেসে নায়কের ভঙ্গীতে বলেছিল, ‘চকোলেটের কথা বলে আমি ঠাট্টা করছি? পাগল হলে না কি? বেশ তো, আমার কথা যাচাই করে নাও। তোমার ইচ্ছায় আমি ত্রিভুবন এনে হাজির করবার জন্য তৈরী, সরলা।’

এরপর সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। এই দীর্ঘশ্বাসের ফলে হাসি ঠাট্টা বন্ধ হয়ে গেলে রামণ্ণা বলল, ‘তোমার কি মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে?’

সরলা কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ল।

‘তা হলে স্বামীর উপর আর বিশ্বাস নেই?’

‘উঁহু’, বলে সে মাথা নেড়েছিল।

‘তবে মনে যা হচ্ছে তা বলেই দ্যাখো।’

সরলার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

‘এমন কি কথা—বলোই না দেখি।’

‘তুমি যে তা পারবে না, সেটা আমি জানি।’

‘আচ্ছা!’ বলে রামণ্ণা ছদ্মকোপে অভিযোগ জানায়, ‘তাহলে আমাদের মনের কতটা মিল হয়েছে দেখ যে না বলতেই একে অন্যের কথা বুঝে নেয়।’

‘এভাবে যদি বল তবে থাক।’

‘বেশ, আমি মুখ বন্ধ করলাম। বল তো চোখও বন্ধ করি।’

'না, এটা দেখার জিনিষ নয়।'

'আচ্ছা, তবে কান বন্ধ করছি,' বলে সে কানে আঙুল গুঁজে দিল।

'তুমি তো আমার কোন কথাই কানে নাও না।'

'যাক গে, তবে ডাক্তারকেই বলি ; তিনিই তো বলেছিলেন যা চায় তাই দিয়ো। এখন তাঁকেই বলি যে মুখ ফুটে চাইবার ওষুধ দিন।'

'মুখ ফুটে বলা দূরে থাক, হাতজোড় করেই বলছি।'

'হে ভক্তশ্রেষ্ঠ, তোমার দেবতা প্রসন্ন হয়েছেন। তুমি যা চাইবে উনি তা চোখ বুঁজে দেবেন।'

সে এ কথাগুলো কিছু নয় ভেবে খুব সহজেই বলেছিল, কিন্তু সরলার কথা শুনে তার সমস্ত শরীর যেন ঘেমে নেয়ে উঠল। সে চোখ বন্ধ করেছিল, মুখে মৃদু হাসি। কিন্তু এ সব ক্ষণিকের জন্যে। পরক্ষণেই সরলা বলল,

'তুমি কুমুদের বিয়ের কথা ভাবো।' সরলার কথা শুনে তার নিজের চোখ খুলতে ভয় লাগল।

'এ কী, সরলা, কী বলছ?'

'না বলতে চাইলেও তুমিই তো জোর করলে।'

'তুমি যদি এ সব কথা বলো তো আমি কি করবো?'

'এখন ডাক্তারকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।'

বাস্তবপক্ষে এ কথা সরলা সেদিন কতটা সদুদ্দেশ্যে বলেছিল সেটা রামন্না অনেকদিন পরে বুঝেছিল। ডাক্তারের কথা সেই প্রথমে তুলেছিল। সেই উদ্বেগ-পূর্ণ পরিবেশে আনন্দ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সরলা জেনে শুনে এই কথা তামাসা করে বলেছিল। তখন রামন্না সেটা বুঝতে পারে নি।

যখন সরলা 'ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কর' বলেছিল, তখন রামন্নার মনে একটাই ভাবনা এসেছিল, তার আর কুমুদের সম্বন্ধ সরলা জানতে পেরেছে। কিংবা হয়ত কুমুদই সরলাকে বলে দিয়েছে। সেই দু-চার দিনের মধ্যে দুজনে ফিসফিস করে বলাবলি করছিল। এখন ডাক্তারের কথা বলল। হয়তো কিছু অনর্থ ঘটেছে। অনর্থ কী? হতচ্ছাড়া যা হবার তাই হয়েছে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। পথের ভূতকে ঘরে এনেছি। জানিনা কি কুক্ষণে এই সর্বনাশী কুমুদকে ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম। মেয়েটাই বা কেমন তার কাছে বলল না কেন? হ্যাঁ, তাকে জড়াবার জন্যেই হয়ত সে গোড়া থেকেই এই খেলা খেলছিল। এতে আর সন্দেহ নেই। সেদিন বই খুঁজতে তার ঘরে আসা, তার আগে তার হাত ছোঁয়া, তাকে সিনেমা নিয়ে যাবার জন্যে নিরীহ সরলাকে বলে রাজী করানো—এ সব আগে থেকেই তৈরি করা মতলব। সেই জন্য সে এখন সরলাকে সব বলে দিয়েছে যাতে সে অব্যর্থ ফেঁসে যায়। বাপ রে?

'তোমাকে কি কুমুদ বলেছে?' সে জিজ্ঞাসা করেই ফেলল।

'ছিঃ, এ সব কথা কি ওই মেয়ে নিজে বলতে পারে? সে জানেও না যে আমি তোমার কাছে এ কথা বলছি।'

সরলার উত্তর শুনে রামন্নার সন্দেহ আরো দৃঢ় হল। তার উপর যাতে কোন খারাপ না হয় সেজন্য সরলার এমনি উত্তরই দেবার কথা। নিজের চিন্তা ভাবনার ছোঁয়াচ যেন না লাগে এমনি ভাবে হাসতে হাসতে রামন্না বলল, 'ভালো কথা, ডাক্তারবাবুকেই জিজ্ঞাসা করি।'

সেদিন রামন্নাকে একলা বসে ভাবতে হয়েছিল। দুটো কথা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কুমুদের সংসর্গের পরিণাম যে কি হতে পারে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। কুমুদ জেনে শুনে এই চাল চেলেছে। তাকে এড়াবার জন্যে বুদ্ধি খাটাতে হবে। কুমুদের উপর খুব রাগ হয়েছিল। ওকে ফাঁদে ফেলা উচিত। তার স্ত্রী অসহায় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। তার বাড়ীতে থেকে সব ভাল ভাবে জেনে বুঝেও তার এ সব করা উচিত? ক্রোধে অপমানে রামন্না যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন সব উদ্বেগ দূর হয়ে গিয়েছিল। রাতে শোবার সময় সে নিজের মনেই স্বীকার করেছিল যে সেও নির্দোষ নয়। সে স্থির করল যে যাই হোক না কেন, আর কোন ঝামেলায় সে জড়াতে চায় না। সেদিন থেকে চোখ তুলে কুমুদকে দেখার ইচ্ছাও তার হয়নি। সরলাও সে প্রসঙ্গ তোলেনি। কিন্তু যখন সে অন্যমনস্ক হয়ে যেত, তখন সে তার দিকে প্রতীক্ষারত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। দিনে সরলার সঙ্গে কথাবার্তা, সন্ধ্যায় মাঠে বায়ুসেবন, রাতে লেখা। সব অবাধে চললেও ভিতরে ভিতরে তার একটা ভয় লেগেই থাকত, 'ডাক্তারের প্রশ্ন' না জানি কি ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেবে। একদিন সরলার 'ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো' বলাতে সে চমকে গিয়েছিল। তখন কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন? কি হয়েছে?'

সরলা বলেছিল, 'হবে আবার কি? আয়নাতেই দ্যাখো!' তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেয়েছিল। কথা বদলাবার চেষ্টায় সে বলল, 'ওঃ, আমার জন্য বলছো? আমার আবার কি হবে?'

'বকবক করলে কি হয়? মুখখানা সাদা হয়ে গিয়েছে।'

'ও কথা বোলো না। তোমার চোখে আমাকে ভাল লাগছে তো-হা-হা।'

'আমার ভালো লাগার দিন কবে শেষ হয়ে গিয়েছে।'

কথার ধারা তার দিকে আসছে দেখে প্রসঙ্গ বদলে রামন্না বলেছিল, 'ওষুধ খেয়েছ? কেন? দেব না কি? আমি এখন লিখতে যাবো।'

'তুমি যাও না। কুমুদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে! সে আমার কাছে বসবে।'

রামন্না তখনই চলে গিয়েছিল। এখন এক নতুন ভয় তাকে চেপে ধরেছে।

যখন সে অনেকক্ষণ ধরে নিজের ঘরে সময় কাটায়, তখন কুমুদ সরলার কাছে বেশির ভাগ সময় বসে থাকে। এখন সে আবার কেমন ফাঁদ পাতছে কে জানে?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে রামন্না উঠে দাঁড়াল। সামনে তাকিয়ে তার হাসি পেল। 'বেচারী'! এতক্ষণ সে অতীত স্মৃতিতে মগ্ন ছিল। বইটা পরাধীন শত্রুর মত মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে আছে। এ তার নিজেরই পাগলামি। বইয়ে লেখা শ্লোকটার জন্যই তার রাগ হয়েছিল। ঐ শ্লোকে নিছক সত্যই আছে। সেইজন্যেই সে ওটার উপর রেগে গিয়েছে। শ্লোকের কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সেদিন সে ভেবেছিল, 'আবার সে কেমন জাল পেতেছে?' সেটা জাল ছিল না আর কুমুদ জাল পাতেও নি। 'আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধি।' এইটেই শ্লোকে বলা জাল, বিধির পাতা জাল। সৃষ্টিরূপী মায়া দিয়ে পাতা এই জাল অনাদিরূপে জগৎময় ছড়ানো রয়েছে। এই জন্যেই সে তাতে আটকে পড়েছিল। হার মেনে নিয়ে রামন্না আবার চেয়ারে বসল।

চোদ্দ

কুমুদের বুঝতে দেরী হল না যে চাদরে মুখ ঢাকলে বাইরের জগৎ দেখা যায় না বটে কিন্তু ভিতরের জগৎটা ঢাকা পড়ে না। শুধু তাই নয়, সে এও বুঝতে পারল যে বাহ্য জগৎ একেবারে ভুলে গেলে অন্তর্জগতের ছবি আরো স্পষ্ট হয়। মুখের চাদর সরিয়ে সে এদিক ওদিক চাইল। মনে হল যেন সব জিনিষ প্রথমবার দেখছে, যদিও ঘরের দৃশ্যটা প্রতিদিনের পরিচিত। তবু তার ঘরের পরিবেশ অদ্ভুত ধরণের ছিল—হ্যাঁ—পরিবেশই তো। একবার যেন পরিচিত মনে হল। কেন? ঘরটা কবে এই রকম মনে হয়েছিল? শুয়ে থাকতে অসহ্য লাগছে। সে মুখের কাপড় সরিয়ে দেখল। হ্যাঁ—তখনও তার এমনি মনে হয়েছিল।

রাত বেশী হওয়ায় ঘুম না আসার ক্লান্তিতে কবে কতদিন আগের কথা সেটা কুমুদের মনে পড়ল না। কিন্তু শুধু ঘটনাটাই কেন, তার খুঁটিনাটি পর্যন্ত তার স্পষ্ট মনে আছে।

কুমুদের মনে হল যে তখন রামন্নাকে অস্থির দেখাচ্ছিল। একদিন সকাল! যে-দিন সরলাদিদি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সেদিন থেকে রামন্নাকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। সেদিনের উদ্বেগের পর যখন নিশ্চিত হওয়া গেল যে বিপদের সম্ভাবনা কেটে গেছে, শুধু সেই রাতে রামন্না তার ঘরে এসেছিল। এর আগে কয়েকদিন থেকে একবারও

আসে নি। সে ভেবেছিল যে স্ত্রীর চিন্তায় মগ্ন ছিল বলেই সে আসে নি। তারপর দিনের পর দিন গেল, দিন ছেড়ে মাস বদলে গেলেও রামন্না তার ঘরে আসে নি। যদি শুধু স্ত্রীর অসুস্থতার কারণেই হত, তবে কারণটা ন্যায্য বুঝে সে সান্ত্বনা পেত। কিন্তু বাড়ীতে সুযোগ পেলেও সে মুখ তুলে তার দিকে তাকাত না। কুমুদের সন্দেহ হল। পরে ভয় হয়েছিল, না হলে সে নিজেই তার ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারত। উৎকন্ঠা কতদিন চেপে রাখা যায়? নিজেকে ভোলাতে সে সরলাদিদির ঘরে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকত। তার আশা ছিল যে অন্ততঃ সেই সময়টুকুও সে রামন্নাকে প্রাণভরে দেখতে পারবে। কিন্তু সে যতক্ষণ সরলাদিদির কাছে থাকত, ততক্ষণ রামন্না সেখানে উঁকি মেরেও দেখত না। যখন যে সরলাদিদির ঘরে যেত তখন যদি রামন্না সেখানে বসে থাকত তবে তাকে দেখে 'এবার ভাল সঙ্গী মিলেছে বলে হেসে ঘর ছেড়ে চলে যেত। এই দেখে কুমুদের মনে রামন্নার জন্য, না জানি কেন, কষ্ট হত। মনের এই অবস্থায় সে একদিন সাহস করে সরলাদিদিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওঁর শরীর কি ভাল নেই?'

সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'কি জানি কেন, জিজ্ঞাসা করলে বলে আমার আবার কি হয়েছে?'

'না, ওঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে কিনা, তাই বলছিলাম।'

'আমিও যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন এমন কিছু বলেছিল।'

'ভালো করে জিজ্ঞাসা করে দেখো। কেন না—'

'আমি জিজ্ঞাসা করলে বলবে না' বলে সরলাদিদি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

কুমুদের সন্দেহ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এ আবার কী? স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া নয় তো? তাকেই উপলক্ষ্য করে নাকি? তার কাছে আসা দূরে থাক মুখ তুলে একবার তাকায়ও না। সরলাদিদি কিছু জানতে পারেনি তো?

'তোমাকে না বলে তো আর কাকে বলবে দিদি?' হাসি-হাসি মুখে নিজের মনোভাব লুকিয়ে কুমুদ জিজ্ঞাসা করেছিল।

সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হুঁ, রাগ হয়েছে হয়ত।'

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার ভিতরে অন্য লোকের নাক গলানো উচিত নয় ভেবে কুমুদ চুপ করে রইল।

সরলা বিষাদভরা সুরে বলল, 'ওঁর দোষই বা কি?'

এরপর কোন কথা না বলে কুমুদ নীচু হয়ে সরলার গায়ের চাদর ঠিক করতে লাগল। সরলা মনের কথা আর চেপে রাখতে পারল না। কুমুদ সেই প্রত্যাশাতেই ছিল। সরলার চিন্তার বাধ ভেঙে কথাটা বেরিয়ে এল।

'ওঁরই বা দোষ কি? তুই বল্ কুমুদ। নিশ্চিন্তে বাইরের কাজ করতে পারবে

বলেই না লোকে বিয়ে করে? অথচ শয্যাশায়ী বৌয়ের জন্যে ঘরে থাকতে হচ্ছে তাই না কুমুদ?' সে সময় সরলার মুখে ফুটেছিল বিষাদ আর দুরাশার হাসি।

তবু কুমুদ কোন কথা বলল না। সে যে কিছু বলছে না সেটা সরলার খেয়াল হয়নি। সে নিজের কথাই বলে চলল—

"ঘরে ফেরার প্রত্যাশায় পথ চেয়ে থাকা, হাসি মুখে 'বড় কষ্ট হয়েছে নাকি গো?' জিজ্ঞাসা করা—তার বদলে ঘরে পা দিয়েই দেখছে শয্যাশায়ী অপয়া বৌকে।"

তখন কুমুদকে বলতেই হল।

বলছ কি দিদি? যা তা ভেবে মনকে কষ্ট দিয়ো না। একটা দিনও তোমাকে দেখতে না পেলে তো পাগলের মতো হয়ে যান। এ সব বাজে কথা তোমায় কে বলেছে?

'তুই কি পাগল, কুমুদ? এ সব কি কারও মুখ ফুটে বলতে হয়?

ওঁর মুখ দেখেই তো বোঝা যায়। প্রথম দিকে ঘরে এসেই দেখতেন যে কিছু উন্নতি হয়েছে কিনা। উন্নতি যে সম্ভব নয়, এটা উনি এখন ভালই জানেন। এখন এসেই, মনের কথা চেপে অন্য সব কথা বলার চেষ্টা করেন। আজকাল ওঁকে দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। আর আমিই বা কি করি? বলতো কুমুদ। ঘরে যদি আজ তিন চারটে বাচ্চা থাকতো তো ঘরে ফিরে তাদের নিয়ে খেলাধুলায় শোর-গোলে কিছু তৃপ্তি পেত। আমার কপালে সন্তান নেই, আমি এসে ওঁর সর্বনাশ করলাম। এখন যাবার সময়······'

এতক্ষণ ধরে কথা বলে সরলা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এই ক্লান্তি সহ্য করার শক্তিটুকুও না থাকায় সরলার চোখ জলে ভরে গেল। এ সব দেখে কুমুদের খুব কষ্ট হল।

'একলা শুয়ে শুয়ে এ সব বাজে চিন্তা করছ কেন দিদি? এ বাড়ীতে কারও মনে এ সব ভাবনা আসে নি।'

সরলাদিদি দুঃখের আবেগ চেপে রেখে বলেছিল, 'তবু আমার স্বস্তি নেই, কুমুদ। বেঁচে থেকে নিজের কর্তব্য করতে পারিনি, অন্ততঃ মরার সময় সেটা করে যেতে চাই। সেইজন্যে তাকে একটা কথা বলেছিলাম। মনে হয় সেই জন্যেই সে আমার উপর রেগে আছে।'

'কী এমন কথা দিদি? আমার তো মনে হয় না যে তোমার মুখ থেকে এমন কথা বের হবে যাতে তিনি মনে দুঃখ পাবেন।'

'যাই হোক, বোন, তার রাগ তো হয়েছে।'

'তুমি কি বলেছিলে, দিদি?'

কিছুটা রাগাবার জন্যে ঠাট্টা করে কুমুদ প্রশ্নটা করেছিল। জিজ্ঞাসা করার সময় কুমুদ ভেবেছিল যে স্বামী স্ত্রীর কোন সাধারণ কথাই বেরোবে। যেদিন থেকে সে বাড়ীতে এসেছে সরলাদিদির মুখ থেকে কোনও শক্ত কথা দূরে থাক,

লাগবার মতোও কোন কথা তার মুখ থেকে বের হয়নি যার ফলে রামন্না রাগ করে তাকে বকেছে। আর এখন তো সরলাদিদির অসহায় অবস্থা, অতএব তার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া রামন্নার পক্ষে সম্ভব নয়। রোগে দুর্বল হয়ে গেলে লোকে ছোট ছেলের মত কতই না বায়না করে। এ সময় মন বড় কোমল হয়ে পড়ে; এইজন্যেই হয়ত সরলাদিদি দুঃখ পেয়েছে। এই সব ভেবেই কুমুদ জিজ্ঞাসা করেছিল।

'আমি তাকে আর একটা বিয়ে করতে বলেছিলাম।'

সরলার এই উত্তর শুনে কুমুদের মনে হল সে যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেছে। সে কোথায়? কার সঙ্গে কথা বলছে? কথাটা কি নিয়ে? সেই মুহূর্তে সে কিছুই বুঝতে পারল না। বিয়ে? রামন্নার? আর একটা বিয়ে? কেন? স্ত্রীই এ কথা বলছে না? কেন? এ কথা শুনে হেসে গড়িয়ে না পড়ে রামন্না রাগ করেছে। কেন? এইরকম নানা ভাবনাচিন্তা একসঙ্গে যেন হুটোপাটি করতে লাগল। এ সব ভাবনার কোন চিহ্ন যেন তার মুখে ফুটে না ওঠে। রামন্নার বিয়ের কথায় তার এত চিন্তা কেন? সরলাদিদির মনে কোন সন্দেহ জাগেনি তো? ভাবনাচিন্তাগুলোর হুটোপাটির শব্দ যেন নিজেও না শুনতে পায়, সেইজন্যে সে জোরে হেসে উঠল। সেদিন সে বুঝতে পেরেছিল যে দুঃখ পেলেও মানুষ হাসতে পারে।

সে হেসে বলেছিল, 'এ্যাঁ! এমন ছেলেমানুষী কথা শুনলে কি রাগ না করে পারে, দিদি?'

'সে করল রাগ, আর তুই হাসছিস?'

সরলাদিদিকে কষ্ট পেতে দেখে তারও কষ্ট হল। তখন সে বলেছিল, 'আমার হাসি দেখে ভুল বুঝো না দিদি। তুমিই একটু ভেবে দ্যাখো। স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে যে দিনরাত এক করে ফেলছে, তারই স্ত্রী যদি তাকে আবার বিয়ে করতে বলে তো—'

'এটুকু কি আমি বুঝি না কুমুদ? সে যখন আমাকে বাঁচাতে চাইছে আমি কি তখন মরার কথা তুলছি? কিন্তু এত কষ্ট যে করছে তারও তো একটু সুখ চাই, আর সেটাও যদি আমার চোখের সামনে মেলে এইটেই—'

'দ্বিতীয় স্ত্রীর কথায় তাঁর হয়ত মনে হয়েছে যে তার কাছে সুখ মিলবে না।' কথাটা বলেই কুমুদের মনে হল যে তার জিভ কেটে ফেলা উচিত। তার মুখ থেকে কিরকম অভদ্র কথা বেরিয়ে পড়েছিল।

চাদর ফেলে দিয়ে কুমুদ বিছানায় উঠে বসল। সে নিজেকেই বলল যে সেদিন তার মুখ থেকে বের হওয়া কথাটা আজ অভদ্র বলে মনে হলেও সেদিন তা মনে হয়নি। এটা তো সত্য যে সেদিন সরলাদিদির সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল তাতে সে কষ্ট পেয়েছিল। কথা শেষ করে সরলাদিদি ঘুমিয়ে পড়লে কুমুদ নিজের ঘরে চলে এল কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে তার ইচ্ছা হল না। তার ভয়

হল যে দাঁড়িয়ে থাকলে মনের চিন্তাগুলো তাকে ধিক্কার দেবে। মনের চিন্তা দূরে করতে সে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। তবু চিন্তার হাত থেকে সে মুক্তি পেল না।

রামগ্নার বিয়ে। সেটা তোমার সঙ্গে কেন হবে না? দিদির বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল ছোট ভাই সে কথা নিয়ে যেমন রাগায়, চিন্তাগুলো সেইভাবে কুমুদকে জ্বালাতন করতে লাগল। প্রশ্নটা বার বার মনে আউড়ে কুমুদের মনে হল, 'এটা সত্যি হতে পারে' কিন্তু এই মিথ্যা বিশ্বাসটা তার মনে বেশিক্ষণ টিকল না। কথাটা যদি সত্যি হবে তবে রামগ্না রাগ করল কেন? কথাটা মনে আসতেই সে যেন ঘা খেল। তাকে বিয়ে করতে হবে মনে করেই কি রামগ্নার এত খারাপ লাগল? এত অসহ্য মনে হল? সামনের আয়নায় সে নিজেকে দেখল। তার উপর রামগ্নার অধিকারের দৃশ্যগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এর পরেও রামগ্নার রাগ! ছিঃ এ বিয়ের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই। তার কাছে রামগ্নার আসার পর ক'দিন কেটে গেছে। সে চোখ তুলে দেখেও না। হ্যাঁ! কুমুদের মনে হল যে সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। আর কাউকে বিয়ে করবার ইচ্ছে রামগ্নার মনে থাকতে পারে। সেই জন্যেই সে তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

কথাটা মনে আসতেই কুমুদের মনে হল যেন তার দেহে আর প্রাণ নেই। অন্য কারও সঙ্গে রামগ্নার বিয়ে—এ কল্পনা তার সহ্যের সীমার বাইরে; তাই জোর করে চোখ বুজে মাথা নেড়ে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বকে কুমুদ বলল, 'না, না। এ মিথ্যে, এ হতেই পারে না'। আয়নার কাছে এসেই তার হুঁশ হল। আরে! এ কী পাগলামি করছে সে? অলীক কল্পনায় এমন আত্মহারা হলে কি চলে? কিন্তু এতো কল্পনাও নয়। সে নিজের কানে সরলাদিদিকে বলতে শুনেছে—'রামগ্নার দ্বিতীয় বিয়ের কথা।'

'ছিঃ, এ হতে পারে না', বলে সে নিজেকেই সান্ত্বনা দিল। তারপর মনে পড়ল সরলাদিদিই বলেছিল রামগ্নাই রাগ করেছে। কথাটা মনে হতে ক্ষণিকের জন্য খুশি হল সে, কিন্তু পরক্ষণেই মন বিষাদে ভরে গেল। রামগ্নার আবার বিয়ে করা সম্ভব নয়—তার মানে কি? যদি কথাটা তাকে নিয়েই হয় তবে এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে সে তাকে বিয়ে করতে চায় না? সান্ত্বনা পাবার আশায় সে আয়নার কুমুদের দিকে তাকিয়েছিল।

মন বাস্তবিক কত চঞ্চল! আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তার সারা মন নিজেকে দেখেই মোহিত হয়ে গেল। সে রামগ্নার। বিয়ে হোক বা না হোক সে সম্পূর্ণভাবে রামগ্নারই। রামগ্না যাকে খুশি বিয়ে করুক না কেন, সে তো রামগ্নার। এ কথা যেন সে নিজের প্রতি-

বিশ্বকেই শোনাতে চায়। 'যজ্ঞে আহুতি দেওয়া পশুর স্বর্গলাভ হয়'—এ কথা যারা বলে তাদেরও স্বর্গের কোন ধারণা নেই—সে সময় কুমুদ এই সত্য তর্ক করে প্রমাণ করবার জন্য তৈরী ছিল। এক ধরণের যজ্ঞে তার দেহটা আহুতি দেওয়া হয়ে গেছে বলে সেই দেহ আনন্দই পেয়েছে ভেবে তার দেহ পুলকিত হয়ে উঠেছিল। প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে নিজের দেহটার জন্যেই তার গর্ব হল। নিজের অজান্তেই সে তাড়াতাড়ি সাজগোজ করে নিল। তারপর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে দেখতে পেল রামন্নার ঘরের আলো দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে। সেই আলোর টানেই পতঙ্গের মতো সে দ্রুত সেই দরজার কাছে পেঁছে গেল।

দরজার কাছে পেঁছে সে থামল। থামল মানে কি? আনমনে কি সে দরজা খট খট করেছিল? না—সে তো বুকের স্পন্দনের শব্দ। ধক-ধক। না, এ তো ঘরের ঘড়িটার আওয়াজ। টক-টক। উঁহু—কুমুদের মনে হল যে রামন্না ভিতরে ধীরে চলাফেরা করছে। কথাটা মনে আসতেই তার মুখে হাসি ফুটল। মনের মতো শক্তিমান সংসারে আর কিছুই নেই। সেই মুহূর্তে আনন্দে কুমুদের মনে হল যেন সে চোদ্দ ভুবন বিজয় করেছে। রামন্না পায়চারি করছে কেন? তার জন্যে, শুধু তারই জন্যে। রামন্না মিলনপিপাসু কুমুদের বুঝতে দেরি হল না। তাকে ছেড়ে রামন্না থাকতে পারবে না। সরলাদিদির কথায় ভয় পেয়েছে। সেইজন্যে পায়চারি করছে। এখন সে কি রকম অবাক হয়ে যাবে? দেবতার অনুগ্রহপ্রার্থী ভক্তের সামনে দেবতাকে সশরীরে উপস্থিত দেখলে ভক্তের অবস্থা কেমন হবে? কুমুদ ধীরে দরজায় হাত রাখল। দরজা খোলাই ছিল। এখন সে ভিতরে যাবে! গিয়েই পিছন থেকে রামন্নার চোখ চেপে ধরতে হবে! উঁহু; চোখ বন্ধ করে দিলে কাজ হবে না। রামন্নাকে জড়িয়ে ধরবে! নিজের বাহুবন্ধনে তাকে এমন জোরে চেপে ধরতে হবে যেন তার শরীরে নিজের শরীর মিশে যায়! না—তাও না—ঐ তো, ও এদিকেই আসছে। অন্তরের অস্থিরতায় ওর মুখটা কি সুন্দর দেখাচ্ছে। চিন্তায় ওর ঠোঁট কাঁপছে। কাঁপা ঠোঁট দেখে কুমুদের মুখ আধখোলা হল। তার ইচ্ছে হল যে ওর ঠোঁট নিজের ঠোঁট দিয়ে এত জোরে চেপে ধরে যেন সে নড়তে না পারে। তাতেই কি তৃপ্তি হবে? দুহাতে তার মুখটা জোরে চেপে ধরে? মাগো মা, ওই মুখ আমার সামনে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। ও মুখ কি সামনে দেখাবার? ওকে লুকিয়ে রাখতে হয়, চুমু খেতে হয়—

সে রাতে তার মন যে ভ্রষ্ট হয়েছিল, তাতে সন্দেহ ছিল না। মনে একের পর এক চিন্তার ফলে সে যেন জ্ঞানহারা হয়ে গিয়েছিল। রামন্না খাটে বসেছিল, সে ছিল তার পাশে। রামন্না হাত দিয়ে তাকে বাধা দিয়ে খাট থেকে ওঠবার উপক্রম করছিল—এটা দেখেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল।

'এ কি! এমন করছ কেন? এখানে কেন এলে?' বলতে বলতে রামপ্পা দূরে সরে যাচ্ছিল।

তখন কুমুদের মাথা-সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল যেন বর্ষার জলে পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে। তার মনে হল যদি তার প্রাণ বেরিয়ে যেত তো ভাল হত। রামপ্পার মুখের ভাব দেখতে দেখতে তার পাগলামি কমে আসছিল। শেষে কোন কথা না বলে মুখ নিচু করে সে নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল। আনন্দে মনের আবেগ যত বাড়ে, নিরাশায় শরীরও তেমনি অসাড় হয়ে পড়ে। কেন না সেখান থেকে নিজের ঘরে হেঁটে আসতে তার না জানি কত সময় লেগেছিল। ঘরে ফিরে সে মুখ ঢেকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মুখ ঢাকলেও তার মনের চিন্তা আপনিই বেরিয়ে এল—'ও আমাকে চায় না।' পরক্ষণেই মনে হল যে ওকে কেউই চায় না। ভাবতেই তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল।

এটা কবেকার কথা। হ্যাঁ—সেই রাতের কথা। সেদিন সে ভেবেছিল, 'আজ থেকে আমি মনে প্রাণে বিধবা!' ঠিক হয়েছে। সরলাদিদি সশরীরে না থাকলেও সারা বাড়ীতে যেন ছড়িয়ে রয়েছে। তাই সে আমরণ বিধবাই তো রয়ে গেছে। কিন্তু কুমুদ ভোলেনি যে শরীরের দিক থেকে বিধবা নয়। সে ভাবল যে মনের যেমন নিজস্ব সত্তা থাকে, শরীরের তেমন কোন জিনিষ নেই। দেহের কথায় তার খেয়াল হল যে শরীর বেশ ক্লান্ত। দেহ? কুমুদ ভয় পেল। ওঃ!—এই শরীরটা কি নির্লজ্জ—কথাটা মনে আসতেই শিকারীর তাড়া খাওয়া পথহারা হরিণের মতন সে আবার বিছানায় উঠে বসে দুহাতে নিজের মাথাটা জোরে চেপে ধরল।

পনের

রামপ্পার অবস্থা হল সেই লোকটার মতো যার হাঁচি পাচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না। কষ্টকর হলেও হাঁচি বের হয়ে যাওয়াই ভালো, না হলে সর্দি কমে না। রামপ্পা চেয়ারে বসে সরলার ছবিটা দেখছিল, 'পাগলী, দেখলে তো? তোমার উদ্দেশ্য যত ভালো ছিল, পরিণামটা ততই খারাপ দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত তুমি আমার চেয়েও বড় সাহিত্যিক হলে! কেমনভাবে উদ্বেগের এক ট্র্যাজেডী তৈরী করে গেলে তুমি? অবশ্য তুমিও জানতে না যে তুমি আমায় ভুল বলেছিলে। কারো ভুল না হলেও ট্র্যাজেডী তার পরিণতি দেখিয়ে দিয়েছে।' বলতে বলতে রামপ্পা চট করে উঠে দাঁড়াল। তার মনে হল যে সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে। যখন মানুষ বর্তমান

ভুলে অতীতের স্মৃতিচারণে উৎসুক হয়ে পড়ে তখন সেটা তার বার্ধক্যের লক্ষণ। এটা সে কোথাও পড়েছিল। সেই কথা মনে পড়ায়, 'ছিঃ, আবার সেই কথা' বলে পায়চারি করতে লাগল। বেড়াতে বেড়াতে তার মনে পড়ল সেই দিনটার কথা! ভালো কথা, সেই স্মৃতি একেবারে বের করে দিয়ে মনটা হাল্কা করা উচিত। হ্যাঁ, সেদিন সে এমনিভাবেই ঘরে পায়চারি করছিল। কেন? সেদিন কি হয়েছিল? হ্যাঁ, সরলা সেদিন আবার তার বিয়ের কথা তুলেছিল। কথাটা উঠতেই লজ্জায় তার সেখান থেকে পালিয়ে আসার ইচ্ছে করছিল। জানিনা কেন? সরলা 'বিয়ে' কথাটা বলতেই তার চোখের সামনে কুমুদের মূর্তি ভেসে উঠেছিল। মনশ্চক্ষে সেই মূর্তি আর সামনে সরলা—তাই তার মনে হয়েছিল যে সে সরলাকে ঠকিয়েছে। অপরাধীর মতো পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। তার আর কুমুদের অবৈধ সম্পর্ক সরলাকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে অথচ প্রতিকারের ক্ষমতা তার নেই। এই সব ভেবেই সে বিয়ের কথা তুলেছিল। এই সন্দেহের জন্যে রামন্নার মনে হল তার বুকের ভিতর কে যেন করাত চালাচ্ছে। একবার মনে হয়েছিল সরলা খুব সরল। সে সরল মনেই বলছে, ওর তো কুমুদের সঙ্গে থাকা অভ্যেস হয়ে গেছে, অতএব 'হ্যাঁ' বলে দিক। পরক্ষণেই রামন্না জিভ কামড়াল। ইস্‌ কী মূর্খামি হচ্ছে। সরলার মনের কথা তো জানা নেই। এ কী ভাবছে সে? সরলা তো আবার বিয়ে করার কথা বলেছে, সে তো বলেনি যে কুমুদের সঙ্গে বিয়ে হোক। এ কথা তার মনে হলে সে কি স্পষ্ট করে বলত না? সে তো একবারও বলে নি। এই পরিস্থিতিতে নিজে থেকেই 'ভালো কথা আমি কুমুদকে বিয়ে করব' যদি বলি তবে নিজের দোষ স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হবে না?

কিন্তু নিজের দোষ স্বীকার করতে রামন্না রাজী ছিল না! যদি সে কুমুদকে ভাল বাসত তবে না হয় সেটা অন্যায় বলা যেত। কিন্তু সে কুমুদকে ভালবাসে না। ভালবাসে না? তবে? প্রেম ছাড়া শরীরের সম্পর্ক কি ব্যভিচার নয়? সে কি সত্যিই কামুক? এ কথা মেনে নিতে রামন্না রাজী নয়। নিজের অজান্তেই হয়ত সে কুমুদকে ভাল বেসেছে? তার এই অনিশ্চিত মানসিক স্থিতির মধ্যে সরলা যখন আবার আর একটা বিয়ের কথা তুলল তখন সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। নিজের মানসিক স্থিতির বিষয়ে সে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারে নি, কিন্তু কুমুদের সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ ছিল না। সে রাতের ঘটনার পরে রামন্না পুরোপুরি বুঝেছিল। সেদিন মনস্থির করতে না পেরে ঘরে পায়চারি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে শেষে খাটে বসে পড়েছিল। তারপর তার সন্দেহ ও ভয় ভাবনার মূর্ত প্রতীক রূপে কুমুদ তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। সেদিন কুমুদের মুখ দেখে কুমুদ যে তাকে ভালবাসে এ বিষয়ে সে একেবারে নিশ্চিত হয়েছিল। কিন্তু প্রেম যত কোমল ততই নিষ্ঠুর, যত আকর্ষণীয় ততই ভয়ঙ্কর; আনন্দের সঙ্গে ভাবনাও সৃষ্টি করে—এ

বিষয়ে রামন্নার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। সে সময় কুমুদকে কেমন দেখাচ্ছিল? পতঙ্গের কাছে আগুন যেমন আকর্ষণীয় দেখায় রামন্নার কাছে কুমুদকে তেমনি দেখাচ্ছিল। চোখ তুলে তাকে দেখবার সাহস রামন্নার হল না। পাছে ওর সৌন্দর্য তাকে টেনে নেয় এই ভয়ে রামন্না মুখ ফিরিয়ে খাট থেকে উঠতে যাচ্ছিল। তাই কুমুদের প্রসারিত হাত তাকে স্পর্শ করতে পারল না। চোখের পলক পড়বার আগেই কুমুদ হাত বাড়িয়ে মুখ তুলে তাকাল। সৃষ্টির খেলা কি বিচিত্র; তখনই মনে হল যে তার সৌন্দর্য ঘামে ধুয়ে গিয়েছে। তার মুখে শুধু কামনার কুৎসিত রূপ। ধীরে ধীরে সেও তাকে দেখল। চেহারার পরিবর্তন দেখে ওর দিকে তাকাবার সাহস হল। কথা বলার দরকার না থাকলেও তার মুখ থেকে কিছু কথা বেরিয়ে গেল— সেই কথা শুনেই কুমুদ চলে গিয়েছিল।

সেদিন রামন্নার ভয় আরো বেড়ে গেল। তখন সে বুঝতে পেরেছিল যে কুমুদের ভালবাসা এক জিনিস আর কুমুদকে ভালবাসা অন্য জিনিষ। কাউকে ভালবাসি তার ভালবাসা না পেলেও দুঃখ হয় না। কিন্তু ভাল না বেসে ভালবাসার ফাঁদে পড়া অসহ্য। বিশেষতঃ যখন সে নিজে ভালবাসে না। এ ব্যাপারটা রামন্না আজ পর্যন্ত বুঝতে পারে নি। শিকারী কুকুরের তাড়া খাওয়া খরগোশের মতো সে সেদিন থেকে কুমুদকে এড়িয়ে নিজের ঘরেই বেশির ভাগ সময় কাটাতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সরলার কাছে যেতেও তার ভয় করে। তার ভয় ছিল যে 'আর একটা বিয়ে' কথাগুলো আবার শুনতে পেলে না জানি তার কি দশা হবে। তাই যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো। সেই বা কেমন পাগল। দূর! এর কোন মানেই হয় না। সেটা রামন্না ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারল। শরীরের সংশ্রব থেকে যতই সরে থাকে, মন ততই তাকে কুমুদের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কুমুদ দেহের কাছে না থাকলেও তাকে মনের কোণে নিশ্চিতভাবেই থাকতে দেখে রামন্না বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিল। মাঝে মাঝে তার মনে হত যে এই যদি মনের অবস্থা হয় তবে দেহটাকে দূরে সরিয়ে রেখে লাভটা কি? যাই হোক না কেন, কুমুদ যখন তাকে ভালবাসে তখন সে হয়ত আপত্তি করবে না; তবে একবার দেহের খিদে মেটাতে দোষটা কি? বিয়ের কথা তো কুমুদ মুখ ফুটে বলে নি। তবে আর ভয় কি? এই ভেবে সে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। যদি এতেও না হয় তবে সরলার পরে—

কথাটা রামন্নার নিজেরই খারাপ লাগল। 'সরলার পরে' এমন চিন্তা যা আগে কখনো আসেনি তা আজ এল কেন? সে কি এতই কৃতঘ্ন? ভিতরে ভিতরে তার মন কি সরলার মৃত্যুর কথা ভাবছে না? ছিঃ—ওই দেবীর সামনে সে তো রাক্ষস। নিজের সুখ দুঃখ ঘুচিয়ে শুধু আমার সুখের জন্যেই সে আমাকে আবার বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করছে। আজ এমন কথা মনে হল কেন? কি জন্যে ওর মৃত্যু কামনা করছি? রামন্না নিজেকে বারবার ধিক্কার দিতে লাগল। সে ঠিক

করল যে কিছুদিন পরে নিজেই সরলার কাছে যাবে আর পুনর্বিবাহে রাজী হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সে সাহস হল না। ওদিকে সরলার স্বাস্থ্য দিনের পর দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে তার সামনে এ সব কথা বলা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে না মনে করে সে গড়িমসি করতে লাগল। আবার ভয়ও করছিল এই ভেবে যে পাত্রী যদি কুমুদ না হয়।

শেষ পর্যন্ত কুমুদই সর্বক্ষণ তার মন জুড়ে রইল। সরলার শরীর আরো ভেঙে পড়লে কুমুদের সঙ্গ এড়িয়ে চলাও রামন্নার পক্ষে সম্ভব হল না। রোগীর পরিচর্যার জন্য ও অনিবার্য মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসতে দেখে রামন্না আরো বেশী সময় কুমুদের সাহচর্যে কাটাত। সরলার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে দেখে রামন্নার আত্মগ্লানি যেন সহ্য শক্তির সীমা ছাড়ায়। শেষে এক রাতে ফাঁসীর আসামীর মত অতি অসহায় মানসিক অবস্থায় সে কুমুদের ঘরে গেল।

কুমুদ তাকে ভালবাসে। আজ না হয় কাল ইচ্ছে করলে তার সঙ্গেই বিয়ে হতে পারে। এ দুটো ধারণা রামন্নার হাতে অন্ধের দুটো লাঠির মতো তাকে সাহায্য করছিল। কুমুদ যে তাকে ভালবাসে এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কেন তার স্পর্শে যে কুমুদের অঙ্গাঙ্গ কোমল হয়ে উঠত, এখন একটু ছোঁয়া লাগলে শক্ত হয়ে উঠছে। এমন হচ্ছে কেন? কিন্তু কুমুদ কখনও নিজের অনিচ্ছা জানায়নি। শুধু এই ভরসাতেই রামন্না ধৈর্য ধরেছিল। বিশেষতঃ কয়েকদিন আগে কুমুদের মুখে যে ভাব দেখেছিল, সেই ছবিটা মাঝে মাঝে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই ছবিটা সামনে এলে সেও তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে। যখন সে তার ভুল বুঝতে পারে তখন নিজেকে অপরাধী ভেবে তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। কতোবার নিজের সিদ্ধান্ত আর ব্যবহারের জন্যে নিজের মনেই লজ্জা পেতে হয়েছে। তখন কুমুদের জন্যে করুণা হত। সে সময় তার সঙ্গে কথা বলে তার মনটা নিজের দিকে টানবার চেষ্টা করত। যে কুমুদ সাধারণতঃ চুপ করে থাকে সেই কুমুদ তাকে একবার নিরুত্তর করে দিল। তখন তার সাহস উবে গিয়েছিল।

একবার সে অনুশোচনার সুরে প্রশ্ন করেছিল, 'কুমুদ তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?'

কুমুদ কোন উত্তর দেয়নি, বরং একটা দীর্ঘশ্বাস টানবার চেষ্টায় তার শরীর কেঁপে উঠেছিল। এটা সে বুঝতে পেরেছিল।

যেন ক্ষমা চাইছে, এমন ভাব দেখিয়ে সে বলেছিল, 'তোমার রাগ হয়ে থাকলেও তাতে তোমার দোষ নেই।'

'যে নিজে ভুল করে অপরের ভুল ধরবার অধিকার তো তার নেই।'

'কী সাংঘাতিক জবাব ছিল সেটা !

'আমিও তো তাই বলছি। সেইজন্যেই আমি কখনো বলি না যে তোমার ভুল হয়েছে।'

দূরে সরে যাবার চেষ্টা করে সে বললে, 'আমি তো আমার কথা বলেছি। কারও ভুল ধরবার অধিকার তো আমার নেই।'

তাকে নিজের দিকে টেনে রামন্না বলল, 'পাগলী! তোমার দোষ হল কোথায়? এতদিন আমি যেন তোমায় ভুলেছিলাম। সেটা তো আমারই দোষ। সেইজন্যে তোমার রাগ হওয়াটাই তো ঠিক।'

অন্ধকারে তার হাসিভরা মুখ দেখতে পাচ্ছিল না বটে কিন্তু সে বুঝতে পারছিল সে হাসিতে কতো অনুযোগ-ঘৃণা-হতাশা রয়েছে। ব্যাপার দেখে তার সাহস উবে গেল। তবু সেটা লুকিয়ে সে একটু জোর গলায় প্রশ্ন করেছিল, 'কেন? আমার কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'যে বিশ্বাস আছে সেটা যে রাখতেই হবে এমন প্রতিজ্ঞা তো করিনি।'

'এ কী বলছ কুমুদ? তুমি কি ভাবছ যে তোমাকে ধাপ্পা দিচ্ছি?'

'আমি তো চোখ খুললেই অন্ধকারে হাঁটি।'

'যদি তোমার এতেও না বিশ্বাস হয় তো কি করলে বিশ্বাস হবে বল। আমি তাই করতে রাজী।'

এ কথায় সে হেসে বললে, 'যে দোষ করে সে লুকোবার চেষ্টা ছাড়া আর কী বা করতে পারে?'

'যদি চাও তো চলো, আমি সরলার সামনে নিজের মুখে এখনই সব স্বীকার করে নিচ্ছি।'

'কেন? এই সব বলে তাকে মেরে ফেলতে চান?'

'হ্যাঁ। কি বললে?'

'বলবেন আবার কি? তুমি শয্যাশায়ী হতে না হতেই আমি এই পথ ধরেছি। এটা শুনলে তার বুক ফেটে যাবে না? দয়া করে আপনি আমার এই উপকারটুকু আর করবেন না।'

'আমি তো এইজন্যই চুপ করে আছি। তবে আর কী করবো? যা বলো আমি তা করতে রাজী।'

'দিদির বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমার কাছে আসা বন্ধ করতে পারেন?'

এ কথাটার পশ্চাদপট রামন্নার জানা ছিল না। তাই সে এটাকে একটা তামাসা ভেবে হেসে উঠেছিল। 'দুষ্কর্ম তো চুরি করেই করতে হয়। আর তাকেই তুমি যে বন্ধ করবার কথা বলছ সেটা বেশ মজার কথা। হাঃ হাঃ হাঃ।

'তাহলে আপনি এটাকে দুষ্কর্ম মনে করেন?'

'এ্যাঁ! কি বললে? ছি-ছি, আমি নিজের কথা ভেবে বলি নি। লোকে এই রকম ভাবে। তাই বলেছিলাম।'

'তবে আপনার মতে এটা ভাল কাজ?'

'ব্যাপার কি কুমুদ? কথার ফাঁদে আমায় জড়াতে চাও? ভালো না মন্দ? তোমার আর আমার মধ্যে এ কথা আসতেই পারে না। দুজনের সম্মতিতেই এটা হয়েছে।'

'আপনি মনে প্রাণে সেটা স্বীকার করেন?'

'মন তোমার কাছে হার মেনেছে। চেষ্টা করলেও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না। এ তো তুমি নিজেই দেখেছ—'

'আমি কি করে জানবো যে আপনার মন এটা মেনে নিয়েছে? আমার তো মনে হয় এটা আপনার দেহের আসক্তি,' মাঝপথে এই বলে সে তাকে নিরুত্তর করে দিয়েছিল।

রামপ্পা ভাবল অদ্ভুত কথা বটে। ওর এত বুদ্ধি কবে হল? এমন বিচার শক্তি? আসন্ন সঙ্কটের প্রতিকারের জন্য প্রকৃতিই মানুষকে প্রয়োজনীয় শক্তি দেয়। যে কোনদিন কথাই বলত না সেও আজ কত কথা বলছে।

তখন সে বলল, 'কী? চুপ করে গেলেন কেন?'

'কথাটা তা নয়, কুমুদ; আমাকে ভুল বোঝবার জন্যে যদি জিদ ধরে থাকো তো কি করা যাবে? যে ঘুমের ভান করে তাকে'···

'ভান করল কে? আমি আপনার প্রেমের আধার, এ কথা এক সময় মুখ ফুটে বলতে আমার কোন ভয় ছিল না।'

'এক সময় বলছ কেন? এখনও তুমি আমার······'

'সে কথা বললে আর আমি আনন্দ পাই না।'

'অনর্থক ভুল বুঝে······'

'আমি আপনার কাছে শুধু লালসার বস্তু।' বলে কুমুদ উঠে চলে গিয়েছিল।

এই সব কথা স্পষ্ট ভাবে রামপ্পার মনে থাকার অন্য একটা কারণও ছিল। সেদিন থেকে কুমুদ তাকে এড়িয়ে চলত। রাতে নিজের ঘরে ছিটকিনি বন্ধ করে শুতো। তাকে দেখতে পেয়ে রামপ্পা হাসিমুখে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে সে চোখের ভর্ৎসনায় তাকে নিরুৎসাহিত করত। কুমুদ বেশীর ভাগ সময় সরলার কাছেই কাটাত। যদি সে সেখানে থাকত তবে যতক্ষণ না সে উঠে যায়, ততক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকত। তার এই ব্যবহারে রামপ্পার অনুতাপ হত, আর সেইসঙ্গে এও মনে হত যে কুমুদ তাকে হেয় করছে। কিন্তু এই মানসিক অবস্থায় রাগ করবার উপায় ছিল না।

কিছুদিন পরে সে আর কুমুদ সরলার কাছে বসেছিল। তখন সরলা বলল,

'কুমুদ একটু কফি তৈরি করবি? কেন জানি না মুখটা বিস্বাদ লাগছে।' কুমুদ উঠে রান্নাঘরে গেল। তখন সরলা বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে এসো তো।' কোন্ দরজাটা? বন্ধ কেন? ব্যাপার কি? রামন্না কিছুই বুঝতে পারল না।

সরলা তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, 'রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে এস। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

রামন্নার পা সরছিল না। তার মনে হল সে, যে প্রসঙ্গের জন্যে তার ভয় ছিল শেষ পর্যন্ত সেটাই এসে পড়ল। কুমুদ তার রাগের ঝাল ঝাড়ছে।

'আমি বলছি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসো।'

'না আমি বলছি যে অনর্থক বাজে কথা বলে ক্লান্ত হওয়া কেন? এমন কি কথা আমাকে বলা দরকার?'

যাই হোক দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দণ্ড ভোগবার জন্য তৈরী আসামীর মতই সে এসে বসেছিল।

'তোমার হাতটা দাও।'

যন্ত্রবৎ হাতটা সামনে বাড়াল।

'আমি বলছি বলে যেন রাগ করো না।'

'সরলা, কেন নিজেকে ক্লান্ত করছ?' শেষ চেষ্টা করে সে বলেছিল।

'ক্লান্তি?' সরলার মুখে এক বৈরাগ্যের আভা ছিল, 'এবার থেকে আমার ক্লান্তির কথা আর ভাবতে হবে না।'

রামন্নার মনে হল যেন কেউ পিছন থেকে এসে তার গলা টিপে ধরেছে। তার মনে হল সে দুষ্ট, ক্রুর, কৃতঘ্ন, কামুক···

'কি হলো? খারাপ লাগছে? আমিও তো কতোদিন ধরে ছটফট করছি।'

রামন্নার মনে হল আবার কোন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সে প্রশ্ন করল, কি বললে?' তার হাতের উপর নিজের হাত রেখে সরলা বলল, 'তোমার বুক শক্ত জেনেই বলছি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।'

কোন কথা বলার আগেই রামন্নার চোখ জলে ভরে গেল।

'এ কী? ছেলে মানুষি করছ কেন? এ ঘরে যতদিন রয়েছি সুখেই কাটিয়েছি আমি চলে গেলে তোমার যেন কষ্ট না হয়। সেই জন্যেই এতো মিনতি করছি। তুমি তো আগে থেকেই কাঁদতে লাগলে।

রুমাল হয়তো কোটের পকেটে রেখে এসেছ। আমার আঁচলেই চোখ মোছো।'

এমন পরিস্থিতিতে ওর কথায় রামন্নার হাসি পেল। মাথা নিচু করে চোখ মোছবার সময় সরলা তার মাথায় হাত রেখেছিল। মৃত্যুপথ যাত্রীর সে স্পর্শে রামন্নার মনে নব চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। সরলার মৃত্যু যে ঘনিয়ে এসেছে সে বিষয়ে তখন রামন্নার কোন সন্দেহ ছিল না। চোখের জল বেরিয়ে দুঃখের বেগও কমে গিয়েছিল।

'সরলা, আমাদের কি তোমার এতই খারাপ লাগছে। বার বার মরার কথা মুখে আনছ কেন?'

'মুখে না আনলেই কি সেটা আটকায়? মরণের দরজায় দাঁড়িয়ে তোমায় বলছি, শুনবে?'

'মরার কথা ছাড়ো। তুমি যা বলতে চাও সব বলো।'

'রামপ্পায় হাতে হাত রেখে সে বললে, 'শুনবে তো?'

'কেন সন্দেহ করছো?'

'কবে থেকেই তো বলছি, কথায় যে কানই দাও না, জানি না আর একবার বলবার সুযোগ পাবো কিনা। তাই…'

'কোন কথা?'

'মরবার আগে স্ত্রীর ইচ্ছে এইটা।'

'কথাটা কি সরলা? মনে চেপে রাখছ কেন? কি কথা? বলো।'

'কথা আবার কি? সেই…'

'কী? আবার বিয়ে? ওঃ!' কথাটা রামপ্পা উড়িয়ে দেবার আশায় জিজ্ঞাসা করেছিল।

'হ্যাঁ, কুমুদের সঙ্গে বিয়ে।'

'কী?' রামপ্পার মনে হল যেন তার পিঠে চাবুক পড়েছে।

'আমি চোখ বোজবার আগেই এটা হয়ে গেলে…'

'কুমুদের সঙ্গে বিয়ে।'

'না জানার ভান করো না। কতবার তো তোমাকে বলেছি।'

'কুমুদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, একদিনও তো আমার কথা শেষ পর্যন্ত শোনো নি' কতবার বলতে চেয়েছি।'

হঠাৎ রামপ্পার মনে হল এখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। 'না' বলে দিলে ওর মনে দুঃখ হবে। 'একদিন ভেবে বলবো' এই কথাই বলা উচিত। এই ভেবে সরলাকে সে ঐ কথাই বলেছিল।

'পরে ঠিক করবে কেন?'

'সরলা, তুমি জান না তোমার এই কথায় আমার কত দুঃখ হয়। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ভেবে চিন্তে তবে জানাব।'

হতাশ হয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে সরলা বলেছিল, 'জানি না তোমার বলবার দিন পর্যন্ত বাঁচবো কি না।'

'তুমি একটা পাগল।'

কিন্তু শেষে সে নিজেই পাগল প্রতিপন্ন হল। এই কথা হবার পরের দিনই সরলা কোন উত্তর না শুনেই চিরকালের জন্য চোখ বুঁজেছিল।

রামপ্পা বসে ছবিটা দেখতে দেখতে সেদিনের স্মৃতিতে ডুবে গেল। চোখ দিয়ে

জল পড়তে লাগল। চোখের সামনে অন্ধকার, ছবিটা আবছা দেখালেও সেটার দিকেই চেয়ে রইল।

ষোল

কিছুক্ষণ নিজের মাথাটা জোরে চেপে ধরার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুমুদ উঠে দাঁড়াল। তার মনে হল যে শরীরটা কত লজ্জাহীন হয়ে গেছে—নির্লজ্জতার সীমা নেই। সেই না একদিন রামন্নাকে বলেছিল, 'আপনার শুধু দেহের লালসা আছে।' কিন্তু কোন অধিকারে সে বলেছিল? মনে এত ঘৃণা, অনিচ্ছা, বিরক্তি থাকলেও সে কি নিজে রামন্নার সংসর্গের জন্য লালায়িত হয় নি। একদিনও কি সে তাঁর সঙ্গলাভের ইচ্ছে ছাড়া থাকতে পেরেছে? মৃত্যুর সময়ে সরলাদিদি তো ওঁকে স্পষ্ট করেই বলেছিল, তবু ও কি স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলেন? তার আরো মনে হল যে তাকে বিয়ে না করার জন্য উনি নিজের স্ত্রীকেও মরতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এ সব জেনেও নিজের দেহটা তাঁকেই দিয়েছি। শুধু তাই নয়, তাঁর সত্তা নিজের দেহে ধারণ করেছি নির্লজ্জের মতো। এতদিন কেন যে বুঝতে পারি নি। আজ থেকে একমাস আগেই জানা উচিত ছিল, কিন্তু একেবারেই খেয়াল হয় নি—কুমুদ আবার গিয়ে বিছানায় বসল। সব ব্যাপারেই তার দুঃখ হল। দুঃখ এইজন্য যে ঘরে বাচ্চা দেখবার জন্য ব্যাকুল সরলাদিদিই বাচ্চা না দেখে চলে গেল। এখন এতে আর কে সুখী হবে? তার মুখে তিক্ত হাসি ফুটল। সেই সঙ্গে খুশীও হল। তার মনে হল ব্যাপারটা রামন্নাকে জানানো উচিত। এ খবর শুনে উনি যে কষ্ট পাবেন তা দেখে প্রাণভরে হাসা যাবে।

সতের

রামন্না চোখ মুছে উঠল। এমন কষ্ট আর ভোগ করা যায় না। কালই কুমুদকে কথাটা স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে। একটা কিছু স্থির না করলে মনে শান্তি আসবে না। উঠতে গিয়ে সে হাতের ঘড়িটা দেখল—ভোর চারটে বাজে। কতক্ষণ ধরে সে এভাবে বসে আছে মনে হতেই তার শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল।

হাই তুলল। বাইরে যাবার সময় আবার ছবিটা দেখল। 'সরলা, তোমাকে বাঁচাবার জন্যে তোমার কথা মেনে নিতে পারতাম, কিন্তু এখন মেনে নিয়ে কোন লাভ নেই। তুমি যে ঐ জন্যেই প্রাণ দিলে সে কথা কখনো ভুলতে পারি না। কিন্তু যার জন্যে তোমায় প্রাণ দিতে হল তাকে আমি ঘরে রাখতে পারি না। ক্ষমা করো।' মনে মনে সে এই প্রার্থনা করল।

আর একটা বিয়ে! ছিঃ।

বেচারী সরলার বড় আকাঙ্খা ছিল যে ঘরে যাতে 'ছেলে মেয়ে হয় সেইজন্যে আমি বিয়ে করি।

রামন্না একবার নিজেকে সামলে নিল। কিছু চিন্তা করে তার মনে হল যে প্রাণ বাঁচল। তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশ্বাস নিল।

হ্যাঁ! না হলে এ সমস্যার সমাধান কোন দিনই হতো না। কিন্তু এখন তো কোন বাধা নেই। ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে এগোতেই সামনের দিক থেকে কুমুদ হাসি মুখে এল। রামন্না একটু ভয় পেল।

'লিখছিলাম, দেরি হয়ে গেল। এই শেষ হলো, ঘড়ি দেখছি।'

আমারও একটা খুশির খবর দেবার ছিল। তাই আপনার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলাম না। চলেই এলাম।'

'ওহো। তবে আর কি? আমারও একটা কথা বলবার ছিল।'

কুমুদ হঠাৎ বলল, 'আমি মা হতে চলেছি।'

'অ্যাঁ!' রামন্নার বুক কেঁপে উঠল। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এতো খুশির কথা।' কথাটা মুখ থেকে বের হতেই রামন্নার মনে হল যে এখন কোন কথা বলে আর লাভ নেই।

রামন্নার উত্তর শুনে কুমুদ চমকে গেল। সে মনে মনে বলল, 'এ লোকটা কি সব অবস্থার জন্য তৈরী থাকে?'

রামন্না তৎক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি এখন সরলার ফটোর সামনে শপথ নেবার জন্যে এসেছি।'

কুমুদ একটু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি'?

রামন্না দোনামোনা করে বলল, 'তার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করবো।'

'হ্যাঁ!' কুমুদ উত্তেজিত হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'দিদির অদৃষ্টে তার ইচ্ছা আর পূর্ণ হল না।' সে নিজের মুখ নিচু করে ছিল।

দু মাসের ভিতর রামন্না আর কুমুদের বিয়ে হয়ে গেল। লোকে তাদের নিষ্ঠার প্রশংসা করে বলল যে কুমুদ তার বোনের কথা রেখেছে আর রামন্না তার স্ত্রীর ইচ্ছা পূর্ণ করেছে। কিন্তু এটা কেউ চায়নি যে স্বামী স্ত্রী সুখে দীর্ঘায়ু হোক, ছেলেমেয়ের ঘর ভরে উঠুক।

অনন্ত

এক

কাম অনাদি, তার অন্ত নেই।

প্রেম অনন্ত, তার আদি নেই।

কাম অনাদি-অনন্ত, প্রেম অনন্ত-অনাদি।

এই জন্য কামের অর্থ হচ্ছে প্রে······।

রামন্না নিজেকে সামলে নিল। কোন্ কথা? সে কি যেন ভাবছিল? মুখ তুলে সে সামনে তাকায়। জানলার বাইরে শহর, জনতা যা জীবনের এক অণু, সমাজের একটা প্রতীক, এতক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলেও কিছুই কেন দেখতে পায় নি? শূন্য মনে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকার সময় তার মন কাম প্রেম ইত্যাদি না জানি কি সব যেন ভাবছিল। অর্থাৎ সে শূন্যমনস্ক ছিল না। কথাটা ঠিক নয়. তার নিজের শূন্য মনে হলেও মন তার অজান্তেই তার চেয়ে বেশি জাগ্রত ছিল। তার মানে হচ্ছে যে সে আর তার মন আলাদা।

ম্লান হেসে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে রামন্না দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানলার দিক থেকে ঘুরে গেল।

কাম! প্রেম! সে, মন! এ সব লম্বা-চওড়া চিন্তার কি দরকার? এক ঘন্টা পরে তাকে একটা সভায় যেতে হবে। তাকে সসম্মানে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যোক্তা ভদ্রলোক নিজেই আসবেন। তাঁর প্রতীক্ষায় সে জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন এ সব বড় বড় চিন্তা তাকে ঘিরে ধরেছে। যাই হোক, মানুষকে কিছু না কিছু ভাবতেই হয়। না হলে মন স্মৃতি চারণ করতে বসে।

রামন্না হাতের ঘড়ি দেখল। এ ঘড়িটা ক'বছর হলো কেনা হয়েছে? হ্যাঁ, কুমুদের সঙ্গে বিয়ের সময় কেনা।

রামন্নার চিন্তায় বাধা পড়ল। কুমুদকেও সভায় যেতে হবে। সে কি তৈরী হয়েছে? দেখতে যাবার ইচ্ছে হলেও তার ভয় হল কুমুদ যদি তৈরী হয়ে বসে থাকে। যদি তৈরী না হয়ে থাকে তবে কি সভায় যেতে দেরি হয়ে যাবে না? কিংবা যদি কোন ছুতোয় সে সভায় যেতে না চায়? 'যদি না যায়' কথাটা মনে আসায় রামন্না নিজেকে ধিক্কার দিল। ছুতোটা কি হতে পারে? মোহন খেলা থেকে ফিরেছে কি না?

তার ছেলে মোহন ফিরে এসেছে কিনা দেখবার জন্য রামপ্পা আবার জানলার কাছে গেল।

মোহনের আর কী? সভা সমিতি নিয়ে তার কোন্ মাথাব্যথা? এই ভেবে রামপ্পা নিজেই বিরক্ত হল। এক ঘণ্টা আগে থেকেই সে তৈরী হয়ে বসে আছে। তা সত্বেও এই সভা, এই সম্মান, এই গৌরব, এই মানপত্র—এসব তার নিজের আর ভাল লাগে না। এমন দিন ছিল যখন বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণে সে উৎসাহ পেত। এককালে নিজের পয়সা খরচ করে নিজের লেখা ছাপাতে তার কোন দ্বিধা হত না। এমন সময়ও গিয়েছে যখন নিজের যুগান্তকারী রচনাগুলোর সমালোচক যাতে মন দিয়ে সেসব পড়ে সে বিষয়ে সে সচেষ্ট থাকত। যখন সভায় রামপ্পার পরিচয় দেওয়া হত তখন তার আনন্দ হত, যখন তাকে মালা পরানো হত তখন খুশিতে তার বুক ফুলে উঠত। সে সময় জনতার দৃষ্টি তার উপর ছিল না। এখন? 'হ্যাঁ, এখন তার অবস্থা সেইরকম, যখন দাঁত ছিল তখন ছোলা ছিল না আর ছোলা মিলল যখন তখন দাঁত নেই। 'কিংবা এই-ই কি জীবনের সার কথা? যখন যা চাই তখনই তা পেয়ে গেলে জীবন নীরস হয়ে পড়ে। তাই সম্ভবতঃ দুষ্মন্ত আর শকুন্তলার বিবাহিত জীবন উপযুক্ত সময় কেটে যাবার পর শুরু হয়ে থাকবে। আজকের সভায় সে কি এই কথাটা বলতে পারে না?

নানা চিন্তার পরিবর্তন করতে করতে রামপ্পা ধীরে গিয়ে চেয়ারে বসল। বস্তুতঃ ভাববার কথা এই যে সন্তানের জন্যই দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা পরস্পর মিলতে পেরেছিল। 'সন্তান হচ্ছে পতি-পত্নীর মিলনের গ্রন্থি'—এই বলে ভবভূতি নিজের নাটকে সন্তান এবং রাম সীতার বিচ্ছেদের ছবি এঁকেছেন। বাস্তবিক এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—ভাবতে ভাবতে রামপ্পা উঠে দাঁড়িয়ে দেখল যে মোহন ফিরেছে কি না। রামপ্পা ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে—আর মোহন তো ফিরতে দেরি করে না। আর হাসি খুশি উজ্জ্বল চোখে ছেলেকে ফিরতে দেখবার জন্য তার মন আকুল হয়ে উঠেছিল। মন দিয়ে দেখার ফলে কাউকে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হল। রামপ্পা জানত কার ছবি তার সামনে আসছে। মোহন তার ছেলে, কুমুদের গর্ভে জন্মানো তার পুত্র—তবু মোহনকে দেখলেই সরলার ছবি তার সামনে ভেসে ওঠে।

এ রহস্য জানবার পর রামপ্পার দশ বছর কেটে গেছে। সরলা তার প্রথম স্ত্রী কিন্তু তার স্বাস্থ্য মা হবার যোগ্য ছিল না। সে কুমুদকে বিয়ে করল। তার যে ছেলে জন্মাল তার চোখ দুটো ঠিক সরলার চোখের মত। পুরোণো কথা মনে পড়ে যাবার ভয়ে অনেক সময় রামপ্পা মোহনের দিকে তাকাতে ইতস্ততঃ করে।

দুই

সরলা বলেছিল, 'ঘরে ছেলেপেলে থাকলে ভাল লাগে।' রামন্না জানত যে ও এই প্রসঙ্গ কখনও ভুলতে পারে না।

সে এও বলেছিল, 'ঘরে ছেলেপিলে না থাকলে ঘর খালি খালি লাগে।'

রামন্না তার উত্তরে বলেছিল, 'সন্তানের জন্মের জন্য সুস্থ স্ত্রী চাই। তাইতো আমি স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিয়েছি।'

'আমার মতো শয্যাশায়ী স্ত্রী যার দিন আজ না হয় কাল ফুরোবে তাকে নিয়ে তুমি কি করবে?'

'আমার স্ত্রীর কেমন থাকা উচিত? সেটা দেখা আমার কাজ।'

'আমি তো শুধু নামেই স্ত্রী।'

'তুমি পাগল সরলা। দু চার দিন বিছানায় পড়ে থাকার জন্যে তুমি বুঝি ভেবেছ যে তুমি আর সারবে না?'

'মিথ্যে আশা রেখো না তুমি। তাই বলছিলাম যে আমার চোখ বোজার আগেই তুমি আর একটা বিয়ে করো। আমি ঘর, সন্তান আর সব রকম বৈভব দেখতে চাই।'

'ও হো! তুমি নিজের স্বামীকে এতই সুন্দর ভেবেছ যে যে-কোন মেয়ে তাকে পছন্দ করে নেবে। নাকি তোমাকে ফেলে রেখে মেয়ে খুঁজতে বের হবো?'

'কারুর পছন্দের দরকার নেই, কাউকে খুঁজতেও হবে না, আমার কুমুদ আছে।'

'বেচারী ঐ মেয়েটাকেই দন্ড দিতে হবে।'

'ছিঃ! বাজে কথা বলো না। সেও আঠারো বছরের হলো। তোমাকে আর তোমার সব বই সে কত যত্ন করে দেখে। জানো?'

'তাহলে তুমি বলছ যে আমি এই সুনামের সুযোগ নিই।' বলে রামন্না নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠেছিল। সরলা চলে গেছে, কুমুদকে সে বিয়ে করেছে, ছেলেও হয়েছে। কিন্তু তাকে দেখবার জন্য সরলা নেই……।

বসে বসেই রামন্না সামনের দেয়ালের দিকে তাকাল। সরলার ছবিটা নড়ছিল। সে সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে একেবারে সোজা হয়ে বসল যেন কোন কথা মনে পড়েছে।

সরলা বেঁচে আছে। নিজের ঘর সংসার দেখছে। তাই মোহনের চোখ একেবারে সরলার চোখের মতো। গৃহস্থালি দেখাশোনার জিদ ছিল বলেই সরলার চোখ দুটো তার দেহের সঙ্গে নষ্ট হয়নি; তারা বেঁচে থেকে নিজের জীবনকে দেখছে। আজ

তার যে সার্বজনিক সম্মান হচ্ছে, তার জন্য তার চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করবে—এই ভেবে রামন্নার ভয় হল, তার শরীর কেঁপে উঠল—ওই চোখ তার দশ বছরের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ দেখে থাকবে?

হুশ!—বলল রামন্না। বাইরে থেকে একটা পাখী উড়ে এসে সরলার ছবির উপর বসেছিল।

আবার হুশ!—সে রেগে বলল।

পাখী উড়ে গেল। রামন্নার মনের কাল্পনিক ছবিও উড়ে গেল। যেন কোন ফাঁদ এড়াতে পেরেছে এই ভাব নিয়ে রামন্না তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গেল, বাইরের হাওয়া পাবাব জন্য মুখ খুলল, যেন তার দম আটকাচ্ছিল। সে নিজের হাতের ঘড়ি দেখল।

সে ভাবল যে তাকে নিয়ে যাবার জন্য ওঁদের আসতে এখনও পঞ্চান্ন মিনিট বাকী।

তিন

নিজের ঘড়ি দেখে কুমুদ বলল, 'এখনো পঞ্চান্ন মিনিট বাকী, এক ঘন্টাই বলা উচিত।'

সে আবার ঘড়ি দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দশ বছর আগে এইভাবে ঘড়ি দেখে এই রকম কথাই সে বলেছিল। যাক গে, পুরোণো কথা ভেবে কি হবে? মোহনকে শিগগির ফিরতে বলেছিলাম। ছেলেটা এখনও কেন এল না? বলতে বলতে সে কাজ খুঁজতে লাগল। করবার মতো কোন কাজই বাকী ছিল না। যা ছিল তাই গোছাতে লাগল।

তার মনে পড়ল সেদিনও সে এইভাবে জিনিষ গোছাচ্ছিল।

দশ বছরই কেটেছে কিন্তু মনে হয় যে এক জন্মের চেয়েও বেশী সময় কেটে গেছে। তবু এমন মনে আছে যেন ঘটনাগুলো এখনই চোখের সামনে ঘটছে।

মোহনের প্রথম জন্মদিনের উৎসব ছিল। জন্মদিন ছিল ঠিকই কিন্তু উৎসবের দিন বলে মনে হচ্ছিল না। বিয়ের আগেই সে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল। এই ছেলের জন্যেই রামন্না তাকে বিয়ে করেছিল। ছেলে না হলে তার বিয়ে হত না, তাকে অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হত না, এখন এই ছেলের জন্যেই তার এই দুর্দশা। এক বছর বয়সের ছেলের জন্য মায়ের দুধের দরকার হয় না।

এ তো ওঁরই বাসনার ফল। ওঁকেই ভুগতে দেওয়া উচিত। এই ভেবে কাউকে না বলে ছেলেকে ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ খুঁজছিল। সন্ধ্যার সময় চলে যাওয়া চাই। সকাল থেকেই সে স্থির করেছিল। তখন রামন্না তার ঘরে এল। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে গেল, তার ভয় হল যে সে হয়তো নির্দিষ্ট কাজ করে উঠতে পারবে না। তার ভয় পাবার অন্য কারণও ছিল—রামন্না এলো কেন? তার পুরোণো কথা মনে পড়ল। রামন্না পুরুষ। এখন তো বিধিমত বিয়ে করেছে, তার স্বামী।

এখন শয্যাশায়ী স্ত্রীর জন্য ভয়ও নেই। সেই সাহসে নিজের অধিকার প্রয়োগ করতে এসেছে। এ কথা মনে হতেই সে ঘৃণাভরা চোখে রামন্নার দিকে তাকাল। তার মনে হল যে এ বাড়ীতে তার থাকার কারণ হচ্ছে ওর ছেলে। সে যে তার ছেলের মা এ কথাটা ভুলে গিয়ে তাকে শুধু ভোগের বস্তু মনে করেই কি রামন্না এখানে এসেছে।

'কুমুদ।'

এই নাও। এই সুরের সঙ্গে কি তার পরিচয় নেই? কতোবার এই ডাকে মোহিত হয়ে সে কি আপনভোলা হয়নি! সে জানে, ভালো করেই জানে এই ডাক কিসের সঙ্কেত।

কুমুদ, আজ মোহনের জন্মদিন।'

সে তারদিকে একদৃষ্টে হাঁ করে তাকাল। তখন সে ভাবল, হ্যাঁ আমিই পাগল! আমার জন্য ওঁর মাথাব্যথা নেই। উনি মোহনের জন্য এসেছেন। আমাকে এখন আর ওঁর দরকার নেই। ধোঁকা দিয়ে আমাকে বশ করে নেওয়া পর্যন্তই আমার সম্পর্ক ছিল। রাগ সামলাবার জন্য কুমুদ জিভ কামড়ে ধরল।

কিন্তু সে কি রাগ করেই এমনি করেছিল। এই প্রসঙ্গ মনে পড়ার পর সে একবার নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল। তার রাগ হল। এ কথাটা তার বারবার মনে পড়ত, কিন্তু একবার স্বপ্নে কথাটা মনে পড়তেই তার অন্যরকম মনে হয়েছিল। সে নিজের ইচ্ছেকে সামলাবার জন্যেই নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল।

কুমুদের অস্বস্তির কারণ ছিল এইটেই। সেদিন থেকেই সে জানতে পেরেছিল যে ভেবে-চিন্তে ভালো-মন্দ কারণগুলো জেনে রামন্নার সঙ্গে রাগ করে কথা বলবার সময়েও তার মন রামন্নার জন্য লালায়িত হয়।

'মোহনের জন্মদিন; তাই তোমার জন্যে এই হাত-ঘড়ি—' রামন্নার এই কথা শুনে কুমুদের তর্ক করবার শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেননা যখন সে তাকাল ততক্ষণে রামন্না তার হাতে ঘড়িটা বেঁধে দিয়েছে।

'এটা সেই ঘড়ি' বলে সে আবার দেখল। 'এখনও প্রায় এক ঘন্টা বাকী', বলে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আয়নার সামনে বসল। মুখ হাসি নিয়ে তার প্রতিবিম্বকে বলল সে কেমন নির্লজ্জ স্ত্রী। আর এক ঘন্টা পরে তাকে রামন্নার সঙ্গে সভায় যেতে

হবে। সেইজন্যেই সে এমন সাজগোজ করেছে আর তাই সে মোহনকে শীঘ্র ফিরতে বলেছিল। কিন্তু ছেলেটা এল না কেন, ভেবে সে বাইরের দরজার দিকে তাকাল। বাইরে মোহনের নামগন্ধও নেই। একটা পাখী পর্যন্ত নেই। ভিতরেও কারুর চিহ্ন নেই, বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজা বন্ধ করে আয়নার সামনে বসে পড়ল।

আজ সে রামন্নার সঙ্গে তার শ্রীমতী হয়ে যাবে।

সেদিন সে রামন্নাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল মতিভ্রষ্ট হয়েছিল বলে।

যে মুহূর্তে রামন্না তাকে হাতঘড়ি দিল, তখন থেকেই নিজের উপর তার বিশ্বাস রইল না। এ সত্ত্বেও রামন্না ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই যখন সে ঘুমন্ত শিশুকে নিজের বুকে চেপে ধরল, তখন তার মনে হল যে রামন্নার প্রতি তার ভালবাসা এখনও বর্তমান। সে যেন কেঁপে উঠেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় রামন্না আবার সেই ঘরে এসেছিল। সে কাউকে দেখতে যাবে। তখন সে হেসে বলেছিল, আমি এক ঘন্টার মধ্যেই ফিরব। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তো বোলো পঞ্চান্ন মিনিটের মধ্যেই ফিরবে।'

রামন্না বেরিয়ে যেতেই সে নিজের ঘড়ি দেখে বলল, এখনো পঞ্চান্ন মিনিট আছে। তার ঘর ছেড়ে সরে পড়ার জন্যে।'

এই সব চিন্তা কোথায় থেকে কোথায় পেঁছে গেল ; এ সব স্মৃতি ঝেড়ে ফেলার জন্যে সে মাথা নাড়ল।

মোহন এল কিনা দেখবার জন্য সে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে দেখলো। হতাশায় রাগে সে দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করতে লাগল।

চার

দরজার আওয়াজ শুনে রামন্না চট করে উঠে দাঁড়াল।

'কেউ এল মনে হচ্ছে', বলে সে জানালার কাছে গিয়ে দেখল কেউ নেই।

'দরজার শব্দ হয়েছিল।' আনমনে ঘরে গিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। টেবিলে রাখা পেনসিলটা হাতে নিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল। হাসতে হাসতে চেয়ারে বসে বলল, 'মনের রীতি বিচিত্র। দরজার আওয়াজ শুনে মনে হল যে কেউ এসেছে। পাগলামি নয় কি ? দরজার শব্দ হলে কেউ যেতেও তো পারে। কিন্তু দরজার শব্দ হলেই মনে হয় যে কেউ ভিতরে এল।'

রামপ্পা আবার জানলার কাছে গেল। ভয়ে ভয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ভালো করে দেখল। শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়ল।

সে নিজের মনেই আবার বলল, 'কেউ হয়তো গেল এমন অলক্ষ্ণে কথা আমার মুখ থেকে বের হল কেন? যদি সত্যিই কেউ চলে গিয়ে থাকে?

রামপ্পার গায়ে কাঁটা দিল। চিন্তাটা দূর করতে না পেরে সে চোখ বুজল। চোখের সামনে যে দৃশ্য ফুটে উঠল তাতে ভয় পেয়ে চোখ খুলেই আবার বন্ধ করল।

'সেদিনের কথা যেন ভগবান কাউকে না মনে পড়িয়ে দেন। চির শত্রুরও যেন না মনে পড়ে।'

সেদিন এক স্বাগত সভার আয়োজন ছিল। সেইই শুধু জানত, কুমুদকে বলেনি। তাকে হঠাৎ জানিয়ে খুশি করার ইচ্ছা ছিল। সেদিন ছিল মোহনের জন্মদিন। সেটা সত্যিই ছেলের জন্মদিন নয়, ছিল প্রথম বিবাহবার্ষিকী। সংসারে মোহনের আগমন বিয়ের আগেই হয়েছিল বলে তার জন্মদিন কয়েকমাস এগিয়ে দেবার ব্যাপারে দুজনেই একমত হয়েছিল। আগের দিন সে কুমুদের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছিল। তখন কুমুদ বলেছিল, 'আমার বিয়েটা এমনভাবে হয়েছে যেন পুরণো বাড়ীতে কলি ফিরিয়ে নতুনের মত দেখানো হচ্ছে।' বাপ রে! কী কড়া কথাই না বলেছিল। তবু পরের দিন সে একটা ঘড়ি কিনে এনেছিল। সেদিন তার কাছে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল।

তার মনে হল যে সে তার আগের কুমুদই। কুমুদ যেদিন থেকে মা হয়েছে তখন থেকেই সে তাকে দেখে আসছে, কিন্তু কোন পরিবর্তন তার চোখে পড়েনি। এক বছর আগেই ছিল এক মুগ্ধা প্রেমিকা। তাকে দেখে লজ্জা পেত, ছুঁলে লজ্জা পেত। তার প্রত্যাশাভরা চোখে ভয়ের ছায়া পড়ত। কিন্তু এখন তার বুক মাতৃত্বে পূর্ণ। সন্তানের জন্য তার মুখে প্রশান্তি ফুটে উঠেছে। কোলে সন্তান তার দেহে এক নতুন শান্তি আর সৌন্দর্য সঞ্চারিত হয়েছে। রামপ্পা সংকোচ বোধ করল। যে কাজে সে এসেছিল তা ভুলে গিয়ে 'কুমুদ' বলে ফেলেছিল। কথাটা মুখ থেকে বের হতেই তার যেন হুঁশ হল।

তার ডাকবার ভঙ্গী দেখে কুমুদের অবস্থা হলো আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত অথচ বাঁধা হরিণীর মতো। নিজের ডাকের মানে সে নিজেও বুঝতে পারল। এটা ছিল পুরুষ হৃদয়ের আহ্বান। প্রকৃতির রাজ্যে স্ত্রীকে আকর্ষণ করবার জন্য এটা পুরুষের সর্বশক্তিশালী স্বর। এটা ছিল মদমত্ত পুরুষের স্ত্রী বশ করবার সামর্থসূচক আহ্বান। তা শুনেই যেন কুমুদ থমকে দাঁড়াল।

সে সময় রামপ্পার কান্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল। কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের বোধ ফিরে এল। সে সুশিক্ষিত। এটুকু ছাড়া প্রকৃতির রাজ্যে সেও তো অন্য প্রাণীদের

মতো। মানুষও তো পশুই। স্ত্রীকে শুধু স্ত্রী রূপে দেখাই হচ্ছে অরণ্য জীবন। স্ত্রী পুরুষের কোন পার্থক্য নেই, দুজনেই সমান, এটা মেনে নেওয়া সংস্কৃতির লক্ষণ। রামন্নার এ জ্ঞান ছিল; তাই কুমুদকে দেখেই যে বিকার উৎপন্ন হয়েছিল তার জন্য লজ্জা পেল। 'কুমুদ, আজ মোহনের জন্মদিন' বলে কথা পালটে দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত তার হাত ধরে সে ঘড়িটা বেঁধেও দিয়েছিল। তখন এক ক্ষণ নয়, এক যুগ নয়, ক্ষণ আর যুগও নয়, কাল যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। কুমুদের হাত ধরে থাকার সময় রামন্নার এই রকমই মনে হয়েছিল।

তাই হয়তো সে আনমনে এক বন্ধুর বাড়ী চলে গিয়েছিল।

'আজ কি পথ ভুলে না কি?' তার বন্ধুর কথা শুনে সে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে তার বন্ধু হাসলে সেও নিজেকে সামলে নিয়ে হেসেছিল ঠিকই সেইসঙ্গে ভেবেছিল বন্ধুর বাড়ীতে এলাম কেন? সেখানে যাওয়ার আগে কথাটা মনেই হয়নি। আবার বন্ধু যখন জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? এমন অসময়ে যে?' তখন সে না ভেবেই উত্তর দিয়েছিল, 'একটা দারুণ কাজ আছে, রহস্যের ব্যাপার।'

'রামন্না দারুণ, ব্যাপারটা কী? মুখ দেখে তো বেশ খুশি মনে হচ্ছে। তবুও রহস্য বলছ। হ্যাঁ হে, আবার কোন নতুন লীলা ধরেছো নাকি?'

'তুমি থামো তো।'

'বোকো না। তোমরা সাহিত্যিক। তোমাদের বিশ্বাস হয় না। সাহিত্য হচ্ছে জীবনের প্রতিবিম্ব। সেটা দেখাবার জন্যে প্রেমের গল্প লেখার আগে নিজেই সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কোন দ্বিধা কর না। তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কোনও নতুন লীলা—? এঁ্যা? হাঃ হাঃ।'

রামন্নার মনে হয়েছিল যে ঐ দাঁত-বের-করা বন্ধুর দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। কিন্তু সুসভ্য সমাজে তা করা যাবে না। রামন্না জানত যে তার আর কুমুদের বিয়ে নিয়ে লোকে ঠাট্টা তামাসা করে। এ বিষয়ে কিছু বলাও যায় না। বন্ধুর কথার একটাই উত্তর ছিল। মেকী হাসি। সে তাই হেসে বলেছিল—

'সাহিত্যিক মানে তুমি কি ভেবেছ যে সে বিনা লাইসেন্সে শ্রীকৃষ্ণ।'

'আমি কি করে জানব রামন্না? যখন মরিনি তখন স্বর্গও দেখিনি। বইও লিখিনি, বদনামও হয়নি।'

'তাহলে তুমি বলছো যে বই লিখলে বদনাম হয়?'

'আমি কেন বলবো? তুমিও তো দেখছো রামন্না। যদি বই ভাল হয়, তো বলবে এর চেয়ে ভালো লেখা যেত। বই খারাপ হলে বলবে এর চেয়ে তো রদ্দি মালের কারবার করা ভালো। বই যদি বুঝতে না পারে তো খারাপ বলে। খারাপ বই যদি সকলে বুঝতে পারে তবে তাকে বাজে বই বলে। সার

কথা এই যে বই লিখে লেখকেরও সুখ নেই, পাঠকেরও সুখ নেই। তুমি কি বল?'

'তোমার মতে তবে যে লেখে, একমাত্র সেই সুখ পায়। তাই না?' বলে সেও বন্ধুর মতো হাসিতে ফেটে পড়েছিল।

'যাক গে। কি সেই রহস্য?' সে হাসিমুখে বলেছিল।

সেদিন বন্ধুর প্রশ্নের যে উত্তর রামন্না দিয়েছিল সে কথা মনে পড়লে আজও তার আশ্চর্য লাগে। কেমন করে মিথ্যাটা সে বলেছিল? কেমন স্বাভাবিক ভাবে বলেছিল? সেদিন সে জেনেশুনেই ঠকিয়েছিল। সেটা যদি কেউ জানতে পারে কিংবা সে নিজেই যদি কাউকে বলে দেয় তবে কি সমাজ তাকে সম্মানের চোখে দেখবে? কে জানে? সম্মান করতেও পারে। তার মতো ঠগের দলই তো সমাজ। আজ যে তারা তাকে সম্মান করছে, সে নিজেও একটা ঠগ ছাড়া আর কি? কিন্তু তার সেদিনের উত্তরে সে বাস্তবিকই ঠকিয়েছিল। সে কি জেনেশুনেই ঐ ভাবে বলেছিল? 'কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলাম না?' বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল।

'আজ দু'বছর হলো সরলা চলে গেছে।'

'হ্যাঁ···আরে ভাই, পুরোণো কথা মনে করে···'

'ছিঃ। তুমি ভেবো না যে আমার দুঃখ হচ্ছে। সরলা হাজারবার আমাকে বলেছিল, আমি চলে গেলে তুমি মন খারাপ করো না। তুমি সুখেই থেকো, ঘরে ছেলেপিলে হোক, আমি সব সময় দেখতে থাকবো। এই বিয়েও শুধু সরলার সন্তুষ্টির জন্যে। বলা উচিত যে সে-ই এটা ঠিক করে গিয়েছিল। তাই সময়টাও সেই কথার জন্যে ঠিক করেছি। তবুও সে···।'

'রামন্না, হাজার জন্মে একবারই এরকম স্ত্রী মেলে। তাও ভাগ্যে থাকা চাই। সে তোমার বিয়ে দেখতে পেল না ভেবে দুঃখ করা ভুল। সে বলেছিল যেখানেই থাকি দেখতে থাকবো।'

'তবু মনের তো সান্ত্বনা দরকার। তাই বছরে একদিন তার স্মরণে কিছু করি। জানিনা কি করে এটা আর মোহনের জন্মদিন একসঙ্গে পড়ে গেছে। আজকের দিনে আমার সংসারের এই সুখময় পরিবেশ সরলা দেখুক। আমার মনে হয় সে নিশ্চয় দেখতে পায়। এইজন্যেই আজ ছেলের জন্যে একটা সোনার চেনহার আর কুমুদের জন্যে একটা ভাল শাড়ী।'

'হাঁ, হাঁ, ওগো শুনছো?'

'এই! দয়া করে চেঁচিয়ো না। এই জন্যেই তো রহস্যের কথা বলেছিলাম। রহস্য হলেও মুখ্য সহায়িকা বৌদিকেই হতে হবে।'

'তা এতে রহস্যটা কোথায়?'

'রহস্য সন্ধ্যা পর্যন্তই, বুঝলে? সন্ধ্যাবেলায় বৌদিকে নিয়ে বেড়াতে বের হবে। যেন পথ ভুলে চলে এসেছো এই ভাব দেখিয়ে মার্কেটে যাবে। সেখানে পেঁছে বৌদিকে সব বলবে। জিনিষ দুটো বৌদিই পছন্দ করবে। তোমাদের ঘরে ফিরতে ফিরতে আমিও পেঁাছে যাব আর এখান থেকে জিনিষ দুটো নিয়ে যাবো।'

'তার মানে হচ্ছে যে মার্কেট থেকে আমাদের তোমার বাড়ী যেতে হবে। ভাল কথা রামন্না। আমরা তোমার বাড়ী যাচ্ছি। বেশ খাতির যত্ন কোরো, ভালো ভালো জিনিষ খাইয়ো, পরে তুমি উপহার দিয়ো—'

'আজ নয়, আজ যদি তোমরা থাকো তাহলে…'

'আমরা থাকলে তোমার অস্বস্তি! তুমি এতো প্রতীক্ষা করেছ, তুমি হচ্ছ সাহিত্যিক। উপহার দিয়ে যদি তুমি নিজের গিন্নীকে চুমুও খাও, তাতে আমাদের তরফ থেকে কোন বাধা পাবে না। হঁ্যা? হাঃ-হাঃ।'

'না, না, এমন কিছু ব্যাপার নয়। তাহলেও আজ ওটা থাক। আমি এখন চললাম। টাকা এখানে রেখে দিলাম।'

'বুদ্ধি লোপ পেলেই না লোকে সাহিত্যিক হয়ে যায়…'

না জানি আরো কত কি সে বিড়বিড় করে বলেছিল। রামন্না সেখান থেকে সরে পড়েছিল। বাইরে বেরিয়ে রামন্নার অবস্থা হয়েছিল নতুন ডানা গজানো পাখীর মতো। দিনটা বাইরে ঘুরে ফিরে কাটিয়ে শেষে বন্ধুর আনা জিনিষ-গুলো নিয়ে সন্ধ্যায় পাখীর মতো ঘরে ফিরে এসেছিল।

ঘরে কুমুদও ছিল না, মোহনও ছিল না।

রামন্না চট করে চেয়ার থেকে উঠল। ক্ষণেকের জন্য সে ভুলে গেল যে সে দশ বছর আগের স্মৃতি প্রবাহে ভেসে চলেছে। হাতে যেন শাড়ী আর হারটা ধরা আছে এই ভাবে হাত উঁচু করে সে জানলার দিকে গেল। তখন তার হুঁশ হলো।

'আমি পাগল হয়ে যাবো না তো?' বলে সে হাত নিচু করল। হাতে শাড়ী না থাকলেও সে এমনভাবে হাত নিচু করল যেন শাড়ীটা মাটিতে পড়লে ময়লা হয়ে যাবে। তখন 'পাগল হতেই চলেছি' বলে নিজের মাথা নাড়ল।

সেদিন সেই শাড়ীর ব্যাপারের কথা মনে পড়ায় রামন্নার হঠাৎ হাসি পেল।

হ্যাঁ—তার মনে হল যে আজকের সভা শীঘ্র শুরু হলে ভাল হয়। না হলে সে নিশ্চয় পাগল হয়ে যাবে।

মুখ তো প্রসঙ্গ বদলাতে চাইছে—কিন্তু মন মানল না। মন স্মৃতির পিছনে ছুটেছে। স্মৃতি-চিত্র সামনে দাঁড়ালে সে আর একবার জোরে হেসে উঠল। সেদিন সেই শাড়ী নিয়ে—যা পরে ঘটেছিল সেটা মনে পড়ার জন্য।

পাঁচ

কুমুদের রাগটা শাড়ীর উপর গিয়ে পড়ল। মোহন এখনও ফিরল না দেখে বিরক্ত হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করবার সময় তার আঁচল খসে পড়ায় তার যৌবনের যে সৌন্দর্য ফুটে উঠল তাতে সে আরো বিরক্ত হয়ে উঠল। নিজের পুরো চেহারা আয়নায় দেখল। পরা শাড়ীটায় তাকে আরো মানিয়েছে দেখে সে শাড়ীটার উপর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল।

'হতচ্ছাড়া শাড়ীটা সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত স্মৃতি দিয়ে বোনা', বলে সে আয়নার দিকে পিছন ফিরে বসল। অভ্যাস বশেই শাড়ীটা ঠিক করে নিল। তার হঠাৎ মনে হল যে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দশ বছর আগেকার কথা। সকালে রামন্না ঘড়ি দিয়েছিল, না—হাতে বেঁধে দিয়েছিল। তখন ক্ষণিকের জন্যে তার হাত ধরবার ইচ্ছে হয়েছিল। পুরোণো সব কথা ভুলে একবার জীবনে শেষবারের মতো এমন আলিঙ্গন করার ইচ্ছে হল যেন দু দেহ এক হয়ে যায়। এই সময় রামন্না তার হাত ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে গেল। সে প্রেমের আবেশে ঘুমন্ত মোহনকে তালগোল পাকিয়ে জোর করে বুকে চেপে ধরল। তারপর তার হুঁশ হল। সে যদি এর পরেও এ বাড়ীতে থাকে তবে সে নিশ্চয় রামন্নার বশে চলে যাবে। এ অপমান সহ্য করা যাবে না। ওখান থেকে চলে যাওয়াই সে ঠিক করল। তার শরীরে তখন গরম লোহার মতো আগুণ জ্বলছিল। কোন জিনিষে হাত ঠেকলেই সে কেঁপে উঠছিল। তার মনে হল, এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত, চলে যাওয়াই ঠিক। দশ বছর পরেও একথা সে ভুলতে পারে নি। একদিকে অগাধ প্রেম, অন্যদিকে তেমনি অগাধ ঘৃণা, কেন? কখনো কখনো মনে হয় যে রামন্নার কোন দোষ নেই, সব দোষ তারই। এ সময়ে সরলার কথা মনে পড়লে কুমুদের মনে হত যে তার ব্যবহার দিদির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

সরলাদিদি তো কতবার বলেছিল। কখনও কখনও রামন্নার ঘরে ফিরতে দেরী হলে সে দিদিকে জিজ্ঞাসা করে বসত—

'ওঁর ঘরে ফিরতে এত দেরী কেন হয় দিদি?'

'দেরী কোথায়? ওর ফেরার সময়ই তো এই।'

'না সরলাদিদি, তুমি ঘরে একলা থাকো—'

'তাতে কি? আমার নিজের কাজ থাকে—'

'না দিদি, তুমি অসুখেও তো পড়ে থাকো?'

'আরে! কেমন মেয়ে তুই? পরে যখন বিয়ে হবে তখন বুঝতে পারবি। পুরুষের কাজ তো বাইরেই থাকে।'

'স্ত্রীর অসুখ হলেও ?'

'দ্যাখ্ কুমুদ, এটা পুরুষদের স্বভাব। তাদের কাজ থাকে বাইরে। ঘরের বাইরে ঘুরতে হয়। মেয়েদের কথা আলাদা। সে আছে, তার ঘর আছে, তার সন্তান আছে। মেয়েরা নিজেদের কাজ ছেড়ে কি করে থাকবে ?'

সরলাদিদির এমন সরল স্বভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করত। রামন্নার সরলাদিদির দিকে নজর নেই দেখেও দিদির মনে কোন অসন্তোষ নেই।

'পুরুষদের স্বভাবই এই। চারজনে আড্ডা মারে তো ক্ষতিটা কি ? তা তুই তো ওর কথা বলছিস্। বেচারী! কমই তো বাইরে যায়। পড়তে লিখতেই ব্যস্ত থাকে। একঘেয়ে লাগলে পরে একটু বাইরে ঘুরে আসে।' সরলা বেশ গর্বের সঙ্গে রামন্নাকে সমর্থন করেছিল।

'বাইরে যাবার কথা ছেড়ে দে। যখন ও ঘরেও থাকে তখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর খেয়াল থাকে না যে আমি বাড়ীতে আছি কি না। কাজে এমন মেতে থাকে।' বলতে বলতে সরলার পাণ্ডুর গালে রক্তিমা ফুটে উঠেছিল।

যখন কুমুদ নিজেই একবার উপেক্ষাভরে বলেছিল, 'এমন লোকদের স্ত্রী থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি ?'

'আরে পাগলী! এমনিতে নিজের কথা নিজের মুখে বলা উচিত নয়। ঘরে যদি না থাকি তো ওর এক মুহূর্তের জন্য শান্তি নেই। একবার আমি একমাসের জন্য বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম। তখন সবে নতুন বিয়ে হয়েছে। তাই মহারাজ সারা মাসে একটি অক্ষরও লেখেন নি।' সরলাদিদি এই কথাটা কত আনন্দেই না বলেছিল।

'এমন সুখের সংসার থেকে সিঁথির সিঁদুর বজায় রেখেই যেন চলে যেতে পারি এইটাই আমার কামনা,' দিদির এই কথায় সে আর কান্না সামলাতে পারে নি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।

এখনও তো সেই রামন্নাই আছে। রামন্নার সব কিছুই কি সে আগে থেকে জানতো না ? সব জেনে শুনেই কি আমি তাকে ভালবাসিনি ?

তাতে কি হল ? সেই রামন্না তার হলো না। তার সে হয়নি এ কথাটা কুমুদের মনে গেঁথে গিয়েছিল। সে রামন্নাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু রামন্না শুধু তার দেহটাকে ভালবেসেছিল। স্ত্রী শয্যাশায়ী বলে অথবা সে একটা নতুন জিনিষ বলে কিংবা পুরুষত্বের অহঙ্কারের জন্য রামন্না তাকে চেয়েছিল। তার বিশ্বাস যে বিয়ের আগেই মা হবার জন্য সমাজ তাকে ঘৃণা করবে, তাই দয়া করে কিংবা উপকার করবার ইচ্ছায় রামন্না তাকে বিয়ে করেছিল।

আমি তার ভালবাসা চেয়েছিলাম। ইচ্ছে হলে সমাজ তাকে ত্যাগ করবে, কিন্তু প্রেমের জন্যে সে সুখ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সে তাকে ভাল না বেসে প্রেমহীন বিয়ের বাঁধনে আটকে দিল।

কুমুদের মনে হয়েছিল যে সেদিনই তার প্রেমলীলা শেষ হয়ে গেল। বিয়ের একমাসের মধ্যেই কুমুদ পিসীর বাড়ী চলে গিয়েছিল। বিয়ে হয়ে গেছে, সমাজের ভয় আর নেই জেনেও তার তৃপ্তি হল না। প্রেম ছাড়াই তার পেটে যে জীবটা এসেছে তাকেও সে ঘৃণা করতে লাগল। আপন না হলেও পিসী ছিল দূর সম্পর্কের এক বুড়ী। তার কাছে দু এক মাস কাটাবার ইচ্ছা ছিল। সেটাও তখন অসহ্য লাগছিল।

পরদিন সকালেই সেই বুড়ী বলেছিল, 'কি সুন্দর দেখাচ্ছে? পোয়াতি নাকি? বিয়ে হয়ে গেল, একটা খবর পর্যন্ত দিলি না। ডাকলিও না। ভেবেছিলি যে লুচি পুরি খাবার মতো দাঁত বুড়ীর নেই। তাই না?'

শুনে কুমুদ ভেবেছিল যে দু একদিনের মধ্যেই ওখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।

তবু—

কুমুদের আজও মনে পড়লে হাসি পায় যে বুড়ীর কাছে থাকার সময় তার জীবনের প্রতি আকর্ষণ ছিল। আজও মনে পড়লে বুঝতে পারে যে সে দিনগুলো কত সুখেই না কেটেছিল।

'বেশী বয়সে বিয়ে করা—এক আধ মাসের মধ্যেই পোয়াতি হওয়া—আজকালকার মেয়েদের বিয়ের সুখ শেষ হল বুঝে নাও।' এক দিন বুড়ী কথাপ্রসঙ্গে এই কথাই বলেছিল।

তখন সে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'পিসী, বিয়ে কাকে বলে এটা জানবার বয়স হবার পরই আজকাল বিয়ে হয়।'

'তোরা কি আর জানিস, তোদের বিয়ের মানে তো ঐ একটাই।'

'ঐ একটা কী পিসী?'

'পেটে যা ধরেছিস, ঐটেই।' বুড়ী জোর দিয়ে কথাটা বলেছিল।

'এটা বাদ দিলে বিয়েতে আর কী বা আছে?'

'আজকালকার মেয়েরা এইরকম ভাবে বলেই দুঃখ পায় কুমুদ। এ ছাড়া তাদের আর কী আছে? পুরুষেও যদি এমনি বলে তবে তোদের অবস্থা কেমন হবে?'

আমার তো মনে হয় পিসী পুরুষদের কাছে এটাই আসল। মেয়েদের বরং ছেলে মানুষ করাও একটা কাজ থাকে।'

এ কথায় বুড়ী ফোকলা মুখে প্রাণ খুলে হেসেছিল। 'পুরুষের জন্য এটাই প্রধান? আরে পাগলী! পুরুষের যদি এটাই প্রধান হতো তো তারা বিয়েই করত না। ঘরের খাওয়ার চেয়ে হোটেলের খাওয়াই ওদের ভাল লাগে। তোকে বিয়ে করে তোর ছেলেমেয়ের রোগ-ঝঞ্ঝাট ভুগে, তোর বুড়ী হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিজের জীবন কাটাতে পুরুষ আরো কিছু চায়।'

এ কথায় কুমুদ অবাক হয়ে গেল। ঐ অশিক্ষিত বুড়ীর বুদ্ধিমত্তায় সে আশ্চর্য হল। এই সময়ে বুড়ীকে ফোঁপাতে দেখে সে দিশেহারা হয়ে গেল।

'কি হলো পিসী? তুমি কেঁদে ফেললে কেন?'

'কাঁদছি না রে বেটী। পুরোণো সুখের দিনের কথা মনে করে খুশি সামলাতে পারছি না।'

বুড়ীরও তবে সুখের দিন ছিল! কথাটা কুমুদের কাছে নতুন। প্রথম থেকেই তাকে বিধবার বেশে দেখে আসছে বলে তার এমন মনে হয়েছিল।

ঐ কথা শুনে কুমুদের হাসি পেল।

'কী, হাসছিস কেন, কুমদী?'

'কিছু না পিসী! তুমি সুখের দিন বললে না? তাই ভাবছি।'

'তা তুই কি ভেবেছিলি যে আমার বিয়েই হয়নি? আমি সুখের মুখ দেখি নি?' হয়তো বুড়ী কুমুদের মনের কথা বুঝেছিল। তাই সে আরো বলল, 'তুই ভেবেছিস আমি জন্ম থেকেই এমনি হয়ে আছি।'

'আমার মনে হল যে সুখের দিনের কথা মনে পড়ায় তোমার হয়তো খারাপ লাগছে।'

'খারাপ লেগেছে, আরে পাগলী! সুখের কথা মনে পড়লে সন্তোষ হয়। না হলে এতদিন কেন বেঁচে থাকব? কোন কুঁয়ো কিংবা পুকুরে সুখে ডুবে মরতাম। শুধু পুরোণো সুখের স্মৃতি নিয়েই তো এখনও বেঁচে আছি।'

'এমন কি সুখ পেয়েছিল পিসী?

'তা বোঝার বয়স তোর এখনও হয়নি। বুঝতে পারবি না।'

ও, বাবা! পিসী কথা ঘুরিও না। আজকের মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়।'

'কি বড়ই না হয়ে যায়! ও কাজের জন্য ছোট দিনও বড় হয়ে যায়।'

কুমুদ আহতস্বরে বলল 'তোমার মগজে কি অন্য কোন চিন্তা নেই পিসী?'

'আমি তোর কথা বলছি না কুমুদ। আজকালকার মেয়েদের কথা বলছি। আমাদের কালে আট দশ বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত। পুজো-পার্বণ, বিয়ে টিয়ে, বার-ব্রত, আনা নেওয়া এই ভাবেই এক-দু বছর আনন্দে কেটে যেত। তখন থেকে বড় মেয়েদের সঙ্গে চলাফেরা করতাম, তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় বুদ্ধি পাকত।

'ও সব কথা ছাড়ো পিসী, তোমার সুখের স্মৃতির কথাটা বলো।'

'তাও বলছি। এ সব যদি না বলি তবে এটাও বুঝতে পারবে না। এই সব করে বয়স হবার সঙ্গে আমরা সমস্ত বুঝতে পারতাম। পুরুষেরা কেমন হয়, তাদের স্বভাব কেমন হয়? আমার উনি কেমন, উনি কার কার সঙ্গে থাকেন, খুটিনাটি

সব। এই জন্যেই ও'র চালচলন দেখে আমার কোনদিন রাগ হয়নি। আমি অবাকও হইনি।'

'কেন পিসী? তোমার ওনার চালচলন কি ভাল ছিল না?'

'ভালোই বা কী আর মন্দই বা কী? অন্যেরা যেমন হয় উনিও তেমনি ছিলেন।'

'মানে—মানে বাইরে কোথাও কিছু ·····? তবু তুমি বলছ যে ও'র উপর তোমার রাগ ছিল না।'

কী যে বলছিস? ছোট ছেলে যদি নোংরা জিনিষে হাত দেয় তবে কি তার উপর রাগ করবো? নোংরামির জ্ঞানই তার নেই। তার কাছে এক নতুন জিনিষ, একটা ফূর্তির উপকরণ।'

'এটা কেমন ফূর্তি পিসী? ঘরের লোক এখানে পড়ে কাঁদছে।'

'কাঁদতে আমার কি দায় পড়েছে? তিনি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতেন? আমাকে কি মারধোর করতেন?'

'কিন্তু তোমায় ছেড়ে আর এক······?'

'না পিসী, তোমাকে ত্যাগ করার কথা বলিনি। তুমি ঘরে থাকতে তিনি রোজ সেখানে······?'

'রোজ! এই জন্যেই তো বলছি যে আজকালকার মেয়েদের কাছে বিয়ের মানে শুধু ঐ একটাই। আমার সঙ্গে সংসার করতে লাগলেন, বাস্ আর কি? তাঁর রোজকার কি কাজ? অবসর সময়ে কি করেন? তাতে আমার কি দরকার। আমারও তো অনেক কাজ থাকত। বাড়ী ভর্তি লোক—শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেওর, ভাসুর, আউন্তি যাউন্তি ননদেরা; আমি কি পাগল যে এসব ছেড়ে ও'র সঙ্গে রাসলীলায় মাতব?

'তা হলে তোমার মতে এই হচ্ছে তোমার সুখের দিনের স্মৃতি ?'

'না তো কি সুখের দিন অন্য রকমের হয়?'

'এতে আর সুখের দিন কোথায়?'

'এতেই বলছি না, আরো শুনলে বুঝবে।'

'বলার মতো হয় তো বল পিসী।'

'হুঁ —এতক্ষণ তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বলছিলি। এখন বলছিস বলার মতো হয় তো বল। বেশ চালাক। মুখে জল ঢেলে দিলে মুখের গ্রাসটা না গিলে আর উপায় কি? বলছি, শোন্। একদিন সারা কাজকর্ম সেরে রাতে নিজের ঘরে এসে শোবার জোগাড় করছি।'

'একলা!'

'তা তুই কি ভাবছিস, আমি ভীতু ছিলাম?'

'না তো ; তোমার উনি ?'

'আমার উনি খেয়ে বেরিয়েছিলেন। ভাল করেও খান নি। আমি এই ভেবে চুপ করে রইলাম যে হয়ত কিছু হয়েছে ; রাতে যদি আসেন তো জিজ্ঞাসা করব।'

'তার মানে রাতে ওঁর ফেরবার ভরসা ছিল ?

'ও মেয়ে, বিনা ভরসায় দুনিয়ায় সুখ কোথায় ? আগের দু তিন রাত তিনি ঘরেই আসেন নি। ভেবেছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে তাস-টাস খেলছেন হয়তো।'

'তবুও সুখ ভাগ করে নেবার সখ ছিল তোমার ?'

'কি বললি ?'

বুড়ী হয়তো কথাটার মানে বুঝতে পারেনি বলে হকচাকিয়ে গিয়েছিল। তাই আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি বলছিলাম ?'

তোমার উনি দু তিন রাত ঘরে ফেরেননি আর সেদিন তুমি শোবার জোগাড় করছিলে।'

'হুঁ ! এই সময় বাইরে থেকে দরজার শব্দ হল। আমার তো আশ্চর্য লাগল। উনি তো এত শীঘ্র কোনদিন ফেরেন না। ভাল করে খান নি, রেগে আছেন না কি ? কী হতে পারে ? এই সব ভাবছি, এমন সময় তিনি ঘরে ঢুকলেন। এসেই কামিজ খুলে টাঙিয়ে দিলেন। উস্‌স্‌……বলতে বলতে 'ছোটী' বললেন।'

'কী বললেন ?'

'ছোটী' বললেন। বিয়ের সময় আমাকে খুব ছোট দেখাত বলে আমাকে ছোটী বলেই ডাকতেন। পরে ঘর সংসার শুরু করার পর একবার আমাকে দেখে বললেন, 'আরে, তুমি তো দেখছি আকাশের তারার মতো, বিয়ের সময় দূর থেকে দেখেছিলাম। দেখতে এতটুকু ছিলে। এখন পাশে দেখছি তো……। আমি অবশ্য অতো ছোট ছিলাম না কিন্তু তিনি সব সময় আমায় ছোটী বলেই ডাকতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ ভাল করে খাননি কেন ?' তখন বলেছিলেন, 'জানিনা ছোটী, কেন মাথাব্যথা করছে। আমি বললাম অমৃতাঞ্জন আনবো ? তিনি বললেন, অমৃতাঞ্জনকে আসতে দাও।'

'কি বললেন ?'

'অমৃতাঞ্জনকে আসতে দাও। তাঁর কথার ধরণই এইরকম ছিল। পরে তিনি, কোন ওষুধের দরকার নেই ছোটী, তুমি কাছে এসো, বলে আমাকে ওখানে বসিয়ে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বুঝলাম যে তাঁর ঘুম এসেছে। কুমুদ, পুরুষ হচ্ছে খেলায় মত্ত ছেলের মতো। তখন আমি বুঝতে পারলাম, বাইরে তারা যতই খেলে বেড়াক, কিন্তু বিশ্রাম আর সন্তোষর আধার হচ্ছে ঘরের স্ত্রী। আজ তো আমার মুখে দাঁত নেই, চোখে দেখতে পাই না, উরু দুটো

শুকনো ডাঁটার মতো হয়ে গেছে। তবু যখনই আমার এ কথা মনে পড়ে তখন মনে হয় যেন আমার যৌবন ফিরে এসেছে।'

'থামো, চুপ করো পিসী।'

'আরে পাগলী! তোর কি হল কাঁদছিস কেন?'

'আমি কাঁদছি না পিসী,' বলে কান্না থামাতে না পেরে সে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। সে রাতের মতো গাঢ় ঘুম তার আর কখনও হয়নি।

সকালে উঠেই দেখল রামন্না এসে গেছে।

তার হাতে ছিল এই শাড়ীটা! তখনই গতরাতের স্মৃতি যেন স্বপ্ন হয়ে গেল।

অলক্ষণে শাড়ী! এটা শাড়ী নয়, সুখ ঢেকে দেবার পর্দা। তবু জানিনা কেন আজ এইটেই পরেছি। আগে একবার ওইটে পরবার পরেই মোহনের জ্বর এসেছিল।

'ছিঃ, যত সব খারাপ চিন্তা! মোহন এখনই ফিরবে,' বলে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সে সেইখানেই চেপে বসে রইল।

ছয়

হাসিমুখে রামন্না জানলার কাজে গিয়ে দু' এক মিনিট বাইরে তাকাল। তারপর হাতের ঘড়ি দেখল। সভার লোকদের ডাকতে আসার জন্য এখনও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকী। লোকেরা ডাকতে এসে তাকে অকারণে হাসতে দেখলে না জানি কি ভাববে? অকারণে নয়, তবে কারণটা অপরকে বলার মতো নয়। সেও আবার দশ বছরের পুরোণো কথা। তা ছাড়া কথাটা ব্যক্তিগত, নিজেরই চিন্তার ব্যাপার।

'যাক গে', বলে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সে চেয়ারের দিকে চলল, যেতে যেতে বইয়ের আলমারি দেখে সেইদিকে ঘুরে গেল, আলমারির পাল্লা খুলে বইগুলো দেখতে লাগল। একটা বই নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল, তাতে একটা শ্লোক পড়ল, বইটার নাম দেখল। সেটা কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটক। শ্লোকটা আবার পড়ল।

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিনোপি জন্তুঃ
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বম্
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ।।

শ্লোকটা গুণ গুণ করতে করতে সেও পর্যাকুল অর্থাৎ উৎকন্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এইজন্যেই তো ঐ মহাত্মাকে লোকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে। এই শ্লোকটার জন্যই তো তাঁকে ঐ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে বলে সেই শ্লোকটা পড়তে পড়তে আবার চেয়ারে এসে বসল। কালিদাস শ্রেষ্ঠ কবি।

এতে কোন সন্দেহ নেই। বলা যেতে পারে যে তিনি বহির্জগতের চেয়ে মানবের অন্তর্জগতে প্রবেশ করে, সেখানে খুব ঘুরে ফিরে অন্তর্জগতের চিত্র এমনভাবে লিখে রেখেছেন যাতে সেটা সকলের কাজে লাগে।

আজ তার খুশি হওয়া উচিত। আজ সে এমন গৌরব পেতে যাচ্ছে যা আগে কোন সাহিত্যিকের জোটে নি। সার্বজনিক সভার আয়োজন হচ্ছে, সার্বজনিক সম্মান পেতে চলেছে, আর কি চাই? সেই সভায় তার সঙ্গে কুমুদেরও যাওয়ার কথা। তার বেশ-ভূষা, অলঙ্কার-পারিপাট্য এবং সর্বাঙ্গে সংযত সৌন্দর্যের প্রকাশ ক্ষণিকের জন্য দেখে রামন্নার মনে হল যেন সে হাতে স্বর্গ পেয়েছে। স্বর্গই কেন? কুমুদের পরা শাড়ীটা দেখার ফলে বলা যায় যে তার মোক্ষলাভ হয়ে গিয়েছে।

সেই শাড়ী। প্রেমের উপহার বলে কিনে আনা সেই শাড়ী। সেই শাড়ীপরা সৌন্দর্যের মূর্তি দেখে ক্ষণিকের জন্য তার আনন্দ হয়েছিল। পরক্ষণেই, পরক্ষণ থেকেই মন উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিল। কেন? পুরোণো কথা মনে পড়ার জন্য? কিংবা ভবিষ্যতের সূচনা ভেবে?

কালিদাস বলেন সুন্দর জিনিষ দেখলে পরে বিগত জন্মের স্মৃতি অজান্তেই আমাদের আকুল করে তোলে।

গত জন্ম পর্যন্ত যাবার দরকার কি? এ জন্মের স্মৃতিই রামন্নাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। দশ বছর আগে মিথ্যা বলে বন্ধুকে ঠকিয়ে সে এই শাড়ীটা কিনেছিল— কুমুদের জন্য।

উৎসাহ নিয়ে ঘরে ফিরে দেখেছিল কুমুদ নেই। রামন্না প্রথমে হতাশ হলেও পর মুহূর্তে হেসে উঠেছিল।

হাসি আর সন্তোষের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। অত্যন্ত দুঃখের সময়েও যে হাসি আসতে পারে নিজের অভিজ্ঞতায় সেদিন বুঝতে পেরেছিল। সেদিন তার হাসি পেল কেন? যদি সে নাটকের পাত্র হত তবে অন্য লোকদের সামনে দীর্ঘ স্বগত ভাষণ দিয়ে সে বোঝাতে পারত তার হাসি পেয়েছিল কেন। 'আরে মূর্খ! রামন্না, তোমার এই অপমান কি করে হল? তোমার গালে চড় কি করে পড়ল? হাঃ-হাঃ। শাড়ী এনেছ না? কুমুদের জন্য শাড়ী এনেছিলে না? হাঃ হাঃ হাঃ! আরে ধাপ্পাবাজ! তোমার জন্যে যে প্রাণ দিতে রাজী ছিল, যে তোমাকে নিজের জীবন বলে মনে করত, তোমার সেই স্ত্রী সরলা যতদিন বেঁচে ছিল, তার জন্য তুমি কি এর অর্দ্ধেক দামেরও একটা শাড়ী কিনে এনেছিলে? হুঁ! এখন এনেছ? কার

জন্য ?...'কিন্তু এই ভাষণ এত আস্তে যেন শুধু সেই শুনতে পায়। তাই সে হেসে উঠেছিল।

দশ বছর পরে আজ যদি সেটা ভেবে দেখি ? কিংবা সাহস করে সেই সিদ্ধান্তের সামনে দাঁড়াই ?

রামপ্পা হঠাৎ ভয় পেল। মনে প্রশ্ন জাগবার সময় সামনের জিনিষটার উপর তার নজর পড়ল। সামনের দেওয়ালে সরলার ছবি রয়েছে।

ছবিতে তার মুখটা খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। ঠোঁট, মুখ, গাল, চোখ সবেতেই শুধু হাসি আর হাসি। ছবি দেখে মনে হচ্ছিল যেন তুলিটা রঙের বদলে হাসিতে ডুবিয়ে আঁকা হয়েছে। প্রথমে দারিদ্র্য, পরে অসুখ। সরলার জীবন এমন ছিল যে সুখের মুখ না দেখেও সে হাসতে পারত।

সে একবার বলেছিল, 'কি করছ ?'

সে উত্তর দিয়েছিল, 'লিখছি।'

'বন্ধ করো তো। যখনই দ্যাখো লিখছেন, এতে যে কি সুখ আছে ?'

'সরলা, তোমাকে সুখী করার জন্যই আমি ব্যস্ত। তাই ক্রমাগত লিখে যাচ্ছি।'

'আমাকে ? আর কতো সুখ দেবে গো ?'

'এতটা দিতে হবে যেন বাইরে থেকে দেখা যায়। তবেই তো তোমাকে মানাবে। বলে আঙুল দিয়ে তার গালে টোকা দিয়েছিল। সে সময় সে পান খাচ্ছিল। ঠোঁট লাল হয়েছিল। পানের পিক ঠোটে লেগেছিল, তখন সে 'এমনি করে মুছে ফেলতে হবে' বলে আঙুল দিয়ে মুছে নিয়েছিল।

'যেমন করে কথা বলো তেমনি করেই লেখা উচিত। তবে তোমার বই ভালো বিক্রী হবে।'

তখন সে ঠাট্টার সুরে বলেছিল, 'যা মুখে বলি সেটা শোনবার লোক তো ঘরেই রয়েছে, যা লিখি তা অন্য লোকের বৌরা পড়ে।'

'তাদের না হয় পড়তে একদিন দেরীই হবে। আজ আর লিখো না।'

'কেন ? আজ কী হল ?'

'আজ কী ? তোমার হাতে হাত রাখার দিন......'

'ও হো ! থামো, থামো, ছিঃ ! আবার ভুলে গেছি। এবারও সরলা আমাকে ক্ষমা করো। লেখার ফেরে পড়ে এটাও ভুলে গিয়েছিলাম যে আজ আমাদের বিয়ের তারিখ।'

সরলা হাত দিয়ে তার মুখ চাপা দিয়ে বলেছিল, 'এমন কথা বোলো না। আমার বিয়ের দিন তো বছরে একবারই আসে না, আমার তো রোজই উৎসব বলে মনে হয়।'

'সরলা, তোমার মতো স্ত্রী পাবার যোগ্যতা আমার নেই। তোমাকে পাবার জন্যে কয়েক জন্মের সাধনা দরকার।'

'সে সব জন্মেও আমি তোমার সঙ্গ ছাড়বোনা।' বলে সেও ঠাট্টা করেছিল।

' দ্যাখো সরলা গতজন্মে তুমি ভুলেও কাউকে একটা কুটোও দান করো নি।'

'কেন? তোমার মনে একথা এল কেন?'

'আমার মত গরীব স্বামী তোমার ভাগ্যে পড়েছে। একদিনও একটা ভাল শাড়ী কিনে দেবার সামর্থ্য নেই যাতে তোমার সৌন্দর্যের শোভা বাড়িয়ে তুলতে পারে।'

'স্ত্রীর সৌন্দর্যের শোভা শাড়ীতে বাড়ে না। তার হাত ধরেছে যে স্বামী তার ভালবাসাতেই সেটা বাড়ে।'

'তাহলে তোমার মতে সৌন্দর্যেরও কনসেশন্যাল রেট আছে?'

এ কথা শুনেও সরলা হেসে উঠেছিল। সব কথাতেই তার হাসি। এখন সে ছবিতেও হাসছে।

রামপ্পা একটা দীর্ঘশ্বাস নিল। কালিদাস বোধহয় সর্বজ্ঞ ছিলেন। সুখের স্মৃতিতে দুঃখ আসে। খাঁটি কথাই বলেছেন।

হুঁ......আর একটা কথা কালিদাস বলেন নি। সেটা সে নিজের অভিজ্ঞতায় শিখেছে। আর তা হচ্ছে দুঃখের স্মৃতিতে সুখ হয়। না হলে পুরোণো দিনের কথা কেন মনে পড়ছে?

সে আর একবার হাতের ঘড়িটা দেখল। হুঁ, চিন্তার গতির সঙ্গে ঘড়ির গতির কত পার্থক্য? অভ্যর্থনা সমিতির লোকদের আসতে এখন বিয়াল্লিশ মিনিট বাকী। এখন তার গম্ভীর হয়ে বসে থাকবার চেষ্টা করা উচিত। আবার হাসি পেল। ছিঃ! সেই শাড়ীটার স্মৃতির স্বাদ পুরো ভোগ করা উচিত; যদি ওটাকে আটকে রাখি তবে অভ্যর্থনা সমিতির লোকদের সামনে পরে অনর্থ হয়ে যেতে পারে।

'থুঃ!' এ কী ছেলেমানুষি? এই স্মৃতিচারণের কি দরকার? বলে সে চেয়ার থেকে উঠল। পিঠের দিকে হাতে হাত ধরে ঘরের এধার থেকে ওধারে ঘুরতে লাগল। প্রথম স্ত্রী মারা গেছে। তার মরবার আগেই ঘরের আর একজনের মোহে পড়লাম। শয্যাশায়ী স্ত্রীর চোখ এড়িয়ে তার সঙ্গে ব্যাভিচার করলাম। সে মেয়েটা অন্তঃসত্বা হল। স্ত্রী মারা গেলে সে মেয়েটিকে বিয়ে করেছি। পৃথিবীতে প্রতিদিন কতো জায়গায় কতো লোক এমন কাজ কি করে না? তাদের তো মানসিক যন্ত্রণা হয় না। তবে সে কেন সেই যন্ত্রণা পাচ্ছে? কিংবা সে এমন কাপুরুষ যে ব্যাভিচারটা হজম করতে পারছে না।

'ব্যাভিচার' বলে সে কুমুদের অপমান করছে। সেটা ব্যাভিচার ছিল না। সত্যি বলতে কি সেটা—

তবে সেটা ? প্রেম ? কিংবা বাসনা ?

আজও কথায় কথায় সরলাকে মনে পড়ে বলে তার বিশ্বাস যে সে আজও সরলাকে ভালবাসে। কেন? দুজনকে কি একসঙ্গে ভালবাসা যায় না ? তবে কি বিয়ের পরে বাসনা ব্যক্ত করলে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম, আর বাসনা ব্যক্ত করার পর বিয়ে করার ফলে দ্বিতীয় স্ত্রী কুমুদের সঙ্গে ব্যাভিচার করা বলতে হবে ?

রামন্নার কখনো কখনো মনে হত যে সে কুমুদকে ভালবাসে বা ভালবাসত। এমনটা কি হতে পারে না? সেদিন যখন সে শাড়ী নিয়ে এল তখন কুমুদকে বাড়ীতে না দেখে তার হৃদয় শূন্য বোধ হচ্ছিল। পরক্ষণের কথাটা স্বতন্ত্র। ভিতরের উত্তেজনাকে হাসির ফুলঝুরি দিয়ে চাপা দিলেও শূন্যতাবোধের কি অর্থ নেই ?

তবুও রামন্নার সন্দেহ ছিল। কুমুদের প্রতি যদি তার সত্যিই ভালবাসা থাকে তবে তার কাছে সে এত অসহ্য বোধ হত না। এটা আজ থেকে দশ বছর আগের কথা। একে অপরের সামীপ্য না চেয়েও সংসারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবুও তার অন্যদিকে আসক্তি জন্মাল না কেন? তবে কি এটাই খাঁটি প্রেমের লক্ষণ ?

চিন্তার বোঝায় ক্লান্ত রামন্না আবার চেয়ারে বসে পড়ল। হঠাৎ কুমুদের মূর্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে গেল—সে এদিক ওদিক দেখল—সে বাস্তব কুমুদ নয়—তার মনের তৈরী মূর্তি—মন নয়, তার স্মৃতিই তাকে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। দশ বছর আগে যখন সে ঘরে ছিল না, ঠিক আন্দাজ করে সে কুমুদের পিসীর বাড়ী গিয়েছিল। তখন তার সামনে ভেসে উঠেছিল কুমুদের সেই মূর্তি।

কুমুদের মুখে ছিল মৃদু হাসি। তাকে দেখে রামন্না হতবুদ্ধি হল। সারাপথ লোকে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল।

কুমুদকে ঘরে না দেখে সে হকচকিয়ে গেল। শেষে তার মনে হল যে সে হয়তো পিসীর বাড়ী চলে গেছে। অনেক জায়গায় খোঁজ নিয়েছিল। কাউকে জিজ্ঞাসাও করতে পারে না আবার কাউকে খুলে বলতেও পারে না। তাই কয়েক জায়গায় ঘোরার পর শেষে কিছু ভেবে সে স্টেশনের পথ ধরল। মন স্থির করে টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠতে না উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিল। ভিতরে ঢুকলে অন্য উঁচু ক্লাসের যাত্রীরা উৎসুক হয়ে তাকে দেখছিল। সে বুঝতে পারল না এরা কেন তাকে এমন করে দেখছে। একটা খালি সীটে বসে পড়ল। কারো সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা তার ছিল না। অন্যেরাও তার সঙ্গে কথা বলল না, মাঝে মাঝে চুরি করে তাকে দেখছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না। ক্রমে সকলে বিছানা পাততে আরম্ভ করল। খুবই ক্লান্ত হয়েছিল বলে রামান্নাও শোবার জন্য বিছানা—

'থুঃ'! কি মূর্খ সে? কি হাস্যকর পরিস্থিতি? গ্রামে যাবার সময় তার হাতে শুধু সেই শাড়ীটা ছিল। তার হাতে রাখা শাড়ীকেই সে চাদর ভেবে পাততে যাচ্ছিল। অন্য যাত্রীরা হাসি সামলাতে পারে নি। হাসির ব্যাপার বুঝে শেষপর্যন্ত সেও হেসে উঠেছিল।

তারপর অন্যলোকেও তাকে এই অবস্থায় দেখে হেসে থাকবে। এই ভেবে কুমুদের সামনে যেতে রামন্নার একটু দ্বিধা ছিল। না জানি মুখটা কেমন হাঁদারামের মত দেখাচ্ছে। কুমুদও মুচকি হেসে তার দিকে তাকিয়েছিল। সেদিন সকালে তাকে সে যেভাবে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল সেই হাস্যমুখী মূর্তিই আজ রামন্নার সামনে এসে দাঁড়াল।

রামন্না ভাবতে বসল। আজ দশ বছর পরেও কুমুদের সেই মূর্তিই দেখছি। হাজার চেষ্টা করেও কুমুদের অন্যরূপ তার মনে পড়ল না। মনের এ কেমন ছলনা? জগতে মানুষের স্বভাবই এইরকম। শঙ্করাচার্য্য জগৎকে মায়া বলেন নি কি? যে কোন বস্তুই হোক না কেন, তার যে নিজস্ব রূপ সেই রূপে তাকে দেখা যায় না। দ্রষ্টা নিজের ইচ্ছামত তাকে যে রূপ দেয় সেই রূপেই তাকে দেখতে পায়। শেষপর্যন্ত সেই রূপই তার মনে গেঁথে যায়।

হুঁ……তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে যতই মাথা ঘামাও সবই ব্যর্থ। যা আছে তাকে স্বীকার করে নেওয়াই উচিত। কুমুদ প্রথমে কামিনীরূপে তাকে মোহিত করেছিল। সব সময় সেই মূর্ত্তিই তার সামনে ভেসে ওঠে। তার আমন্ত্রণ ভরা চোখদুটি, আলিঙ্গনের ইচ্ছা জাগানো পরিপূর্ণ দেহ, চুম্বকের মত ঠোঁট, সুপুষ্ট স্তন, কামনা জাগানো উরু……

এক এক সময় তার মনে হত যে এসব কথা চিন্তা করতে তার লজ্জা হয় না? কিন্তু এতে লজ্জার কোন কথাই নেই। আসলে সে ছবিটা মন থেকে মুছে ফেলবার শক্তি তার ছিল না। সেদিন পিসীর বাড়ীতে এসে কুমুদের মুখে হাসি দেখে রামন্নার যেন মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

ওহো! এইবার ঠিক মনে পড়েছে। শাড়ী তখন নিয়ে যায় নি। সেটা তো পরের বারের ব্যাপার। প্রথমে মোহনের জন্মের আগে বিয়ের কিছুদিন পরে কুমুদ পিসীর বাড়ী গিয়েছিল। তখনও তার এই রকম হয়েছিল। সেবার না এবার? যেবারেই হোক গে। কুমুদকে মনে হলেই তার সেই চেহারা চোখের সামনে হাজির হয়। তখন একবার মোহনের জন্মের আগে কুমুদ হঠাৎ নিজেকে অসহায় ভেবে চলে গিয়েছিল। সেদিনের কথা মনে হলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তার মুখে মৃদু হাসি আর রামন্না যেন বোবা। মা হতে যাচ্ছে বলেই হয়তো তার মুখে ছিল প্রশান্তি আর চোখে ফুটেছিল করুণা। তার সামনে দাঁড়িয়ে রামন্নার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল। কতক্ষণ যে সে এইভাবে দাঁড়িয়েছিল মনে

পড়ে না। তখন তার অজ্ঞান হয়ে যাবার উপক্রম। এমন সময় বুড়ীর গলা শোনা গেল—

'কুমদী, কে এল রে?' সে কী উত্তর দেবে? বলবে কি যে চিনি না, বন্ধু এসেছে? কুটুম এসেছে? কোন দুষ্ট লোক? কিন্ত সে বলল, 'পিসী উনি এসেছেন। তুমি এদিকে এস।'

তখন রামন্নার হুঁশ হল। ভরসা হল যে কুমুদ এখন তাকে ভালবাসে। কুমুদ 'উনি' বলেছিল—'আমার' কথাটা বলে নি। যেন আত্মীয়তার অভাব।

'আরে, তোর ঘরের মালিক? তা এমন ভাবে স্কুল-পালানো ছেলের মত এল কেন?' বলতে বলতে বুড়ী ঘরের মধ্যে এসেছিল। ছবির পুতুলের মত দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুড়ীর দুষ্টুমি জাগল।

'কি ভাই, বিয়ের সময় তো বুড়ীকে ডাকলে না, কিন্তু প্রথম প্রসবের ভারটা আমার ওপরেই চাপালে?'

উত্তরে সে পাগলের মত দাঁত বের করেছিল।

'হেসে নাও বাবা। একদিন সবাই এমনি বুড়ো হবে। তাই বয়েসকালেই হেসে খেলে কাটাতে হয়। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন কুমদী? বসতেও বলিস নি?'

'ঘর তো তোমার পিসী!'

'লোকটা তো তোরই। তুই যেখানে থাকবি সেটাই তো ওর ঘর। বস ভাই, চা আনছি, পরে স্নান করো। বৌ তো আর পালিয়ে যাচ্ছিল না যে হন্যে হয়ে পরের দিনই ছুটে এলে।'

তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই নিজের মনে বকতে বকতে বুড়ী চলে যাবার পর রামন্নার সাহস একটু ফিরে এল।

'কুমুদ……।'

'কি?'

'আমার উপর রাগ করেছ?'

'কেন?'

'তুমি বিয়েটা চাইছিলে না বলে।'

'না চাইলে তো বেইজ্জত হতাম। আপনার দয়ায় বেঁচে গিয়েছি।'

'বুঝেছি, আমার উপর তোমার রাগ আছে।'

'আপনার উপর নয়, নিজের উপর।'

'কী বলছ?'

'আপনার মিষ্টি কথায় ঠকে গিয়েছি……'

'কুমুদ, কুমুদ, এমন করে বলো না। দুজনের সম্মতিতেই বিয়ে হয়েছে।'

'বিয়ের ফলে যে জন্মাবে তার বাপের পরিচয় থাকবে। তাতে আমার কি……'

'কুমুদ তোমাকে পুরো মনোযোগ দিয়ে……'

'আপনার মনোযোগ দেওয়ার কথা থামান। আপনি তো সাহিত্যিক, কথার অর্থ ভালই জানেন, 'তাই 'মনোযোগ' বলেছেন, ভুলেও 'ভালবাসা' কথাটা বেরোয় নি।'

'কুমদী, এখনো গল্প করছিস?' বলে বুড়ী ঘরে এল। সে সময় বুড়ী না এসে পড়লে আবেগভরে সে যে কি করে ফেলত তার ঠিক নেই। বুড়ীর আসায় সে সব কিছুই ঘটল না। কুমুদকে তখন সে যা বলেছিল সেকথা মনে পড়লে এখনও সংকোচ হয়, তখনও হয়েছিল।

কুমুদকে সে ভালবাসতে চায়; বলা উচিত ছিল ভালবাসে। কিন্তু সরলার স্মৃতি মুছে না গেলে সে কি করে বলবে যে সে কুমুদকে ভালবাসে? সেদিন সে কুমুদকে এই প্রশ্নই করেছিল। কুমুদের উত্তরটা ছিল বেশ কড়া।

কুমুদ বলেছিল, 'আপনার প্রেমও চাই না আপনাকেও চাই না।'

কিন্তু শেষপর্যন্ত সে মেনে নিয়েছিল। শুধু এক শর্তে কুমুদ তার ঘরে থাকতে রাজী হয়েছিল। শর্তটা ছিল যে প্রসবের সময় পর্যন্ত সে পিসীর কাছে থাকবে। পরে তার বাড়ীতে এলেও সে তার উপর দাম্পত্য অধিকার খাটাবে না।

সে বলেছিল, 'খুশিমনেই তোমার কথা মেনে নিচ্ছি।'

মেনে নিচ্ছি বলেছিলাম। তাইতো অবাক লাগছে। বিষয়টা কি ছিল? কি মেনে নিচ্ছি?……শেষে স্মৃতির ছবিগুলো মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেনে নিয়েছিল যে কালিদাস সত্যিই মহাকবি।

সাত

কুমুদ সামনের দেওয়ালটাকে বলল, 'সেদিন মেনে নেওয়াই ভুল হয়েছিল।' পরে তার মনে হল যে আজ স্বামীর সঙ্গে ছায়ার মতোই তাকে সম্বর্ধনা সভায় যেতেই হবে। এও এক রকমের প্রায়শ্চিত্ত। যাই হোক না কেন, মেয়েদের স্বভাব তো। তাই সে আবার আয়নার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল। নিজের মনেই বলল, মুখই শুধু দেখা উচিত, শাড়ীর দিকে তাকানো ঠিক হবে না। পাগলী! দাম্পত্য জীবনের সুবিধাটুকু চাইব আর অসুবিধাটা নেব না। এ কি সম্ভব? বিয়ের

আগে যে ব্যবহারই করে থাক না এখন তো সে বিবাহিতা স্ত্রী। ভাত কাপড়ের চিন্তা নেই বটে কিন্তু সুখের অধিকারও নেই।

সেদিন একটু সাহস দেখিয়ে কাজ হাসিল করা উচিত ছিল। তবে তখন পেটে একটা ছিল বলে সে ছিল নিরুপায়। সেইজন্যে গোড়া থেকেই ওই ছেলের উপর বিতৃষ্ণা ছিল। রামন্নার ছেলে। ওকে দেখলেই রামন্নার কথা মনে পড়ে যায়। রামন্নার কথা মনে পড়লে এখনও কুমুদের শরীর আনন্দে কেঁপে ওঠে।

একভাবে দেখলে ছেলেটা যেন তার আনন্দের পথে বাধা।

একদিন পিসী বলেছিল, 'কুমদী, তোর শরীর যেভাবে পুরন্ত হচ্ছে তাতে মনে হয় তোর ছেলেই হবে।'

তাতে সে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'যা হবার তাই হবে, এতে কি কারো হাত আছে?'

কুমুদের মাঝে মাঝে মনে হত এ এক রহস্য। মানুষকে যে পরের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় সেটা মানুষের জন্ম দেখলেই বোঝা যায়। তখন কি সে তা জানত না? এখন সে জেনেছে এটাই সত্য। কিন্তু তখন সে জানত না, জানার চেষ্টাও করে নি; তখন সে জ্ঞানহারা হয়েছিল।

এ কী কাণ্ড! যা ঘটে গেছে সে সব দেখেশুনে লাভ লোকশান হিসেব করে এখন রামন্নার উপর রাগ। পিসীর কথা সত্যি হলে রামন্না তো অন্য সব পুরুষেরই মতো, কিংবা সব পুরুষই রামন্নার মতো। খিদের মুখে খাবারের স্বাদ বাড়ে। আবার পেট ভরলেই ঘুম পায়। এ তো চিরন্তন সত্য। তবে আর রামন্নার দোষ কি? তারও তো দোষ ছিল। দু হাত না হলে তো তালি বাজে না। একটা জীব সৃষ্টি করতে দুটো জীবের দরকার। নতুন পাতা গজাবার আগে পুরোণো পাতাকে ঝরতেই হবে। কথাটা ঠিক বটে তবে সে একলাই পুরুণো পাতা হল কেন? রামন্নাও পড়ল না কেন?

ক্রমে কুমুদের মন শান্ত হয়ে এল। তার মনে পড়ল না যে সে রামন্নার কামনার বলি হয়েছিল। সৃষ্টির রাজ্যে সে যে একটা জীবের জন্ম দিয়ে মা হয়েছে আর তাকে পালন করে বড় করে তুলেছে, এই কথাটা ভেবে তার মন আনন্দে ভরে উঠল। তার সন্দেহ ছিল যে এ কাজের যোগ্যতা তার নেই। কিন্তু যোগ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উৎসাহও বেড়ে গিয়েছিল। পেটের ভার বাড়তে দেখে তার তৃপ্তি হত। ছেলে হবার পর তাকে স্তন্যপান করিয়ে খাইয়ে দাইয়ে বড় করবার কথা ভেবে তার বুকে এক অসহ্য বেদনা হত। পরে কিন্তু এই ভেবে সে খুশি হত যে ব্যথাটা হৃদয়ে নয়—সেটা ভাবী শিশুর খাবার তৈরীর বাহ্য লক্ষণ।

কখনো মনে হত যে বেচারী রামন্নার ওপর রাগ করে কি হবে। যত বড়ই হোক না কেন, পুরুষ মানুষ তো বটে। তাদের ক্ষণিক সুখের লোভ হয়ে থাকে।

চিরন্তন মাতৃত্বের সুখপ্রদ অনুভূতি পুরুষের হয় না। এই ভেবেই রামপ্পার উপর তার করুণা হত। গর্ভের সন্তান ছেলে হবে ভেবে তার জন্যেও করুণা হত; আয়নার সামনে বসে এক এক সময় তার মুখে হাসি ফুটে উঠত। পাগল পুরুষ! এই সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়ে ওঠে তো তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

এই সব ভাবনা চিন্তার মধ্যে অনেকবার সরলাদিদির কথাও মনে পড়ত। বেচারী! কোন সুখের মুখ না দেখেই অতৃপ্ত মনে চলে গেল। সব সময় বলত ঘরে ছেলেপিলে থাকলে তবে সত্যিকারের ঘর হয়। তখন সে খুব বোকা ছিল। একদিন দিদির সঙ্গে গল্প করতে করতে সে বোকার মত কি একটা প্রশ্ন করেছিল।

'দ্যাখ কুমুদ, মেয়েদের সুখ হয় যদি তার নিজের ঘর সংসার হয়, সুস্থ সবল স্বামী থাকে আর ঘরে দৌড়ঝাঁপ করার মতো ছেলেপিলে হয়।'

'তোমার তো ঘর সংসার রয়েছে'—

দিদি হেসে বলেছিল, 'সুস্থ সবল স্বামী আছে।'

'তবে আর কি চাই? দু চার দিনে ছেলেও হবে।'

তার কথায় দিদি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে ছাতের দিকে চেয়ে রইল।

'এর পরে······'

দিদি বলেছিল, 'তুই পাগল না কি?'

তার মাথায় কিছু ঢুকল না। স্বামী থাকলে বাচ্চা তো হয়েই থাকে। সে এটাই নিশ্চিতভাবে জানত।

'তুই পাগল কুমুদ। আমার এ রোগ সারবার নয়।'

'দিদি!'

'যদি সারেও, তবু ছেলের মুখ দেখা আমার ভাগ্যে নেই।'

'কেন?'

এতে সরলা হেসে উঠেছিল। হাসির পরিশ্রমে তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল।

দিদি বলেছিল, 'কেন বলছিস? দাঁড়া দুদিন বাদে তোর বিয়ে হলে তুই আপনিই বুঝতে পারবি।'

তবে তো বিয়ে হলেই ছেলে হবে এ ভরসা নেই, মেয়েরা যে নিশ্চয়ই মা হবে এ ভরসাও নেই? তখন সে বোঝে নি।

তখন জানত না কিন্তু পরে জানতেও দেরী হয় নি।

আক্কেল থাকতে যে কথা বোঝে নি, আক্কেল খুইয়ে সেটা বুঝেছে। মনে যতই উদ্বেগ থাক না কেন, সে সব কথা মনে হলে একটা নতুন চেতনা জাগে। ঠোকর খেয়েই ব্যাপারটা বোঝা গেল।

তখনকার মানসিক অবস্থা মনে পড়লে আজও কুমুদের অবাক লাগে। এমন দিনও গেছে যখন রামন্নাকে দেখলেই বা তার কথা স্মরণ হলেই মনটা যেন তার বশে থাকত না। কেন এমন হয়? সকলেরই কি এমনই হয়? কুমুদ সঠিক জানত না। সে ভেবেছিল যে শুধু তারই এমন হয়, বুদ্ধি আর শরীর কোনটাই তার আয়ত্তে ছিল না। শুনি যোগীরা নাকি যা প্রত্যক্ষ নয় তাও দেখতে পান। শরীরের সুখদুঃখের বোধ তাঁদের থাকে না। তার মনে হল যে মোহনের মা হবার আগে তারও বুঝি যোগশক্তি ছিল।

একদিনের সেই ব্যাপারটা আজও মনে আছে। তার মনে হয়েছিল যে সেদিনই তার শেষ হয়ে গেল। সে বুঝেছিল যে সরলাদিদি তার সব ব্যাপার জানতে পেরেছে। নিজের অনুভব শক্তি দেখে সেদিন সে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা সামান্যই। রাত নটা বাজে, রামন্না তখনো ফেরে নি। সেজন্য সেও খায় নি। সরলাদিদিও দুধ খান নি। দিদির না খাওয়াটা তার ভাল লাগল না। দু একবার বললোও, 'দিদি, তোমার দুধ এনে দি?'

'আমার জন্যে ব্যস্ত কেন? ও আসুক, খাওয়া শেষ হোক।'

'আমি সেজন্য বসে থাকবো, দিদি।'

'আমারই বা কী কাজ? আমিও অপেক্ষা করি।'

'তা থাকো কিন্তু দুধটা খেয়ে নাও।'

'থাম্ কুমুদ। আমি যেন খিদেয় মরে যাচ্ছি।' বিরক্ত হয়ে দিদি বলেছিল।

আরো কিছুক্ষণ সময় কাটল। রামন্না তখনো ফেরে নি। কি মনে করে জানিনা ঝট করে বলেছিলাম. 'দিদি, দুধ আনি?'

'মানা করলাম না? আমি একলা……'

'আমি সব চুকিয়ে নিচ্ছি দিদি।'

সরলাদিদি তার মনের কথা বুঝতে পারে নি।

'আরে পাগলী তোকে আবার কে মানা করেছে? কখন থেকে তো তোকে বলছি। তোর এখন বাড়বার বয়স, খালি পেটে থাকা ভাল নয়। খিদে পেয়েছে তো খেয়ে নে। আমি অপেক্ষা করছি।'

'তা নয় দিদি। আমি কি বলেছি যে খিদে পেয়েছে। কারুর বাড়ী খেতে গেছেন।'

'কখন বলল ও কথা?'

'বলেছেন মনে পড়ছে, তাই বলছি আমরা পাট চুকিয়ে নিই।'

জানি না কি সব ব্যাপার হচ্ছে। কখন বলেছিল?' বলে সরলাদিদি বিরক্তিতে বিড়বিড় করতে লাগল। সে দিদিকে দুধ এনে দিয়ে রান্নাঘরে খাবার বাড়তে লাগল। বাইরে যেন কিসের শব্দ হল। না, কেউ নয়। তবু আওয়াজের জন্য

খাবার বাড়া বন্ধ করল। একটু পরে তাকে বাইরে আসতে দেখে সরলা বলল,—'আরে, এত শীঘ্র খাওয়া হয়ে গেল, কুমুদ ?'

'না, খেতে যাচ্ছিলাম, এর মধ্যে একটা শব্দ শুনতে পেলাম।'

'কিসের শব্দ ?'

'কেউ নয় তো, তবে শব্দ পেয়েছিলাম।'

'তাই উঠে এলি ? যা এখানে খাবার নিয়ে আয়, একলা খেতে হবে না।'

'না, আমি আর একটু অপেক্ষা করি।'

'তুই যে বললি ও বাইরে খেয়ে আসবে ?'

'হ্যাঁ দিদি। এও মনে হল যেন একটা কিছু শুনলাম।'

'তবে কি ও ঘরে এল, আর আমি টের পেলাম না ?'

'না দিদি, বন্ধু হয়তো খাবার জন্যে জোর করে নিয়ে গেছে। পথে যেতে যেতে বড় দেরী হয়ে যাবে বলে ফিরে এসেছেন। আমার তো এমনিই মনে হল।'

'খিদের চোটে তোর ঝিমুনি লেগেছে নাকি ?' দিদির কথা শেষ না হতেই সদর দরজায় আবার শব্দ হল। সে গিয়ে দরজা খুলল। সামনে রামন্নাই দাঁড়িয়ে। একছুটে সে ফিরে এল। বুকটা ধড়ফড় করছিল। সে রান্নাঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল।

রামন্না এসেই এদিক ওদিক দেখে বলল, 'যাক, তুমি ওষুধ আর দুধ খেয়ে নিয়েছো, ভালই করেছ। আমিও ভাবছিলাম যে তোমরা অনর্থক আমার পথ চেয়ে থাকবে।'

'তোমার খাওয়া হয়েছে ?' সরলাদিদি জিজ্ঞাসা করল।

রামন্না বোধ হয় ব্যাপারটা জানত না। সে বলল, 'কি বললে ?'

'না, কোন বন্ধু জোর করে নিয়ে গিয়েছিল না ?'

'হ্যাঁ। তোমায় কে বললে ?'

'কুমুদ বলেছে।'

'তাকে কে বললে ?'

'কেন ? তুমি যাবার সময় তাকে বলে যাও নি ?'

রামন্না একটু ইতস্ততঃ করে এদিক ওদিক দেখল যেন সে নিজেকেই হাতড়াচ্ছে। পরে সরলাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

'আবার কী হলো ? কোথাও খেয়ে এসেছ ?'

দিদির কথায় রামন্না হাসিতে ফেটে পড়েছিল।

'মনে হচ্ছে তোমরা দুজনে মিলে দেরীতে আসার জন্যে আমার শাস্তি উপবাস ঠিক করে রেখেছ। কিন্তু আমি আমার দোষ মানছি। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

খিদে পেয়েছে? মানে বন্ধুর সঙ্গে খাওয়া······ ?'

'সে ভদ্রলোক তো খুব জেদ করছিল বলে অর্ধেক পথ পর্যন্ত গেলাম। পরে আমার মনে হল যে খাওয়া দাওয়া সেরে উঠতে না জানি কত দেরী হয়ে যাবে। তাই মাঝপথেই তাকে বুঝিয়ে ফিরে এলাম। হাঃ হাঃ।

'তবে তো তোমার খাওয়া হয় নি?' সরলাদিদি ব্যস্ত হয়ে বলেছিল। রামন্না ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল।

'প্রথমে তার জেদ মেনে নিলাম। পরে দেরী হবে মনে করে ফিরে এলাম।' সরলাদিদি এমনভাবে বলল যেন সে নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলছে।

তাদের কথা শোনবার জন্য আর দাঁড়িয়ে না থেকে রামন্নার খাবার বাড়বার জন্য সেখান থেকে সে সরে গিয়েছিল। সে সময় রামন্না আর সরলাদিদি যেভাবে তাকে দেখছিল তার মানেটা ছিল তার কাছে বেশ স্পষ্ট। মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়েছিল উনিও ঠিক সেইভাবেই বললেন। কথাটা তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না আবার বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। শুধু তাই কেন? তার নিজেরও তো বিশ্বাস হচ্ছিল না। তার কল্পনা যে সত্য হবে তা পুরোপুরি বিশ্বাস হতো না যদি আর একটা ব্যাপার না ঘটত।

দ্বিতীয় ঘটনাটা তার মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভূত-প্রেতের ব্যাপার নয় তো? রামন্নার রাতের খাওয়া নিয়ে যে ব্যাপার হয়েছিল তাতে অবাক হলেও সেটা ভুলতে দেরী হয়নি। দিদি আর রামন্না তখন অবাক হলেও পরে ভুলে গিয়েছিল। রামন্না তো কয়েকদিন ধরে কথায় কথায় 'আজকের ভবিষ্যৎ বাণীটা কি' বলে তাকে জ্বালাত। পরে সেটাও বন্ধ হল। সব কিছু রুটিন মত চলে।

একদিন;—সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সে দিদির কাছে বসে গল্প করছে। রামন্না কি একটা বই আনতে বাইরে গেল। যেতে যেতে বলছিল. 'এখনই আসছি। একটা জিনিষ পাচ্ছি না বলে লেখা আটকে গেছে। তাই বইটা আনতে যাচ্ছি।'

পাঁচ সাত মিনিট দিদির সঙ্গে কথা বলে সে হঠাৎ উঠে পড়ল। উঠতেই 'উঃ' বলে পা ধরে বসে পড়ল।

'কি? পায়ে কি হলো?'

'ঠোকর লেগেছে।'

'কি বলছিস?' দিদির প্রশ্নে তার হুঁশ হল। ফ্যাকাশে মুখে সে দিদির দিকে চেয়ে রইল।

তখন দিদি হেসে বলল, 'দিন দুপুরে স্বপ্ন দেখছিস নাকি?'

'না দিদি, সত্যি কিছুতে ধাক্কা লেগেই পায়ে লেগেছে; বেশ ব্যথা করছে,' বলে পা ধরে দাঁড়ালে দুজনেই দেখতে পেল যে কোথাও লাগে নি।

'আচ্ছা! এ ব্যথার ওষুধটা তাড়াতাড়ি জোগাড় করতে হবে।' দিদির কথাটা শেষ না হতেই 'দরজা খোল' বলে কে ডাকল।

দরজা খুলতেই দেখা গেল রামন্না আর একজনের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি যাবার সময় হোঁচট খেয়ে পায়ে চোট লেগেছে।

সেদিন থেকেই কুমুদের পুরো বিশ্বাস হয়েছিল। কেন এমন হয় তা বুঝতে না পারলেও রামন্নার অনুভূতি সে নিজে অনুভব করায় তার ধারণা জন্মেছিল যে সে মনেপ্রাণে রামন্নারই হয়ে গেছে।

কতবার সে ভেবেছে, একেই কি প্রেম বলে? যাকে আমি ভালবাসি তার সঙ্গে আত্মার মিলন কি এমনি করেই হয়?

তার এই অবস্থার কারণ কি শুধু সন্তানের জন্ম দেওয়া? মাতৃত্ব তো কামতৃপ্তির দণ্ড নয়, সম্ভোগের ফল নয়, স্ত্রী-পুরুষের মিলনের পরিণামও নয়। কোন বাস্তব কার্য কারণ থেকে এর জন্ম হয়নি; এ হল দুটি হৃদয়ের এক হয়ে যাবার বাহ্য সংকেত। এই মাতৃত্বের প্রভাবেই সে রামন্নার সঙ্গে থাকতে রাজী হয়েছিল। তবে সেও এক হঠকারী শর্তে। শর্ত ছিল, দুজনের মধ্যে কোন দৈহিক সম্পর্ক থাকবে না।

তবু মাঝে মাঝে মনে হয় কাজটা ঠিক হয়নি। শাড়ীর ব্যাপারে তো মনে হয়েছিল যে সে ভুল করেছে।

সে নিজের মনেই বলল, 'আমার রাজী হওয়া উচিত হয়নি।' তারপরে চারদিকে তাকায়। আমি কি বলছিলাম যেন? ও হ্যাঁ, আমার রাজী হওয়া উচিত হয়নি। পরে হাতের ঘড়িটা দেখে মনে পড়ল যে রামন্নার সঙ্গে সম্বর্ধনা সভায় যেতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল।

একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'ছেলের স্বভাব আমার জানা আছে। খেলতে গেলে কোনদিকে হুঁস থাকে না। কতো বোঝালাম। আজ সভায় যেতে হবে, তাড়াতাড়ি ফিরিস, কিন্তু এখনো তার খোঁজ নেই। কখন বা আসবে আর কখন বা তৈরী হবে?' বলে সে আবার হাতের ঘড়ি দেখল। আরে মোটে আধ ঘন্টা বাকী আছে, বলে ব্যস্ত হয়ে দরজার কাছে এসে মোহনের আসার পথ চেয়ে দাঁড়ায়।

আট

রামন্না হাতের ঘড়ি দেখে বলল, 'এখনো আধ ঘন্টা বাকী। বাব্বা! সময় আর কাটতে চায় না।' পাগল নাকি সে! পুরোণো দিনের স্মৃতিচারণ করেও

সময় কাটছে না। যাক গে আজকের সভা তো স্মৃতির বিষয় নয়। তার পথ চেয়েই তো সে বসে রয়েছে। তাকে লেখক বলে সম্মানিত করার জন্যেই এই অভিনন্দন সভার আয়োজন। বয়স পঁয়তাল্লিশ পূর্ণ হয়েছে। এই প্রজাতন্ত্রের যুগে জনতা তাকে সম্মান করছে। বাস্তবিকই গর্বের বিষয়। তবু এর জন্য তার কোন উৎসাহ হচ্ছে না কেন? এতে কী আছে? সারা সংসারই ধোঁকা। মাফ করবেন—এভাবে বলায় হয়তো সৌজন্যের অভাব রয়েছে—সারা সংসারটা মায়া। হ্যাঁ—ধোঁকা শব্দটা একটু কর্কশ। মায়া শব্দটাকে তত্ত্বজ্ঞান মনে হয়। এইটেই তো সাহিত্যের শক্তি। যাই হোক ঘরে বসে ধোঁকা শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারে। ধোঁকা। তার সাহিত্যই ধোঁকা। আজকের সার্বজনিক সম্মানটাও তো ধোঁকা। তার সাহিত্য কেমন? সে এখন যা করেছে সেইরকমই তো? যে সব বিষয়ে এখন তার অভিজ্ঞতা হয়েছে সে কি সব লিখেছে? এক স্ত্রীকে ভালবেসে আপন করল, দ্বিতীয়টা বদনামের ভয় দেখিয়ে। সে কি এই সবই লিখেছে? তার কাছে এই গল্প লেখার মত ভাষা নেই, টেকনিক নেই এবং লেখা উচিতও নয়; লিখলেও পাঠক বুঝবে কি?

পাগল! সাধারণ লোকের উপকার হবে ভেবে এতদিন ধরে তুমি নিজের মতো করে কত সারগর্ভ বক্তৃতা দিলে, কত সাহিত্য সৃষ্টি করলে; কিন্তু তোমার এই 'সেবা'র ফলে সমাজের কি একটুও উন্নতি হয়েছে?

ধোঁকা! সারা সংসারই ধোঁকা। সত্য যদি কিছু থাকে তো সে হচ্ছে আমাদের পাশবিক বৃত্তি ভরা জীবন। ভর্তৃহরি বলেছেন, আহার, নিদ্রা, ভয় আর মৈথুন—এই হচ্ছে বাস্তব জীবন। এই বৃত্তিগুলো দিয়েই মানুষ জীবন কাটায়, বাকী সব শুধু লোক দেখানো ভাঁওতা। এই বৃত্তিগুলো কিছুক্ষণের জন্য চেপে রেখে আমরা নিজেদের 'সংস্কৃতিসম্পন্ন' বলি। চাপতে না পারলে যে সংঘাত সৃষ্টি হয় তাতে সব বাঁধন ছিঁড়ে যায়—তারপর কিছুক্ষণের জন্য লজ্জা হয়। সামনাসামনি যেতে পারি না, পরস্পরকে এড়িয়ে চলবার প্রচেষ্টা। পরে আবার—পরে আবার—

নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ

আজকের সভায় এই বিষয়ে বললে কেমন হয়? ও—হ্যাঁ, একটা মানপত্র দেবার কথা আছে না? বিধাতাকে কি লোকে অকারণেই নিষ্ঠুর বলে? মানপত্রে তাঁর সাহিত্য সেবা ছাড়া তাঁর দাম্পত্যজীবনেরও প্রশংসা করা হয়েছে।

আদর্শ জীবনই বটে! দাম্পত্য জীবনের সুখ না পেয়েও দশ বছর কেটে গেল। দশ বছর ধরেই চলেছে এই গৃহস্থালির অভিনয়।

তবু কুমুদ আজকের সভায় যেতে রাজী হয়েছে। আশ্চর্যের কথা বটে। আগেও একবার এইভাবে রাজী হয়ে অবাক করে দিয়েছিল। মোহনের জন্মের পরে ঘরে ফিরেছিল। হ্যাঁ এখন মনে পড়েছে, শাড়ীর ব্যাপারটা এর পরেই ঘটেছিল।

মোহনের প্রথম জন্মোৎসবের দিন। সেদিনও চলে গিয়েছিল না? তার সঙ্গে থাকতে সে রাজীও হয়েছিল। শর্ত মেনে সে ব্রহ্মচারী হয়েই দিন কাটাচ্ছিল। তবু সে চলে গিয়েছিল। যদি আজও তেমনি করে? সভার লোকেরা ডাকতে আসার আগেই যদি চলে যায়?

রামন্না বেশ ভয় পেল; নিঃশব্দে নীচে বারান্দায় গিয়ে কুমুদ আছে দেখে সে নিশ্চিন্ত হল। আবার মনে হল -

ছিঃ! সে এত অস্থির হচ্ছে কেন? ওহো—আর একটা কথা—মোহন তো বাড়ী নেই, তাকে ছেড়ে তো সে যেতেই পারে না।

মোহনকে ছেড়ে সেও থাকতে পারে না আর কুমুদও পারে না। অতএব সে আর কুমুদ একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

'এও এক সমস্যা', বলে সে উপরে এল।

একই বস্তুর সমান দুটো বস্তু হলে তারা পরস্পর সমান হয়।

একই জীবে আসক্ত দুটি জীবের পরস্পর আসক্ত হওয়া উচিত নয় কি?

ভবভূতিও তো বলেছেন, 'আনন্দগ্রন্থিহরেকোয়ং অপত্যমিতি বধ্যতে।' অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মিলনগ্রন্থি হল সন্তান।

মোহনকে নিয়ে পিসীর বাড়ী থেকে কুমুদ প্রথমবার যখন এসেছিল তখন সে এইরকমই ভেবেছিল। তার কাছে কুমুদ ছেলের কথা বলত। পিসীর বাড়ীতে ছেলের লীলাখেলার বর্ণনা করত। যখন রামন্না ছেলেকে আদর করত, তখন কুমুদের মুখে খুশির ভাব ফুটে উঠত। ক্রমে তার মনে হল যে তাদের মন কষাকষি দূর হয়েছে। সে আর কুমুদ, সে আর কুমুদ—তবে কি—?

প্রেমের সঙ্গে ঘরকন্না চালাতে পারে? না, শুধু ভেবেই একথা তার মনে জাগে নি। বরং ভরসা হয়েছিল সে আর কুমুদ আগের মতই থাকতে পারবে। সাহস করে একদিন সে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিল।

কুমুদ উলটে প্রশ্ন করেছিল, 'আগের মতো মানে?'

'না, মানে, এমনভাবে থাকার চেয়ে-বলছিলাম কি?'

'এমনভাবে মানে কি?'

'না—এই সব ছাড়া—মানে—'

'এখন কিসের অভাব আপনার?"

না, অভাব নয়। মানে—এক বাড়ীতে থেকে কেন—?'

'আপনি যদি চান তবে এক বাড়ীতে থাকার দরকার নেই।'

'ছিঃ ছিঃ! আমি কি তাই বলছি?'

'তবে কি বলতে চাইছেন।'

উত্তরে সেকি বলত কে জানে, তবে তার দরকারই হল না। তাদের কথাবার্তা

বলার সময় মোহন কুমুদের কোল থেকে তার কাছে আসবার চেষ্টা করছিল। অভ্যাস-বশেই কুমুদ তাকে চেপে ধরে ছিল। তাই ছেলেও হাত বাড়িয়ে কাঁদবার উপক্রম করল। ফলে রামগ্না যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে ভেবে পাচ্ছিল না কথাবার্তা কি করে চালাবে। এই সময় ছেলেকে কেঁদে হাত বাড়াতে দেখে তার মনে হল যে ভগবান ছেলের রূপ ধরে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন। সেও পরম ভক্তের মত ছেলের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ছোট ছেলের মতি গতি বোঝা ভার। এতক্ষণ তার কাছে আসার জন্য বায়না করছিল আর যেই সে হাত বাড়াল অমনি মাকে জড়িয়ে ধরল। কিছু না ভেবেই সে যখন ছেলের হাত ধরে নিজের কাছে নিতে গেল তার হাতটা সেই সময়—

কথাটা মনে পড়তেই রামগ্নার গায়ে কাঁটা দিল। সুখের এমন তড়িৎ স্পর্শের সুখ আগে সে কখনো অনুভব করে নি। এক নিমেষে দুটো শরীরে যেন তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হল। সেই সঙ্গে সেই প্রবাহ এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়ে তার উত্তর এবং সম্মতির বার্তা বহন করে নিয়ে গেল। হয়তো আরো কিছু করেছিল। তখন দুজনেই ছবির মত নিস্তব্ধ নিশ্চল।

জানিনা কত যুগের কত জন্মের অনুভূতি সেই ক্ষণিকের অবসরে জেগে উঠেছিল। সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যে কর্তব্যের দায়িত্ব দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে তারা সে মুহূর্তেই অবহিত হল। দুজনের শরীর যেন মিশে এক হয়ে গিয়েছে, দ্বিতীয় জনের যেন অস্তিত্ব নেই।

রামগ্না হাসল। নিরাশার হাসি। হাসিটা ছিল সেদিনের কথা মনে পড়ার জন্য আর আজকের চিন্তাধারার জন্য। দুটো দেহের অস্তিত্ব ছিল না, এই কথাটা সে সাহিত্যিক কল্পনায় বলে নি। বাস্তবে সেখানে একটা দেহ ছিল না। রামগ্নার যখন হুঁশ হল তখন কুমুদ সেখানে ছিল না।

তবু রামগ্নার মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল। সেই ক্ষণিকের অনুভূতি পেয়ে সে গত কয়েকমাসের দুঃখ ভুলেছিল, না—দুঃখ দূর হয়েছিল। তার মনে হল এতদিন তার কাছ থেকে সরে থাকার পর স্বেচ্ছায় তার কাছে থাকতে কুমুদ রাজী হল কেন ?

তবে কুমুদ তাকে আগের মতোই ভালবাসে।

এ বিষয়ে রামগ্নার কোন সন্দেহ ছিল না। কুমুদের গায়ে ঠেকে যাওয়া হাতটাই তাকে এ বিষয়ে ভরসা দিয়েছিল। বলিহারি সৃষ্টিকর্তার বাহাদুরি। দেহকে জড় বলা হয়। কিন্তু এই দেহই কত সূক্ষ্ম, কত গূঢ় অনুভূতি কত শীঘ্র কত সহজে পৌঁছে দেয়। তাইতো মনে হয় যে আমাদের ধারণা ভুল ? দেহ নশ্বর বটে কিন্তু এটা সত্য যে দেহ জড় নয়।

সেদিন তার হাতে ঠেকে কুমুদের শরীর সঙ্গে সঙ্গে কেমন ভাবে সাড়া দিয়েছিল।

সাধারণ নিয়মে হাত ঠেকার ফলে তার শরীর কুঁকড়ে না গিয়ে এমন কোমল হয়ে গিয়েছিল যেন হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেই হয়। শীতে আরাম পাবার জন্য লোকে যেমন গুড়িশুঁড়ি মেরে লেপের তলায় ঢোকে, কুমুদের শরীরটাও যেন তেমনি করে তার আশ্রয়ে আসতে চেয়েছিল।

সেদিনের সেই আশা তার মনে আজও জেগে আছে। তার ধারণা সেদিন সে যতটা দূরে ছিল, ততটা কাছেও ছিল। দু একবার দূরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ইল্যাস্টিক সুতোয় বাঁধা বলের মতন তার কাছেই ফিরে এসেছিল।

কুমুদ তাকে ভালবাসে। তাইতো তার সম্বর্ধনা সভায় যেতে সে রাজী হয়েছে। বলা যায় না আজকের সম্বর্ধনা দেখে তার মন গলতেও পারে।

সেই আশায় সে হাতের ঘড়ি দেখল। উঃ! এখনো আধঘন্টা বাকী। ওরা একটু শীঘ্র এলেই পারে। সময়মত কাজ করার স্বভাব আমাদের দেশের লোকেদের নেই। বলতে বলতে সে জানলার কাছে গেল।

নয়

মোহনের প্রত্যাশায় বসে থাকতে থাকতে কুমুদ হঠাৎ ভয় পেল। রাস্তায় বেশি লোক চলাচল নেই, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সবার ঘরে ফেরার সময় হয়েছে। মানুষ কিন্তু অন্য প্রাণীর মত নয়। কথাটা মনে জাগতেই কুমুদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। মানুষের কাছে শহুরে জীবনের অর্থই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে জীবন কাটানো। প্রত্যেক প্রাণী যখন ঘরে ফিরতে চায় তখন যে লোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে তাকে তো ঘরছাড়া বলতে হয়। তার মোহন একটু বেশি সৃষ্টিছাড়া।

ছেলে বাপের মতোই হয়। সেও তাই নিজের ইচ্ছামতোই চলে। আমি ডাকলে কি আসবে? হ্যাঁ আসতে পারে—যদি খিদে থাকে, বলতে বলতে কুমুদ ভিতরে গেল।

'খিদে পেলেই আসবে' বলার সময় আর একটা কথা মনে পড়াতে কুমুদ মনে মনে হাসল। বাপের মতই তো ছেলে! মনে কোন খেয়াল জাগলেই অপরের কথা না ভেবে খেয়াল চরিতার্থ করার জেদ। ঠিক রামন্নারই মতো। কত সুখ স্মৃতি! তাইতো মন আজও রামন্নার সান্নিধ্য চায়। এ নিয়ে সে কতবার ভেবেছে। রামন্না তাকে ভালবাসে বলে তার বিশ্বাস হয় না। রামন্নার সঙ্গে থেকেও তার কাছ থেকে সরে থাকা। তবু সেই ভাবেই তো চলছে।

মোহন রামন্নারই ছাঁচে গড়া। না—রামন্নার সঙ্গে সুখে কাটানো দিনগুলোর প্রতীক হচ্ছে মোহন। সেই জন্যই মোহনের উপর তার এত টান। শোনা যায় যে মায়ের টান নিঃস্বার্থ হয়। কিন্তু কুমুদের মন তা মেনে নিতে চায় না। মোহনের উপর তার ভালবাসা মোহনের জন্য নয়। মোহনের ভিতর যে রামন্নাকে দেখা যায় তার জন্যই এই টান। তাই প্রথমদিকে মোহনের উপর তার অকারণে রাগ হত। বেচারা! পরের দোষে বেচারা মোহনকে কতবারই না মার খেতে হয়েছে!

একবারের ব্যাপারটা তো কুমুদ ভুলতেই পারে না। সে দৃশ্য আজও তার চোখের সামনে ভাসে। মোহনকে কোলে নিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। সামনে রামন্না কি যেন করছিল। অন্য সব স্বামীর মত সেও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিল। তার চোখ দেখেই কুমুদ বুঝতে পেরেছিল সে কি চায়। তার মনে হল এখন সাবধানে থাকতে হবে। তার কাছে সে তো শুধু ভোগের বস্তু, তারপর এঁটোপাতার মতো ফেলনা। এ ব্যাপারে কুমুদের যে কিছু অধিকার আছে তাও সে ভুলে গেছে। কাজেই তার কথার ফাঁদ এড়াবার জন্য বেশী কথা বলা ঠিক নয়। তখনই শুরু হল মোহনের দুষ্টুমি। আর মোহনকে কোলে নেবার ছলে রামন্নার খেলা।

সেদিন মোহনকে কি মারই না মেরেছিলাম। কেন? কারণটা পরে বোঝা গেল। আচ্ছা মারলাম কেন? কারণ নিজের অস্থিরতা মোহনের দুষ্টুমির ফলে বেরিয়ে পড়েছিল। রামন্নার হাতটা তার গায়ে ঠেকতেই এতদিনকার প্রতিজ্ঞা যেন কোথায় ভেসে গেল। শরীরটা কেঁপে উঠল যেন কতদিন খেতে পায় নি। ঠোঁট ভিজে গেল। বুকটা কেমন করতে লাগল, মনে হল যেন সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। এই সময় মোহনের কান্না শুনে তার হুঁশ ফিরে আসতেই সে উঠে চলে গিয়েছিল।

বেচারা! তার যা হল তাতে মোহনের দোষটা কোথায়? সে সময় মোহনের কথা মনে পড়াতেই সে তাকে জোরে এক চড় মেরেছিল। ওর কান্না বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রাগও বাড়তে লাগল যেন ভিতরের বিদ্বেষ বেরিয়ে আসছে। এর জন্যই অপমানের বোঝা নিয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে! এই রকম কিছু ভেবেই বোধ হয় মোহনকে মেরেছিল।

সে কথা মনে হলে আজও তার কাঁপুনি ধরে। কী মারই মেরেছিাম! যত মারে ততই রাগ বেড়ে যায়। রাগে বোধ হয় সেদিন তার জ্ঞান ছিল না। কখন যে রামন্না এসে তাকে থামাল, সে জানে না। শেষে তার একটা চড় রামন্নার পিঠে পড়ায় তার হুঁশ হল। দেখল, এক হাতে ছেলেকে অন্য হাতে তার হাত ধরে রামন্না দাঁড়িয়ে আছে।

যদি রামন্না সেদিন রাগ করত? তার সঙ্গে ঝগড়া করত? কিন্তু রামন্না কিছুই করে নি। রামন্না রাগ করলে সেও রাগ করত। রামন্না ঝগড়া করলে সেও চেঁচামেচি করত। শেষপর্যন্ত রামন্না যদি তাকে মারত তো সেও ভাল হত। কিন্তু রামন্না

এ সব না করে ছেলেকে কোলে নিয়ে তার হাত ধরে এমন মুখ করে দাঁড়িয়েছিল যেন সে-ই অপরাধী। একবার মনে হল তাকেই এক ঘা বসিয়ে দেয় কিন্তু তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার নিজেরই লজ্জা হল।

সে বলেছিল, 'যদি চাও আমি বাইরে চলে যাচ্ছি', কি প্রসঙ্গে যে কথাটা বলল তা বোঝা গেল না।

তখন সে আবার বলল, 'আমার জন্য তোমার এত কষ্ট হচ্ছে। আমিই বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

উত্তর দিয়ে মন হালকা করার সুযোগ মিলেছে, ভেবে সে বলেছিল—

'আপনার বাড়ী, আপনি কেন যাবেন?'

'কুমুদ, এ বাড়ী যেমন আমার, তেমনি তোমারও।'

'বাড়ী আমার কেন হবে? অসহায় বলেই তো এখানে পড়ে আছি।'

'কুমুদ, কুমুদ, তোমার একথা বলা উচিত নয়।' তার কথার স্বরে মিনতি ঝরে পড়েছিল।

'তবে কেমন করে বলতে হবে? এ বাড়ীতে আমার ছেলের গায়ে হাত তোলবার অধিকারও আমার নেই।' বলতে বলতে তার কান্না পেয়ে গিয়েছিল।'

'এ বাড়ীতে তোমার কোন অধিকারটা নেই, কুমুদ?'

'আপনার বাড়ীও চাই না আমার, অধিকারও চাই না।' বলে সে জোর করে ধরা হাতটা ছাড়াতে চাইল।

'কুমুদ', রামপ্পা হাত না ছেড়েই বলেছিল, 'কুমুদ, আমি বুঝেছি কোনও কারণে তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ। তুমি মুখ ফুটে বল, অসাধ্য না হলে যেভাবেই হোক আমি তা দূর করব। যদি আমি কিছু ভুল করে থাকি…'

'আপনার ভুল! ও বাবা! আপনার কি ভুল হবার জো আছে? আপনি জ্ঞানীগুণী, তার ওপর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। আপনাকে পছন্দ করবার এত লোক থাকতে…'

'কুমুদ, তুমি যদি এমন করে বল তবে আমি কি করি। বাড়িতে তোমার কাছে কখনো কি আমি নিজেকে বড় বলে জাহির করেছি?'

'আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহারই হোক না কেন, তাতে কি এসে যায়? আমি তো খারাপ। অসহায় একটা মেয়ে…'

'কুমুদ, কুমুদ, এমন কথা বলো না। 'খারাপ' শব্দটা মুখে উচ্চারণ করো না। খারাপ তো আমি। আমাকে ঠিক পথে তুমিই নিয়ে যেতে পারো কুমুদ…'

'আপনি বা আপনার পথ কোনটাই আমার দরকার নেই।' বলে জোর করে হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে গিয়েছিল।

হাতের ঝাপটায় বাচ্চা মোহন আবার কাঁদতে লাগল। সে তখন কুমুদের কাছে

আসতে চায়। রামন্নার ভয় হল যে সে হয়তো আবার ছেলেকে মারতে শুরু করবে। এই সময় মোহন কুমুদের কাছে যাবার জন্য বায়না ধরে কাঁদতে লাগল।

কুমুদ নিজেকে সামলাতে না পেরে জোর করে মোহনকে কোলে নিতে গেল।

রামন্না তাকে না ছেড়ে বলল, 'আমি ওকে বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।'

'আপনাকে ঘোরাতেও হবে না, নিয়ে যাবারও দরকার নেই। আমিই নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি, আর ফিরবোও না। আপনি আপনার বাড়ী নিয়ে সুখে থাকুন,' বলে সে দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেল। সেখানে ছেলেকে মেঝের বসিয়ে নিজের জিনিষ গোছাতে লাগল।

হুঁ...' বলে কুমুদ নিঃশ্বাস ফেলে স্মৃতির প্রবাহ থেকে বাইরে চলে এল।

আজ যদি ঐরকম ঘটত তো সে কি করত? বসে থাকতে থাকতে কুমুদের মনে পড়ল। 'ফিরে আসবো না, বলেছিল। তারপরে যে কি হয়েছিল তা মনে পড়ে না। কিন্তু আজও এখানেই রয়েছি। রামন্নার বাড়ীতে, না, নিজের বাড়ীতে, উঁহুঁ, তাও নয়, মোহনের বাড়ীতে। মিথ্যা অভিমানে পাগলের মত কি সব যা তা ভেবে মরছে। এটা রামন্নার বাড়ী, তারও বাড়ী; এইজন্যেই তো এটা মোহনেরও বাড়ী। তাদের দুজনের তপস্যার ফল হচ্ছে মোহন; নইলে মোহন কে?

আজ যে সে ঐরকম করতে পারবে না তার আসল কারণ ভিন্ন। এটা অনিবার্য-ভাবে সে মেনে নিয়েছে। বুঝতে পেরেছে যে, যে কারণে সে আজ সেদিনের মতো কাজ করতে পারবে না সেই কারণেই সে সেদিন ঐরকম ব্যবহার করেছিল।

আসল কারণটা হচ্ছে 'রামন্নার প্রতি তার মনের ভাব। এই কারণেই যে প্রত্যেকবার তার হার হচ্ছে সেটা তার মনে গেঁথে গিয়েছিল।

ন বছর আগের ঘটনাটা ছিল তার প্রথম পরাজয়। 'আমিই ওকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি, আর ফিরবো না'—এই তর্জন গর্জনই ছিল তার হারের প্রথম ঘোষণা।

কেন? এ কথা সে কেন বলেছিল? বেশ ভেবেচিন্তে বলেছিল কি? 'না। কিছু স্থির করে বলেছিল কি? তাও না। মনের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেবার জন্যে? উঁহুঁ—এসব কোন কারণেই নয়।

একমাত্র কারণ ছিল ভয়, নিজের জন্য ভয়, রামন্নার জন্য ভয়।

রামন্নার হাত তার হাতে ঠেকায় সে স্পষ্ট বুঝেছিল যে তাদের সম্বন্ধ জন্ম জন্মান্তরের। শুধু মুখের কথায় সেটা ভাঙা যায় না।

একবার রামন্নাই না বলেছিল দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গল্প?

তখন কুমুদ বলেছিল, 'আমি শকুন্তলা হলে দুষ্মন্তকে কাছে আসতেই দিতাম না।'

'কেন? সে আবার কি করল?' রামন্নার এই প্রশ্নে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

'কী করল? আর কী বাকী থাকল? গোপনে বিয়ে করলেন আর যখন সে গর্ভবতী হল তখন বললেন, আমি আবার কবে তোমায় বিয়ে করলাম? এর মানে কি?'

'বেচারার আর দোষ কোথায়? শাপের জন্যই তো এমন হয়েছিল।

এমন গল্পের কোন মাথামুণ্ড আছে নাকি? কালিদাসও পুরুষ মানুষ আর দুষ্মন্তও তাই।

কিন্তু এ গল্প তো কালিদাস প্রথম লেখেন নি। এটা মহাভারতের গল্প।'

'তিনি এমন বিদঘুটে গল্পই বা বাছলেন কেন? লোকে হাসাহাসি করে না?'

'কেন?'

'আরে! কেন আবার কি? বিয়ের কথা যে ভুলে যায় সে কেমনধারা লোক?'

'তিনি তো মস্ত লোক ছিলেন।'

'থাক্, আর বলে কাজ নেই।'

'কেন কুমুদ? মনে কর কাল আমিও যদি বলি যে বিয়ের কথা মনেই নেই, তবে লোকে আমায় পাগল বলবে না?'

'এর চেয়ে বেশি না বললে আপনার কপাল ভালো বলতে হবে।'

'তাই তো বলছি। যদি আমি বলি তো লোকে পাগল বলবে, কোর্টে মামলা করবে। কিন্তু দুষ্মন্ত তাই করেছিল। তাকে মহৎ লোক বলা হয়েছে, তাকে নিয়ে নাটক লেখা হয়েছে।'

'থামুন; আপনিও তো যা তা বলছেন।'

'না, তুমিই তো বলছিলে যে তুমি শকুন্তলা হলে এমনি করতে।'

'হাঁ, সত্যি, আমি তাকে ঠিক পথ দেখিয়ে দিতাম।'

'তুমি যে তা করতে না, সেইটে দেখাবার জন্যে কালিদাস এই নাটক লিখেছেন।'

'আমি তা করতাম না এইটে দেখাবার জন্যে?'

'অর্থাৎ তুমি যদি শকুন্তলা হতে তবে…'

'কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কথাটা এইভাবে দ্যাখো। দুষ্মন্ত শকুন্তলার বিয়েটা কি করে হলো? দুষ্মন্তের অনেক সুন্দরী রাণী ছিল। শকুন্তলা তো প্রেম, বিয়ে ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই জানত না। দুষ্মন্তও সেখানে শিকার করতে গিয়েছিল। কন্বের আশ্রমের কাছে এসেছে ভেবে তাঁকে প্রণাম করতে গেল।

'ও গল্পের পুরোটাই আমার জানা।'

'শোন, গল্পের মজার ব্যাপারটা তোমায় বোঝাচ্ছি। কাব্যে কোন কল্পনা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ দুজনের দেখা হল। দেখা থেকে পরিচয়, পরিচয় থেকে আকর্ষণ, আকর্ষণ থেকে স্নেহ, স্নেহ থেকে প্রেম হল।'

শেষপর্যন্ত বিয়ে হয়ে গেল…'

'হ্যাঁ, এ সব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে গেল।'

'তা এ সব আমায় বলার…'

'কারণ আছে কুমুদ। বিনা পরিচয়ে, না ভেবে চিন্তে, কোন দরকার না থাকলেও বড়দের অনুমতি ছাড়াই বিয়েটা হয়ে গেল। কেন?'

'দুষ্মন্ত ভাগ্যবান পুরুষ বলে।'

'আর শকুন্তলাই বা কম কিসে? দায়িত্ব দুজনেরই ছিল। দুজনার প্রেমও ছিল সহজ এবং স্বাভাবিক। পৃথিবীর যেখানেই তারা থাকুক না কেন, তাদের মিলন একদিন নিশ্চয় হত। এইটে দেখাবার জন্য কালিদাস এই নাটক লিখেছেন। এরপর সে যখন দুষ্মন্তকে মারীচের আশ্রমে দেখে তখন তার অবস্থা হয়েছিল কণ্বমুনির আশ্রমে প্রথম দর্শনেরই মতন।'

তখন সে বলেছিল, গল্পে যাই লেখা থাক না কেন, আমি কিন্তু এটা বিশ্বাস করি না।' তার মনে হল যে সে কথাটা বিশ্বাস করাবার জন্যই শাস্তিটা হয়তো সে এখন পেল। শকুন্তলার ঐরকম ব্যবহার স্বাভাবিক এ কথা এখন সে মেনে নিয়েছে।

রামন্না তাকে যে পরিস্থিতিতে বিয়ে করেছে তাতে তার ঘরের গৃহিনী হয়ে সংসার ধর্ম না করাই উচিত। রামন্না নিজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এ ছাড়া সরলাদিদিও বারবার সেই কথাই বলেছিল। তাই ওকেও রাজী হতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সরলাদিদি যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন রামন্না মুখ ফুটে এ প্রস্তাব করেনি কিন্তু তার সঙ্গে সহবাসের ইচ্ছা তো ছিল। সরলাদিদির মৃত্যুর পরও রামন্না নিজে থেকে এ প্রস্তাব করে নি। শেষে সে যখন গর্ভবতী হবার কথা বলে তখন সে রাজী হয়। এ সবের মানে কী? মানে হচ্ছে যে রামন্না স্বেচ্ছায় এটা চায়নি বরং জেনে শুনেই তাকে ধোঁকা দিয়েছে। এমন লোকের সঙ্গে কি করে সংসার করা যায়? এ ছাড়া বিয়ে করে উপকার করার বোঝাও চাপিয়ে দিয়েছেন। বিয়েতে রাজী না হলে তো সে স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারত। বিয়ে না করলে তার ওপর কারোও অধিকার থাকত না। এখন তো সে বিবাহিতা স্ত্রী। অধিকারের জোরে সে এখন ভোগ্য বস্তু। যদি বিয়ে না হত? তবে ভোগ্য বস্তুর জন্য তাকে ভিক্ষুক হয়ে থাকতে হত।

যাক সবই সত্যি। ওকে কেউ মানা করে নি, বিয়ের জন্য তার সম্মতির দরকারও ছিল না। কিন্তু সম্মতি দেবার পর নিন্দে করা কি ঠিক?

'নিন্দের ব্যাপার কোথায়? এতো স্ত্রীর ভাগ্য, শকুন্তলার গল্প।' বলে কুমুদ দীর্ঘশ্বাস নিল। কোন দৈব শক্তি যেন তাকে রামন্নার কাছে টেনেছিল। শত চেষ্টা করেও তার প্রভাব এড়াতে পারে নি। বুদ্ধি যায় একদিকে তো হৃদয় টানে অন্যদিকে। যতই দূরে থাকার চেষ্টা করে ওই শক্তিটাই তাকে কাছে টেনে আনে।

তাই সে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। রামন্নার ভোগ্য বস্তু হয়ে তৃপ্তি পেলেও সে যে শুধুই ভোগ্য বস্তু কথাটা মনে হলেই নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হয়।

সে রামন্নাকে যতটা ভালবাসে রামন্নাও যদি তাকে তত—

না, এ ভরসা তার নেই। এই জন্যেই তার ভয় ছিল যে রামন্নার ফাঁদে যেন না পড়ে যায়।

রামন্না কাছে থাকলে তার ভয় বেশি হত। তার স্পর্শ তো···এই জন্যেই না সেদিন বলেছিল, 'আর ফিরবো না।'

তবুও কি ফিরি নি? ফিরেছি, সংসার চালাচ্ছি, ছেলে মানুষ করছি—

হঠাৎ যেন কুমুদের দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল। হাতঘড়িটা দেখল। 'কান্ডটা দেখ তো। এত করে বললাম তবু মোহন এখনও ফিরল না। সভার লোকেরা যদি এসে পড়ে। ছিঃ ছিঃ। কী ছেলে বাবা। না জানি কোথায় গেছে আড্ডা মারতে' বলতে বলতে উঠে সে দরজার কাছে গেল।

দশ

ব্যাপার কী? কিছু দেখা যাচ্ছে না কেন?' বলে রামন্না জানলার বাইরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

পথ জুড়ে গরু মোষ। পিছনে রাখালদের চীৎকার। দুজন লোক আসছে, একজন দাঁড়িয়ে হাসছে। একদল কাক পাখা ঝাপটে অন্য দলের কাছে যাচ্ছে। কুকুর ডাকতে ডাকতে তাদের ধরতে ছুটছে এত সব দেখেও আমি বললাম, 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

মানুষের জগৎ এইটুকুই। তাই বলা হয় যে মানুষ যা চায়, সেটুকুই দেখে। না হলে কিছুই তার চোখে পড়ে না। গুন গুন করতে করতে সে পায়চারি করতে লাগল। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। 'কণ্ডূয়মানাম্···' গুন গুন করতে করতে তার হাসি পেল। 'যাই হোক তার চালাকি সে বুঝতে পেরেছে' বলে হেসে ফেলল। এটা তার একটা অভ্যাস। যদি সে মনের কোন চিন্তা ভুলতে চায় তো গুন গুন করে সংস্কৃত শ্লোক আওড়ায়। আবার যখন সে জোর করে চিন্তাটা তাড়াতে চায় তখন কালিদাসের একটা শ্লোক বারবার আওড়ায়। এখনও সেই শ্লোকটাই গুনগুন করে বলছিল।

কার্যা সৈকতলীন হংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখাবলম্বিত বল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥

এতদিন সে বুঝে এসেছে যে শ্লোকটাতে একটা শান্তিময় পরিবেশ রয়েছে। মালিনী নদীর তটভূমিতে হংস-হংসী মৈথুনরত। ঈশ্বরের পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। পাশে একটা গাছ রয়েছে, তাতে বল্কল শুকোনো হচ্ছে। গাছের গোড়ায় এক কৃষ্ণ মৃগ দাঁড়িয়ে, তাকে এক মৃগী চাটছে।

সাবাস! কালিদাস শকুন্তলার স্মরণে বিরহী দুষ্মন্তের সুন্দর ছবি এঁকেছেন। শ্লোকের অর্থ আর শব্দ পরিবেশের অনুকূল। সৌম্য আর শান্তিপূর্ণ। কেন? জানি না। এই হচ্ছে কালিদাসের প্রতিভা, সরাসরি মনকে প্রভাবিত করে।

গুনগুনিয়ে শ্লোক আওড়াবার অভ্যাসও এমনি এক অবস্থায় হয়েছিল। সেটা সে কখনও ভুলতে পারে না।

কবে? সাত-আট বছর আগের কথা বোধ হয়; একদিন এইভাবে সে জানলার ধারে প্রতীক্ষা করছিল। পরের দিন, তারও পরের দিন—এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তখন সময় এত দীর্ঘ মনে হয়েছিল যেন কত বছর কেটে গেছে। কুমুদ মোহনকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে যখন চলে যায় তখনও রামন্না এই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে। পরে তাদের ফেরার প্রতীক্ষায় এইভাবে না জানি কত ঘন্টা বা কত দিন এইভাবে দাঁড়িয়েছিল। সে ফিরল না। কয়েকবার মনে হল যে তার খোঁজ করতে যাই, কিন্তু সে বেরিয়ে যাবার পর যদি ও ফিরে আসে—এই সংশয়ে পড়ে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে ফিরতে না দেখে হয়তো নিজের পিসীর কাছে গেছে ভেবে একটু শান্তি হল। সে রাতে ঘরে আলো জ্বলল না। দুদিন তার খাওয়া বন্ধ। মাঝে মাঝে মনে হত তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। আবার মনে হত যে যাই করা হোক না কেন সে আর ফিরে আসবে না।

এখন বোঝা গেছে যে দোষটা তারই ছিল। তার মনে হল যে শর্তে কুমুদ ফিরতে রাজী হয়েছিল সে শর্ত ভঙ্গ করবার দোষটা তারই। কিন্তু তার আগে কতখানি আত্মবিশ্বাস নিয়েই না সে শর্ত ভাঙার জন্য তৈরী হয়েছিল!

সেদিনের কথা মনে পড়ায় আজ রামন্নার আবার হাসি পেল। আজ তার বয়স পঁয়তাল্লিশ অর্থাৎ তখন তার বয়স ছিল সাঁইত্রিশ আটত্রিশ, তবু সে সেদিন এক কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকের মত ব্যবহার করেছিল।

'কামী স্বতঃ পশ্যতি!' এই রকম অবিবেকী যুবক দেখেই হয়তো কালিদাস কথাটা লিখেছিলেন। সেদিন যখন সে মোহনকে নিতে গিয়েছিল তখন কুমুদের

গায়ে হাত ঠেকে গেলে তার চোখে খুশির আভাস দেখে সে উৎসাহ পেয়েছিল। কিন্তু তখন কুমুদ বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে জিনিষপত্র গোছাতে গেল। না জানি সে কি করে বসবে। এই ভয়ে সে আধখোলা দরজা দিয়ে সন্তর্পণে দেখতে লাগল। তখন কুমুদ তার ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে। কী জানি কি করবে, দেখাই যাক। ফটোটা হয়ত মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়াবে। সে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছিল। কুমুদ কিন্তু ফটোটা নিয়ে মাথায় ঠেকাল যেন প্রণাম করছে। পরে ছবিটাকে মুখে ঠেকাল। তা দেখে তার মনে হল কুমুদ সত্যিই তাকে ভালবাসে। কোন ভুল ধারণার জন্যে সে রাগ করে আছে। এটা যে কোন উপায়ে দূর করতে হবে।

তখন সে কী বোকাই না ছিল? ভুল ধারণার কারণ সে খুঁজে পেয়েছে এই গর্বেই সে কুয়োর ব্যাং এর মত ফুলে উঠেছিল। ভেবেছিল তার তুল্য বৃহস্পতি।

'কামী স্বতঃ পশ্যতি।'—এই উক্তির ভরসাতেই সে সিদ্ধান্তে এসেছিল। কুমুদের রাগের কারণ হয়তো তার অক্ষরে অক্ষরে চুক্তির শর্ত মেনে চলা। তাকে সে কতো ভালবাসে। সেই কেবল রাগের মাথায় আরোপ করা শর্তটা মেনে বসে আছে। দাম্পত্য জীবন হচ্ছে বয়সের ধর্ম। সে ইচ্ছা তো পাপ নয়, অনিষ্টকরও নয়। স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ সৃষ্টির নিয়মে উচিত বটে তবে বয়োধর্মের জন্য প্রভেদ নেই। এই সিদ্ধান্তের ফলে সে নিজেকে দ্বিতীয় বাৎসায়ন বলে ভেবেছিল।

আজ সাত আট বছর পরে মনে হচ্ছে যে তার সেদিনের সিদ্ধান্তে আর ব্যবহারে যেন নিলর্জতার সীমা ছিল না। উচিত শাস্তিই সে পেয়েছিল। কুমুদের দরজা সারারাত খোলাই ছিল তবু সেদিকে উঁকি মারবার সাহসটুকুও তার ছিল না। এমনি শাস্তিই সে পেয়েছিল।

কুমুদ যে ঐ কথা বলবে তা সে কল্পনাও করে নি। কল্পনাতেও যদি কথাটা আসত তো সে তার সঙ্গে কথাও বলত না।

হয়েছিল কি? 'কামী স্বতঃ পশ্যতি!' কামান্ধ হয়ে সে যেন অনুকূল সাগর সাঁতরে পার হয়ে গেছে ভেবে সে কথাবার্তা শুরু করেছিল।

'কুমুদ।'

সে চকিত হয়ে তাকে দেখল। তার মুখে এক অদ্ভুত হাসি। তখনি তার বোঝা উচিত ছিল। হাসিতে সৌম্যতার চিহ্ন ছিল না।

'কুমুদ?'

'ভিতরে আসুন।'

'কুমুদ, কুমুদ। যা হয়ে গেছে তা ভুলে যাও। এ তো আমারই দোষ। আমি স্বীকার করছি।'

'আপনার মত প্রগতিশীল একে দোষ ভাবেন?'

'হ্যাঁ, কি বললে?'

'না, আগেকার লোকেরা এমন কথা বলে, কিন্তু আপনি ...'

'কী? কোন্ কথা? তুমি কোন্ বিষয়ে বলছ?'

'বেশ্যাকে বিয়ে করা।'

'কুমুদ!' এমনভাবে সে বলল যেন তার পিঠে চাবুক পড়েছে।

'স্ত্রীকে ভাল না বেসে তার সঙ্গে সহবাস করলে সেটা বেশ্যার সঙ্গে শোয়ার মতো। কথাটা আপনিই...'

'কুমুদ, কুমুদ, এ সব কথা বলে আমায় শাস্তি দিচ্ছ কেন? তোমায় ভাল না বাসলে কি তোমায় বিয়ে করতাম? অনর্থক চিন্তা করে...'

'আমার ছেলে হয়েছে বলে আপনাকে দায়ী করছি না। এবার তো স্বস্তি পেয়েছেন?'

'কুমুদ, জানি না কেন তুমি এই সব যা তা ভাবছ...'

'আমার ভুল হয়নি। এ সময় কেন আপনি এসেছেন তা আমি বুঝেছি। একে আপনি ভুল বলবেন? তবে একটা কথা। আপনার তৃপ্তির পথে আমি বাধা দেব না। আপনি যে এখন আমার কাছে এসেছেন সেটা কি আমি আপনার বিবাহিতা স্ত্রী বলে সেই অধিকারে? না আমাকে আপনার প্রতি আসক্ত এক স্বেচ্ছাচারিণী ভেবে? আপনি যেভাবে বলবেন সেইভাবেই অভিনয় করতে আমি রাজী।'

এই কথা বলে সে আলো নিভিয়ে দিল। তখন রামণ্ণার মনে হল অন্ধকার কত ভয়ঙ্কর হতে পারে। থাকলেও ভয়, পালাতে গেলেও ভয়। পালাবার উপায় না দেখে সে দমে গেল।

এর পর কুমুদ ঘর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে তাকে মুখ দেখায় নি।

তার মনে পড়ল, সে বলেছিল আপনি আমায় ভালবাসেন না। আচ্ছা, তার কি তখন বলা উচিত ছিল, 'না কুমুদ, আমি তোমায় ভালবাসি।' এটা তো শুধু কথার কথাই হত। তার সেই মানসিক অবস্থায় সে কথাটা বিশ্বাসই করত না। সে বিশ্বাস করত কি না করত তার বিচার কি করে হবে?

কুমুদকে তখন কি সে ভালবাসত?

অথবা আজও কি তাকে ভালবাসে?

রামণ্ণা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আবার জানলার বাইরে তাকাল। ঘাম না থাকলেও সে মুখ মুছে চেয়ারে বসে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। 'দুজনকে একসঙ্গে ভালবাসা সম্ভব আর সেটা বিশ্বাসঘাতকতাও নয়। 'তুমি যদি এ কথাটা মেনে নাও, তবে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, সরলা।' কথাটা সে দেয়ালে টাঙানো সরলার ছবিটাকে বলল।

ছবিটাকে মন দিয়ে দেখে সে হতাশায় মাথা নাড়ল।

'তুমি কি উত্তর দিতে পার না ?' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিন্তায় ডুবে গেল।

'আচ্ছা, সম্ভব কি না, এইটে তুমি বল, বিশ্বাসঘাতকতা কি না সেটা আমি বলব', বলে সে আবার ছবির দিকে চেয়ে রইল।

সাত আট বছরের অভিজ্ঞতায় তার এখন দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে বিশ্বাসঘাতকতা না করেও দুজনকে ভালবাসা সম্ভব।

কুমুদকে যে এখন সে ভালবাসে তাতে তার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাকে কি করে একথা বলা যায়? তোমাকে ভালবাসি বললেই যে কুমুদ সেটা বিশ্বাস করে সান্ত্বনা পাবে, এ ভরসা তার নেই। যে স্ত্রীর প্রত্যাশা যে শুধু মাত্র তাকেই ভালবাসা উচিত সে সমস্যার সমাধান কি ঐ কথা বলতেই হবে?

কুমুদকে যে সে ভালবাসে তা সে জেনেছিল যখন কুমুদ দ্বিতীয়বার বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। তখনো জানলা দিয়ে তাকাবার সময় তার মনে হয়েছিল যে 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' এখন আবার ভালো করে দেখে মনে হল যেন কিছু দেখা যাচ্ছে। তারপর আরও কয়েকবার তাকিয়ে দেখল যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তার অন্তর আর বাহির দুইই শূন্য। না, ভালো করে তাকিয়ে বোধ হল যে কুমুদ আসছে। আসলে সেটা দৃষ্টির সামনে না বলে মনের সামনে বলাই উচিত। কেন না, মন না থাকলে কোন জিনিষই চোখে দেখা যায় না। সেদিনের অনুভূতি থেকে রামন্নার ধারণা হয়েছিল যে সে কুমুদকে ভালবাসে। এদিকে মনে অন্য চিন্তাও উঁকি মারছিল যে এতদিন সরলাকে ভালবেসে এখন কুমুদকে ভালবাসা আত্মপ্রবঞ্চনা নয় তো!

এক অভিজ্ঞতার ফলে তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছিল যে এটা আত্মপ্রবঞ্চনা নয়। কুমুদ চলে যাওয়ার পরে সে একটা উপন্যাস লিখছিল। লেখার সময় তার মনে হত যে কুমুদ আর সরলা দুজনেই তার কাছে আছে। তাদের কাছে পাবার ইচ্ছায় ঘন্টার পর ঘন্টা সে লিখে যেত। যাই হোক একদিন লেখা শেষ হল। কয়েকজনকে পড়ে শোনাল। তারা ভালো বলায় সেই উপন্যাস শীঘ্রই ছেপে বার হল। বাব্বা! সমালোচকদের কত প্রশংসা। পাঠাগারে নানান কাগজে প্রকাশিত এই সব লেখা পড়ে সে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসেছিল।

ঘরে আসতেই বলতে শুরু করল, 'কুমুদ, কুমুদ, আমার উপন্যাসটার……' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কুমুদ সেখানে কোথায়? তার মনেই ছিল না যে কুমুদ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। তবু নিজের আনন্দের ভাগ দেবার জন্য কেন সে কুমুদ বলে ডেকেছিল?

আজ সে প্রশ্নের উত্তর সে জানে, সে কুমুদকে ভালবাসত। মাঝে মাঝে তার মনে

এক প্রশ্ন জাগত। স্ত্রী আর সন্তানকে যদি নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা যায় তবে দুজন স্ত্রীকে কেন ভালবাসা যায় না।

অনেকদিন পর্যন্ত এ প্রশ্নের মীমাংসা সে খুঁজে পায় নি। মীমাংসায় বাধা ছিল স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সম্বন্ধটা। তার ধারণায় এটা ভুল। স্বামী স্ত্রীর প্রেম যে বিছানায় সীমিত এটা মনে করাই ভুল। প্রেমের লক্ষণ অন্য কিছু। প্রেমের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ভাবলে সমাজ বেশ্যাদের ধিক্কার দিত না। তবে কি বলা যায় যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে দৈহিক সম্পর্কটা প্রধান নয়? যদি এটা মুখ্য না হয় তবে অনেক সমাজে এর অভাব বা অযোগ্যতাকে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ মেনে নেওয়া হয় কেন? রামন্নার কাছে একদিন এ সমস্যার সমাধান হল। দৈহিক সম্ভোগ স্ত্রী পুরুষের জন্য প্রকৃতি দত্ত একটা দায়িত্ব। বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যই এই দায়িত্ব। সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা নির্বুদ্ধিতা বলা যায় উদ্দেশ্যটাকে কর্তব্য মনে করলেই সেটা স্বাভাবিক ধর্ম হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্যটা আর কিছুই নয়, শুধু প্রকৃতির নিয়ম পালন করা। সৃষ্টি তো চিরন্তন যুবা, তার কাছে বার্দ্ধক্য নেই, মৃত্যুও নেই। বার্দ্ধক্যে খোলস ছাড়ার মতন মৃত্যুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পুরাতনের মধ্য দিয়ে নতুন কুঁড়ি ফোটে। দায়িত্বটা পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভাগ করা আছে। সেইজন্য কামতৃপ্তি যে কোন নারীকে দিয়ে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির তৃপ্তির জন্য ভালবেসে বিয়ে করা স্ত্রী চাই।

আচ্ছা, তার আর কুমুদের সম্বন্ধটা কেমন?' কুমুদের উপর টান তো তার কামবাসনা তৃপ্তির জন্যই হয়েছিল। কুমুদের সঙ্গে বিয়েটা হয়েছিল লোকাচার বজায় রাখবার জন্য।

এ সব সত্য। আজ কুমুদ তার সামনে নেই, তবু সে তাকে যেন টানছে। তার সঙ্গ পেলেই শান্তি মেলে। এক বছরের বেশি হয়ে গেল। তার সঙ্গে সম্পর্ক, কথাবার্তা এমন কি ঝগড়া পর্যন্ত ভাল লাগত। কিন্তু আজ এ সব ভেবে কি লাভ?

কয়েকমাস পরে শেষপর্যন্ত সে শান্তি ফিরে পেয়েছিল। ইতিমধ্যে কুমুদ দ্বিতীয়বার তার বাড়ীতে ফিরে এসেছিল। কেন? তার সঙ্গে এখন কিভাবে চলতে হবে? আবার তার সাহস উপে গেল। আজও তার অবস্থা ঐরকম। সে ভাবল যে একবার যদি মন খুলে ওর সঙ্গে কথা বলে মনের সব কথা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারি তবেই কেল্লা ফতে হবে। কিন্তু মুস্কিলের কথা হচ্ছে যে কুমুদের সঙ্গে কথা বলার সাহস তার নেই। সেই সঙ্গে ভয় হয় যে কুমুদ যদি আবার বাড়ী ছেড়ে চলে যায়......'

ছিঃ! ওসব কথা ভাবছি কেন? আজকের সভায় সঙ্গে যেতে রাজী হয়েছে না? সেখানে সব দেখে শুনে যদি তার মন গলে যায়, তবে আর আমায় পায় কে?

হাতঘড়িটা দেখে আবার চেয়ার থেকে উঠল। সভায় যেতে দেরী হচ্ছে। কুমুদের সঙ্গে মোহন যায় তো ভালো, কিন্তু ছেলেটাতো এখনও ঘরে ফিরল না। তাই সে আবার জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগল।

এগার

দরজায় দাঁড়িয়ে কুমুদ মোহনের চিহ্ন দেখতে পেল না। কি ব্যাপার? সকাল থেকেই কোন ভাল লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, অবশ্য খারাপ কিছুও হয় নি। কোথাও কিছু অমঙ্গল ঘটেছে কি ঘটবে বলে মনে ভয় দানা বাঁধছিল। মাঝে মাঝে মাথা তুলে ভাবছিল যে বাইরে বেরিয়ে দেখবে কি না। মোহন ফিরলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সেও কি পাগল হল? মোহন নিশ্চয় চলে আসবে। অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছি। ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মেতে আছে বোধ হয়। তবু তাড়াতাড়ি ফিরলেই ভাল হত। ধুলো কাদা মেখে দেরি করে ফিরে, 'আমিও যাবো' বলে যদি জেদ ধরে? যাক্ গে, এমন কী কাজ যে সময়মত পৌঁছতেই হবে? সভা তো আমাদের জন্যেই। সমস্ত ব্যাপার তো আমাদেরই জন্যে।

'আমরা! আমাদের জন্যে।'

সেদিনের সমারোহের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে কুমুদের অদ্ভুত লাগছিল। সে ভাবল, পাগলী, এর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? সভা হচ্ছে রামপ্পাকে নিয়ে সম্মান দেখাবার জন্য। সে তো শুধু রামপ্পার স্ত্রী বলেই যাচ্ছে। স্বামীর সম্মান দেখে আনন্দ পাবার জন্য, না ঈর্ষা করবার জন্য? স্ত্রীকেও আমন্ত্রণ করার একটা প্রথা চলে আসছে। এসব সভায় যেতে কুমুদের ভালো লাগে না। স্ত্রীদের যদি বিন্দুমাত্রও আত্মসম্মান বোধ থাকে তবে এই সব সভায় যেতে অস্বীকার করা উচিত। এতদিন সে তাই বলত। স্বামীকে যখন সম্মান দেখানো হয় তখন দর্শকেরা তার স্ত্রীকে দেখে। তাদের কেউ কেউ মুচকি হাসে। কিছু লোক পাশের লোকের সঙ্গে ফিসফিস করে কিছু বলাবলি করে। স্ত্রীরা তখন অপ্রতিভ অবস্থায় পড়ে ভাবে যে সভায় না এলেই ভালো হত। এ সব জেনেও সে আজ সভায় যেতে রাজী হয়েছে। কারণটাও তার অজানা নয়। উদ্যোক্তারা বহু অনুরোধ করে তার সম্মতি আদায় করেছিল। 'আপনার কাছে আমাদের একটা প্রার্থনা আছে, আমাদের প্রার্থনা আপনি মঞ্জুর করবেন তো? আপনাকে সম্মান দেখিয়ে তো আমরাই সম্মানিত

হব।' তাদের আপনি আপনাকে' শব্দের ব্যবহারে মনে হচ্ছিল যেন দুজনকেই সম্মানিত করা হচ্ছে। কিন্তু সম্মানটা যে দুজনের নয় এটা সেও জানে আর তারাও জানে। তারা বড় জোর বলবে যে ইনি রামণ্ণার স্ত্রী। দুর্ভাগ্য ওদের! ওরা আর কতটুকু জানে?

কুমুদের মনে হল যেন কেউ তাকে ব্যঙ্গ করছে। সে নিজের মনেই বলল, 'ওরা তো জানে না যে একদিন একমাত্র রামণ্ণার সাহিত্যের প্রেরণা ছিল।' যারা পশুর মত জীবন কাটায়, তারা যদি অপরকে নিজেদের মত ভাবে তবে তাদের দোষ কি? শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষের জীবন কি ভাবে কাটে তা কুমুদের জানা ছিল। স্বামী সারাদিন কাছারি বা চাকরির পিছনে ঘুরে ক্লান্ত হলেই ঘরের দরকার হয়। কিছু খাওয়ার পর ফূর্তি করতে হোটেলে যাওয়া, ক্লান্ত হলেই শোবার জন্য ঘর। মনোরঞ্জনের ইচ্ছা হলে সিনেমা আর তারপরে কামতৃপ্তির জন্য ঘর। প্রেম করতে ইচ্ছা হলে পার্কে পরস্ত্রীরা তো আছেই। এই সব সংসারে স্বামী স্ত্রীর আলাপ প্রায় ক্ষেত্রেই কলহের ভূমিকা হয়ে যায়। অনেক সংসারে স্বামী গৃহস্থালি কাজে উপেক্ষা দেখায় তবু সন্তানের জন্য বিয়ে বলে অল্পবয়সের স্ত্রীকে আজও বাধ্য হয়ে স্বামীর মা কিংবা বোনের মতো সংসারে পড়ে থাকতে দেখা যায়। শিক্ষিত অশিক্ষিত সব নারীর ভাগ্যই একরকম। অশিক্ষিত মেয়েরা বরং সুখী। তারা গতর খাটিয়ে নিজের পেটের ভাত জোগাড় করে আর পছন্দমত স্বামীর সঙ্গে ঘর করে।

রামণ্ণার একটা কথা মনে পড়ে কুমুদের হাসি পেল। এই বিষয়ে আলোচনা করবার সময় রামণ্ণা উত্তেজিত হয়ে বলেছিল—নারীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব দেখাবার জন্য পৌরুষ থাকা দরকার। কথাটা শুনে সে হেসে ফেলেছিল। প্রথমে রামণ্ণা বুঝতে পারে নি; পরে সেও বুঝতে পারল। হাসতে হাসতে দুজনের পেট ফাটবার উপক্রম।

একসময় রামণ্ণার সঙ্গে যে তার কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল সে কথাটা মনে পড়ায় সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সে ঘনিষ্ঠতা কতখানি? দুটো শরীর যে আলাদা তা মনে থাকত না। সে কথা ভেবে আগে সে কত ভয় পেত। একবারের কথা মনে পড়ায় সে কেঁপে উঠল।

মোহন তখন পেটে। এটা কিছু অঘটন নয় জেনেও সে অস্থির হয়ে পড়েছিল। মেয়েদের এটা সাধারণ ব্যাপার; সন্তানধারণই নারীত্বের সফলতা ইত্যাদি নানা কথা বলে রামণ্ণা তাকে ভরসা দিয়েছিল। কিন্তু তার ভয় থেকেই গেল আর থাকবে নাই বা কেন? একটা বালির কণা কি একটা ছোট্ট কাঁটা শরীরে ঢুকে গেলে কত কষ্ট হয়। আর এটা না জানি কেমন ভেবে কুমুদ প্রথম থেকেই ভয় পেয়েছিল। ছেলে হবে কি মেয়ে হবে সে ভয় তার ছিল না, ভয় ছিল যে অন্য কোন রকম না হয়। কিন্তু এর

থেকেও বড় ভয় ছিল যে সে যদি না বাঁচে ? একটু এদিক ওদিক হওয়ার ফলে সে যদি মরে যায়—এ সব কথা মনে হলেই গর্ভের সন্তানের ওপর তার রাগ হত। মনে এক অদ্ভুত বিরক্তি। কখনো রামণ্ণার উপর রাগ হত। কার কীর্তি আর ভোগে কে ? তার মনে হত যে নারীজাতির প্রতি এটা একটা অন্যায় করা হচ্ছে। ওঁর ভাব দেখে মনে হয় যেন কিছুই ঘটে নি। নিজের বিরক্তি দেখাবার জন্য সে রামণ্ণার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে থাকত। সে যতই এপাশ ওপাশ করুক না কেন, রামণ্ণার গাঢ় ঘুম ভাঙত না। আবার নতুন ভয়ও উঁকি মারত—রামণ্ণা কি তাকে আর ভালবাসে না ? তার শরীরের অবস্থা দেখে রামণ্ণার মনে বিকর্ষণ আসে নি তো ? তার উপর রামণ্ণার ভালবাসা কি এখানেই শেষ হল ? শুয়ে শুয়ে মনে যখন এই সব চিন্তা আসত, তখন ঘুমের ঘোরে রামণ্ণার হাত তার পেটে ঠেকে গেলে সে কেঁপে উঠত। তখন সব চিন্তা ছেড়ে সে রামণ্ণার দিকে পাশ ফিরে তার মুখে গালে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুমিয়ে পড়ত।

এ সব কথা স্মরণ করে আজও গলা বুঁজে আসে। তাদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে অপরের কি কোন ধারণা হতে পারে ? পেটে মোহনের বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার চলাফেরা কমে এল। রামণ্ণাও খুব খুশি। তার সাবধানতার বহর কত ! 'দ্যাখো, ওপরে উঠতে যেও না। আরে ! ভারী জিনিষ তুলছ কেন ?' এই সব কথা শুনে তার হাসি পেত। সে কি করে জানবে যে ভারটা পেটের ভিতরেই আছে, বাইরে থেকে চাপানো নয়, শরীরের একটা অঙ্গের মতই স্বাভাবিক। তখন সে বুঝতে পেরেছিল যে পুরুষ মানুষ অনভিজ্ঞ বালকের মত হয়ে থাকে। অস্বস্তিবোধের জন্য এক রাতে তার ঘুম আসছিল না। তাই সে আলো জেলে বিছানায় বসে ছিল। রামণ্ণা পাশে শুয়ে। গাঢ় ঘুমে পুতুলের মত নিশ্চল। বাঁ হাত মাথার নিচে। বাঁ পাশে শোয়ার জন্য ডান হাত গায়ের ওপর। সে উঠে বসে তার হাতটা নিজের ঊরুতে রাখল। তারপর হাতটা নিজের দু হাতের মধ্যে নিল। তার হাতের গরমে নিজের হাত দুটো গরম হয়ে গেল। তখন তার হাতটা নিজের পেটের উপর রাখতেই হঠাৎ চোখে যেন অন্ধকার দেখল। বিজলীর চমকের মতো রামণ্ণা যেন তার পেটের মধ্যে অদৃশ্য হল। সত্যিই রামণ্ণা যেন তার পেটের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করছে। ভয় পেয়ে সে রামণ্ণার হাত জোরে চেপে ধরাতে রামণ্ণাও 'কী, কী হলো কুমুদ ?' বলে উঠে বসল। তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কুমুদের মুখে আনন্দের ভাব ফুটে উঠল। তাকে ভালো করে দেখে তার পেটে হাত বুলিয়ে রামণ্ণা হাসিমুখে বলেছিল, 'ওহঃ, এই ব্যাপার !' পেটের ভিতরের জীব প্রথমবার নড়াচড়া আরম্ভ করেছিল।

'সে হচ্ছে আমার মোহন ! না, না, আমাদের দুজনের মোহন। সেদিন থেকেই রামণ্ণা আর মোহন তার কাছে এক হয়ে গিয়েছিল।

সেই মোহনকে একদিন সে না মেরেছিল ? রামণ্ণা আর মোহন একই বলে কি তাকে

মারা রামন্নাকে মারা হলো না? সে জন্যেই হয়তো মোহনের মার খাওয়ায় রামন্না কষ্ট পেয়েছিল।

হতাশায় কুমুদ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেন কতো দিনের পুরোণো সব তিক্ত স্মৃতি একেবারেই বের করে ফেলে দিতে চাইছে।

সেদিন সে বলেছিল, 'আর ফিরে আসবো না।' কিন্তু তবু তো ফিরে আসার পর কটা বছর কেটে গেল। বছর নয় তো যেন যুগ।

সেও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কথাটা মনে পড়লে হাসি পায়। সেদিন তো বেশ ঝগড়া করে মোহনকে নিয়ে চলে গিয়েছিল? কোথায় গিয়েছিল? আবার সেই পিসীর বাড়ী।

ভোরে পিসীর বাড়ী পৌঁছেছিল। এক কোলে মোহন অন্য হাতে একটা ছোট ব্যাগ। বুড়ী তখন নানা স্তোত্র আউরে উঠোনে জলছড়া দিচ্ছে। তাদের উপর বুড়ীর নজর পড়েনি।

শেষে 'পিসী' ডাক শুনে ঘুরে তাকিয়ে বুড়ী তাদের দেখতে পেল। প্রথমে তো তাদের আসা বিশ্বাস করতে পারে নি। চোখে ভাল দেখতে পায় না বলে ভাল করে দেখে বলল, 'কে? কুমদী?'

'কি ব্যাপার কুমদী? কোন খবর না দিয়ে? একলা এলি নাকি?'

দুজনে কথা বলতে বলতে ঘরে এল। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা মোহন কোথায় এসেছে বুঝতে না পেরে একবার তাকে আর একবার বুড়ীকে দেখতে লাগল। তাদের কথাবার্তার মধ্যে সে কোল থেকে নামতে চাইছিল। সে তাকে চেপে ধরায় মোহন কাঁদতে লাগল।

'কি ব্যাপার? আবার হবে টবে নাকি?'

প্রথমে কুমুদ পিসীর কথাটা ঠিক বুঝতে পারে নি। কী হবে?

'কী বলছ পিসী?' বুঝতে না পেরে সে জিজ্ঞাসা করল।

পিসী বলল, 'ছেলে কাঁদছে কি না-তাই বলছি।'

ততক্ষণে সে মোহনকে কোলে নিয়ে বসে পড়েছে আর মোহনও শান্ত হয়েছে।

সে বলল, 'ছেলে কাঁদছে বটে কিন্তু তুমি আর কি জিজ্ঞাসা করছ?'

'অন্য কিছু নয়, বলছি তোর আবার ছেলেপিলে হবে নাকি?'

'ই-শ্—! আমি কি পাগল হয়েছি না কি?'

'বেশি বয়সে বিয়ে পাগলামি ছাড়া আর কী?'

'ছেলে কাঁদার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি?'

'মায়ের দুধ খাওয়া ছেলে কোলে থাকার সময় পোয়াতি হলে ছেলে এমনি কাঁদুনে হয়।'

এটা তত্ত্বজ্ঞান, না শাস্ত্রজ্ঞান, না অভিজ্ঞতার জ্ঞান তা বুঝতে না পেরে কুমুদ হেসে উঠল।

'হাসলি কেন?'

'তোমার কথা শুনে হাসি পেল, পিসী।'

'এতে হাসির কি আছে? শুক্রবারে শুক্রবারে আট দিন হলো স্বামীর ঘরে গেলি আর এর মধ্যেই ফিরে এলি, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।'

সে হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'তোমার আর কোন চিন্তা নেই পিসী?'

'বিয়ের পর ছেলের জন্ম দেওয়াই হচ্ছে প্রথম কাজ। তবে কিনা আজকালের মেয়েরা বিয়ের আগেই ছেলের জন্ম দিয়ে দ্বিতীয় কাজ করে ফেলে।

বাবা! বুড়ী কেমন সহজে কথাটা বলেছিল।

'সবাই কি এক রকমের হয়? আজকের মতো সেকালেও তো খারাপ কাজ হতো।'

'সেকালে লোকেদের চক্ষুলজ্জা ছিল। বেসামাল অবস্থায় পড়লে তারা নদী-নালায় ঝাঁপ দিয়ে মরত। একালে তো সে সাহস নেই, বেসামাল হলে বিয়ে করে ফেলে।'

'কেন পিসী?' আমি কি এত খারাপ?'

'ওরে পাগলী! আমি তো কথার কথা বলেছি। আমার কথায় কি কান দিতে আছে।'

পিসীর কথার মধ্যেই সে কান্না থামাতে না পেরে ফোঁপাতে লাগল।

আজ মনে হলে হাসি পায়, কিন্তু সেদিন তার কান্না দেখে বুড়ী থতোমতো খেয়েছিল।

'ওমা! কুমুদী, আমার পোড়া জিভে আগুন। বুড়ীর কথা কি ধরতে আছে? একটা গল্প বলি শোন। নিজের মাথায় সিঁদুর ছিল না, তাই অন্যের মাথায় সিঁদুর দেখে জিজ্ঞাসা করল যে মাথায় কেটে গেছে নাকি? একলা থেকে থেকে আমার আবোল তাবোল বলার অভ্যাস হয়ে গেছে। তোর স্বামী চিরজীবি হোক। ভগবান তোকে আরো চারটে ছেলে মেয়ে দিন। আমি বেঁচে থাকলে আমার কাছেই খালাস হতে আসিস্।'

বুড়ীর কথা শুনে কুমুদ কান্না ভুলে হাসি আটকাতে পারল না। তখন বুড়ী রাগ করে বলেছিল—

'আরে! যখন খুশি কাঁদলে আর যখন খুশি হাসলে তোর সঙ্গে কথা বলি কি করে বল তো।'

'না পিসী ও কথা নয়। বলছি যে ওসব কিছু নয়' চোখ মুছতে মুছতে সে বলেছিল।

'এখনি নাই বা হল, শীগগির হবে। তোর বয়েস কম। ভাবনার কি আছে?

'না পিসী, আমি ও কথা ভাবছি না আর ও সব হবেও না।'

'ওটা কেবল কথার কথা।'

'না, সত্যি বলছি, আর হবেই না।'

'তার মানে কি?'

মানে সেও জানত না। তখন সে চিন্তা তার মাথায় আসে নি। তবু মনের কথা যেন প্রথম সুযোগ পেয়েই মুখ থেকে বের হয়েছিল। বলতে বলতেই তার মনে হল যে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। উত্তর দিতে গিয়ে সে কি বলবে ভেবে ঠিক করতে পারল না।

'আরে! কি বলবি তাই ভাবছিস? তার চেয়ে বল্ না যে মিয়া-বিবির ঝগড়া হয়েছে।' বলতে গিয়ে পিসীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

তার কথা বুড়ী বুঝতে পারে নি ভেবে সে স্বস্তি পেল আর মনের কথা বেরিয়ে যাওয়াতে মনটাও একটু হালকা হল।

কিংবা হয়ত সে সব কিছু জানত।

কিংবা বুড়ী হয়তো কিছুই জানত না।

কিন্তু রামন্নার কাছে ফিরে যাবার প্রেরণা বুড়ীই যুগিয়েছিল।

পুরোণো স্মৃতি তাকে কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আজ এ সব কথা মনে পড়ছেই বা কেন?

কেন? জানি না কেন বুড়ীর কথা আজ বার বার মনে পড়ছে।

মনে পড়ে না সে আর কি কি বলেছিল। প্রথমে তার কথায় মজা পেয়ে সে হেসে উঠেছিল কিন্তু পরে সেই কথাগুলোই তাকে নাড়া দিয়েছিল। কি যেন বলেছিল? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কথাপ্রসঙ্গে বুড়ী একবার জিজ্ঞাসা করেছিল—

'তোর স্বামী কি করে রে?'

'বই লেখেন।'

'আমি ও কথা জিজ্ঞাসা করছি না—পেট চলাবার জন্যে কি করে?'

কুমুদের হাসি পেল। সে হেসে বলল, 'কেন পিসী, বই লিখলে কি পেট চলে না?'

'আমি কি এসব বুঝি? আমাদের কালে জমিজমা দেখাশোনা, টাকা পয়সার লেনদেন, চাকরি এই সব ছিল, লোকে তাই করতো। বুঝি না বাপু আজকাল লোকেরা কেমন কেমন সব কাজ করে।'

'বই লিখলেও অন্য লোকের মতো মান সম্মান হয় পিসী।'

'এ আর বেশি কি? চালচলন ভাল হলে সব জায়গাতেই সম্মান মেলে। আচ্ছা, ও তো বই লেখে, তা ওকে মাসে কত করে দেয়?'

'পিসী, লেখা কি মাস মাইনের হিসেবে হয়? যখন লেখবার ইচ্ছে হয় তখন লেখে।'

'তা বাকী সময়ে কী করে পেট চালায়?'

'বাপ দাদার আমলের জমি জমাও আছে।'

'আরে পাগল! এই কথাটা তো আগে বলতে হয়। এই থাকলেই ঢের। তা ঘরে কি অনেক লোকজন আছে?'

'না, আর কেউ নেই, আমরা দুজনেই থাকি।

'সে কি? তুই তাকে একলা ফেলে চলে এসেছিস?'

তার মাথায় এ কথা আসে নি বলে সে উত্তর দিতে পারল না। কথায় কথায় বুড়ী হেসে উঠল।

'কি পিসী? কি হল?'

'একটা কথা মনে পড়ে গেল'

'কি?'

'কত কি। পুরোণো কথার জাবর কাটা ছাড়া বুড়ীর আর কাজ কি?'

'কিন্তু হাসলে কেন পিসী?'

শেষ পর্যন্ত জোর করে বুড়ীর গল্পই শোনা গেল।

'একবার আমিও তোরই মতো রাগ করেছিলাম। সেই মজার কথাটা মনে পড়ে গেল।

'মানে—আমার মতো।'

'দ্যাখ কুমুদ, পুরুষ মানুষের [রাগ একরকম আর মেয়েদের রাগ অন্যরকম।'

'কেন? মেয়েরা কি মানুষ নয়?'

'হ্যাঁ; কিন্তু মেয়েদের তো ছেলেদের মতো গোঁফ গজায় না। ছেলেরা মানুষ হয় বলে মা হতে পারে না। জানি না ভগবানের এ কি লীলা। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা রূপ। পুরুষ বাইরে দশজনের সঙ্গে কাজ করবার সময় রাগ করে, ঝগড়া করে কিন্তু পরদিন তা ভুলে যায়। কিন্তু আমরা তেমন নই। আমাদের রাগ হলে সেটা মনে রেখে কষ্ট পাই।'

'তা পিসী, তুমি কি খুব জেদী ছিলে?'

'ছেলেদের রাগ নাকের ওপরে আর মেয়েদের রাগ উনুনের ওপরে।'

'তা হলে তুমি কি রান্না বন্ধ করলে?'

'ও বাবা! আমি কি ঘরে তোর মতো একলা ছিলাম? ঘর ভরা লোক। না রাঁধলে কি চলত নাকি?'

'তবে রাগ হলে কি করতে?'

'মেয়েরা কি আর করতে পারে। বিছানা আলাদা করে শ‍ুতাম। কথা বলাবার হাজার চেষ্টাতেও কথা বলতাম না···।' ···এই বলে ব‍ুড়ী জোরে হেসে উঠেছিল।

'কোন হাসির কথা মনে পড়ল পিসী?'

'হাসির কথা নয়, বলছিলাম না তোরই মতন? দ্যাখ কুম‍ুদ প্রত্যেক প‍ুর‍ুষের স্বভাব আলাদা রকমের। কিন্তু মেয়েরা তেমন নয়। ঘরে তাদের কাজ শ‍ুধ‍ু খাটা আর খেটেই যাওয়া। নিজের ঘরে যখন খেটে মরে তখন ইচ্ছে হয় যে কর্তা বল‍ুক—'বড় বেশি কাজ পড়েছে? মাথা ব্যথা করছে? এখন থাক একটু জিরিয়ে নাও।' সে কাজ বন্ধ করত না বটে কিন্তু একজন তার কথা ভাবছে মনে করে সান্ত্বনা পেত। পাল পার্বনে, বিয়েতে উৎসবে যখন সে ভাল কাপড় চোপড় পরে সাজ-গোজ করে তখন তার ইচ্ছে হয় যেন কর্তা তাকে দেখে খ‍ুশি হোক। তবে বলছিলাম না যে সব প‍ুর‍ুষ এক রকমের হয় না। আমার কর্তার তো এসব দিকে কোন নজর ছিল না। বৌ ঘরে আছে কি নেই এ বিষয়ে তার কোন হ‍ুঁশ ছিল না। একদিন কথায় কথায় দ‍ুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। আমারো খ‍ুব রাগ হল। রেগে আমি বল্লাম, 'আমি চারদিনের জন্যে বাপের বাড়ী যাবো।' তিনি বললেন, 'যাওনা, কে মানা করছে?' শ‍ুনে আমার রাগ বেড়ে গেল। আমার এত হেনস্থা! আমি রাতের গাড়ীতেই যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগলাম।'

'থামলে কেন পিসী? তারপর কী হল?'

ব‍ুড়ী হেসে উঠে বলল, 'আমার রাগেরও এখানেই ইতি।'

'মানে?'

'মানে আবার কি? তাইতো তোকে বলছিলাম যে মেয়েদের রাগ অন্য ধাঁচের।'

'তাতে হলো কী? ঝগড়া মিটে গেল? উনি তোমার কাছে মাপ চাইলেন?'

'কি বললি? মাপ চাইল? আরে পাগলী! এইটুকুতেই যদি স্ত্রী খ‍ুশি হয় তবে তো স্বামী কথায় কথায় মাপ চাইতে লাগবে। নিজেদের ঝগড়া মেটাতে যে স্বামী ক্ষমা চায়, তার কাছে ঐ কথাটার কোন দামই থাকে না।'

'তবে তুমি গেলে না কেন?'

'যাবো কেমন করে? বল্লাম না যে আমি জিনিষ গোছাতে লাগলাম। তখন উনি রেগে বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরী। এ বাক্স খোলেন, ও বাক্স খোলেন, বিছানা হাঁটকান, মনে হল যেন উনি কোথাও চলে যাবার জন্যে আমায় ভয় দেখাচ্ছেন। কিন্তু সব ফেলে ছড়িয়ে 'বাঃ, আমার জামাটা কোথায় গেল' বলে ঘরময় ঘ‍ুরতে লাগলেন। আমি 'এই তো রয়েছে' বলে আলনা থেকে জামাটা নিয়ে ওঁর হাতে দিলাম। তারপর আবার নিজের জিনিষ গোছাতে লাগলাম। তখন জামা পরে সব পকেট হাতড়ে মেজাজ গরম করে বলে উঠলেন, 'হতচ্ছাড়া জিনিষগ‍ুলোর একটাকেও নিজের জায়গায় মিলবে না। টাকা পয়সার······'। আমি তখ‍ুনি বালিশের তলা থেকে মনিব্যাগটা

বের করে দিয়ে নিজের কাজ করতে লাগলাম। একটু পরে ঘরের বাইরে চেঁচামেচি শুনে উঁকি মেরে দেখি যে উনি ব্যস্ত হয়ে ঘুরছেন, আর দুজন লোক ছুটোছুটি করছে। এগিয়ে গিয়ে শুনি যে ঘর শুদ্ধ লোক ওঁর চপ্পল খুঁজতে ব্যস্ত। আমি আর কথাটি না বলে ঘরের পিছন দিকে গেলাম। সেখানে পড়ে আছে চপ্পল। সেখান থেকে এনে ধপ করে সামনে ফেলে দিয়ে গটগটিয়ে নিজের ঘরের চলে গেলাম। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে খিল দিয়ে বিছানাপত্র খুলে কাঁদতে লাগলাম। সেদিন যে কি কান্নাই কেঁদেছি তা আর তোকে কি বলবো কুমদী ?' বলতে বলতে বুড়ী হাসিতে ফেটে পড়ল।

'কেউ তোমাকে যেতে মানা করলো না বলেই কি তুমি ছোট ছেলের মতো কাঁদতে লাগলে ?

'আরে ! যাওয়া আটকানো ? আমায় আটকাবে কে ?' বুড়ী হাসি থামিয়ে চোখ মুছে বলছিল, 'আমার কান্না কি আমার জন্যে ! সে তো ওঁর জন্যে।

'ওঁর জন্যে !'

'না তো কি ? যাবার যোগাড় করছি তাতেই এই হাল, চলে গেলে না জানি কি হবে ! কে দেখবে ? কে জামা কাপড় গুছিয়ে দেবে ? কাপড় কাচা হবে কি না কে জানে ? এই সব ভেবেই কেঁদেছিলাম কুমুদ।'

কুমুদের বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল। তার মনে হল যে পিসী নিজের গল্প বলছে না, কুমুদকেই বোঝাচ্ছে। তার চলে আসায় রামন্নার খাওয়া হচ্ছে না, তার শুকনো মুখের ছবি কুমুদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। লিখতে বসে কলম খুঁজে পাচ্ছে না, পরনের কাপড় ময়লা হয়ে গিয়েছে, এই রকম অনেক ছবি যেন জোর করে তার চোখের সামনে ফুটতে লাগল। পিসী যে কি বলে যাচ্ছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। পিসী বকেই চলেছে।

'বুঝলি কুমুদ, বাইরে যাই হোক না কেন, পুরুষ মানুষ ঘরে ফিরেই ছোট ছেলের মত হয়ে পড়ে। ছেলেরা বড় হয়ে বাইরে যেতে শুরু করলে প্রথম প্রথম মায়েদের খুব খারাপ লাগে। আমাদের মনে হয় যে আমরা ছেলেদের ভালবাসি কিন্তু ছেলেরা আমাদের ভালবাসে না। ছেলেরা মুখে কিছু বলে না বটে, কিন্তু পায়ে একটা কাঁটা ফুটুক তো ? অমনি সোজা মায়ের কাছে ছুটে আসবে। তাই বলেছিলাম যে পুরুষেরা ভালবাসা দেখায় অন্যভাবে। কী রে··· ? আমার কথা শুনছিস না ? ব্যাপার কি কুমুদ ? আমার গল্প শুনে কাঁদছিস কেন ?'

সে খুব কেঁদেছিল। শত চেষ্টাতেও চোখের জল আটকায় নি। অবিরাম টসটস করে চোখের জল ঝরেছিল। পরের সপ্তাহেই সে রামন্নার ঘরে ফিরেছিল।

ঘরে পা দিয়েই রামন্নার মোহনকে কোলে নিয়ে আদর করা দেখে তার গায়ে কাঁটা দিল।

হঠাৎ সে ঘড়ি দেখল। 'আরে! ও'দের আসার সময় হয়ে গেছে। কি জানি যাবার সময় রামন্না যদি বলে 'মোহন, তুইও চল্'। ছেলেটা এখনও ফিরল না! তার কাপড় জামা গুছিয়ে রাখি বলে, কুমুদ সেই কাজে লেগে গেল।

বারো

রামন্না জানলা দিয়ে দেখছিল। দিন শেষ হয়ে আসছে। আসন্ন রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। এক কবি-বলেছেন যে দিন-রাত্রি হচ্ছে পতি-পত্নী—কিন্তু তা বলে মনে হয় না। বরং বলা যায় যে দিন-রাতের সম্বন্ধ হচ্ছে তার আর কুমুদের সম্বন্ধের মতো কিন্তু মাঝখানে আবছা অন্ধকার, এই ভেবে রামন্না বাইরে তাকিয়ে নিজের মনেই বলল—মোহন এসে গেলেই ভালো হয়, তাকেও সভায় নিয়ে যাব।

বাইরে মোহনের আসার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। এসে যাবে মনে করে সে আবার চেয়ারের দিকে এগোল। মোহন বাইরে থেকে আসবে মনে হলেই রামন্নার চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে ওঠে। চেয়ারে বসে জানলার দিকে তাকাতেই তার চোখের সামনে সেই ছবি ভেসে উঠল।

কত বছর আগেকার কথা। তারপর ও এখন কত বড় হয়ে গেছে কিন্তু সে ছবিটা আজও মুছে যায় নি। সাত আট বছর আগের কথা। তখন দ্বিতীয়বার রাগ করে কুমুদ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। মনে পড়ে না সে সময়টা তার কেমনভাবে কেটেছিল। কিন্তু একদিন সকালে সে হঠাৎ ফিরে এল। কিভাবে তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবে ভেবে পাচ্ছিল না; কিন্তু মোহন তাকে দেখে মায়ের কোল থেকে আসার জন্য দু হাত বাড়াল। সেও তাকে নেবার জন্য এক পা এগিয়ে এসে হঠাৎ থেমে গেল। এই ফাঁকে কুমুদও এক পা এগিয়ে মোহনকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে নিয়ে এমনভাবে বুকে চেপে ধরল যেন হারানো হৃদ্‌পিন্ডটাকে সে আবার বুকে ফিরে পেয়েছে। তাকে বারবার চুমু খেতে লাগল। মোহনও দুহাতে রামন্নার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। তখন সে খুব খুশি হয়ে কুমুদের দিকে তাকিয়েছিল।

ওঃ! কী সুন্দর! কথায় তার বর্ণনা সম্ভব নয়। প্রতিভাবান চিত্রকরই সে ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে। মোহনের মুখ খুশিতে ভরা। হয়ত একেই আনন্দ বলা হয় কারণ সেই মুখ দেখে তাদেরও আনন্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন সেই আনন্দ সারা ঘরটাকে আনন্দময় করে তুলেছে।

আর কুমুদের মুখ? সেই একবারই কুমুদকে দেখে অন্যরকম ভাবের উদয় হয়েছিল! এর আগে সে তাকে যতবার দেখেছে ততবারই তাকে মোহিনী নারী বলে তার মনে হয়েছে। সব সময়েই তার মনে হয়েছে যে সে নিজে ভোক্তা আর সে ভোগ্যা। কিন্তু সেদিন কুমুদকে দেখে রামন্নার মনে ঐ চিন্তাই আসে নি। শুধু কি তাই? তাকে নারী বলেই মনে হয় নি। তার মুখে ছিল পরিপূর্ণ তৃপ্তির আভাস। নিজেদের স্বার্থ ভুলে অপরের সুখের জন্য যারা জীবন কাটায়, পরের আনন্দ দেখে তাদের মুখে যে আনন্দের আভা দেখা যায় কুমুদের মুখে আনন্দের আভা সেইরকম ছিল।

সেদিন দেখা গিয়েছিল কুমুদের পূর্ণ মাতৃমূর্তি। তার সেই মূর্তির সামনে রামন্নার নিজেকে যেন এক অবোধ বালকের মত মনে হচ্ছিল। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে সে তার সঙ্গে কথা বলছিল যেন তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

সে হেসে বলেছিল, ‘একজন ছোট ছেলে, আর একজন বড় ছেলে।’

‘কী?’

‘অর্থাৎ বলা শক্ত যে আপনাদের মধ্যে বড় কে।’

মোহন চোখ বড় করে তার দিকে তাকাল যেন সে কথাটার মানে বুঝে ফেলেছে। মোহনের বিস্ফারিত চোখ দেখে তার মনে হচ্ছিল যেন কেউ তার বুকে গুলি বিঁধিয়েছে। নাটকের দৃশ্যপটের মতই তখন দৃশ্য বদলে গেল।

হতাশ হয়ে রামন্না দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সত্যি নাটকই বটে কারণ এই রকম প্রসঙ্গে তার আর কুমুদের মধ্যে যেন একটা কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি হত।

মোহনের চোখ তার কাছে আশ্চর্য মনে হত আর সেদিকে তাকালেই মনে হত চোখ দুটো যেন মোহনের নয়, সরলার। এ বিষয়ে রামন্নার কোনও সন্দেহ ছিল না। মোহনের হাসি তার কানে সরলার হাসি বলে মনে হত। তাই সে মাঝে মাঝে চমকে উঠত।

কিন্তু মোহনের চোখ সরলার মতো হবে কি করে? সে তো তার আর কুমুদের ছেলে।

তবে কি মোহনের চোখ সরলার চোখ মনে করাটা তার ভুল?

কিংবা সরলা ঐ চোখের ভিতর দিয়ে আজও বেঁচে আছে! মা হতে না পারায় তার মনে দুঃখ ছিল? ঘর ভরা ছেলে মেয়ে সে চাইত। সেও কয়েকবার ঠাট্টা করে তাকে বলেছিল—

‘বাজার থেকে কিনে আনি। আজকাল পয়সা দিলে কি না মেলে?’

সে বলেছিল, ‘বাজারে অনেক তরকারি কিনতে পাওয়া যায় বলে কেউ কি ঘরে তরকারি রাঁধা বন্ধ করে?’

‘অনর্থক পরিশ্রম হয়।’

'কিন্তু তার স্বাদ বেশী।'

'যাক গে সরলা, আমি বলি কি যদি দরকার মনে কর তো দত্তক নেওয়া যায়।'

'আমি বলতে চাই যে ঘরে ছেলে মেয়ে থাকলে…।'

'আমিও মানা করি নি, তুমিও না; তবু যদি…'

'থামো তো। আমাকে কি কচি খুকী ভেবেছ? আমি ভালোই জানি যে আমার কোন ছেলে পিলে হবে না।'

'তোমাকে পেয়েই তো আমি সুখী। আর বেশি সুখ আমি চাই না।'

'আমার কথাটা তো শোনো।'

'বলে ফ্যালো।'

'আর একটা বিয়ে করো।'

'কি বললে?'

'আমি বেঁচে থাকতে বিয়ে করলে চোখে দেখে যাবো; ছেলেদের দেখাশোনা আমিই করতে পারবো।'

'আর একটা বিয়ে করলেই যে ছেলে হবে সে ভরসা কোথায়?

'চুপ করো, যা মুখে আসে তাই বলে চলেছ।'

রামপ্পা নিজের মনেই বলল, যা মুখে আসে তাই না বলেছিলাম? সেদিনের কথা অভিশাপ হয়ে আমার উপরেই পড়েছিল? পেটে ছেলে থাকা অবস্থাতেই না কুমুদকে বিয়ে করেছিলাম? অবশ্য ছেলেটা যে আমার তা ঠিক, কিন্তু—

রামপ্পা হঠাৎ শিউরে উঠল। সে তো নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিল। তাই কি সে মোহনের চোখে ফিরে এসেছে? আর রামপ্পার বোকামি দেখে হাসছে?

অথবা—

রামপ্পার মনে অন্য সন্দেহ জাগল। ব্যাপারটা হচ্ছে যে তার যখন কুমুদকে ভাল লাগত তখনো কি সে সরলাকে ভালবাসত?

মহাভারতের গল্পে আছে না? 'ব্যাসদেব নিজের তেজস্বী চক্ষু বন্ধ করিলেন বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মাতা অন্ধ সন্তান প্রসব করিলেন।' কুমুদের সঙ্গে সঙ্গমকালে কি তারও সরলার কথা মনে পড়েছিল?

ছিঃ! এ কি ভাবছি? আপনভোলা হয়ে একাত্মভাবে রতিক্রিয়ার মগ্ন থাকলে কি মনে অন্য চিন্তা ওঠা সম্ভব?

তাহলে চাষী বীজ বোনার সময় যদি খুব ভালো ফসল হোক চিন্তা করে তবে তার মনোমত ফসল হবে কি?

উঁহু, তা হয় না। সেটা হলে হবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে। বীজের দোষগুণেই ফসলে দেখা যায়। বাইরের প্রভাবে নয়। কিন্তু যে বলে—যেমন বাপ তেমন ব্যাটা? ছেলে তো তার একলার নয়। ছেলে তার আর কুমুদের, না শুধু তার?

ফসল বীজের ওপর নির্ভর করে বটে কিন্তু চার পাশের হাওয়া, জল মাটি এদের প্রভাবও তো রয়েছে। কিন্তু গুণ তাদের প্রভাবে না হয়ে বীজের প্রভাবেই হয়। অবশ্য দোষ গুণের উপর বাইরের প্রভাব পড়তে পারে। স্ত্রীতো হাওয়া, জল, মাটির মতন। জাত, গুণ, শরীর এ সব পুরুষের ওপর···বীজের ওপরই···।

রামপ্পা হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠল। এ কী? একটা কাজের প্রতীক্ষার সময় এ সব কি যা তা ভাবছি—মনে করে সে হাতঘড়িটা দেখল। এখনো বিশ মিনিট বাকী। সে জানলার কাছে দেখতে গেল মোহন আসছে কি না।

ওঃ! বলে সে হেসে ফেলল। মোহনের কথা ভাবতে ভাবতে নবীন সাহিত্যিকের মত সব জাল্তা ভাব দেখিয়ে সেও কি ভুল করছে? পরক্ষণেই মনে হল যে তার ভুল নয়। তার তর্কের ধারা ভুল পথে গেলেও তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তো ভুল নেই। সে মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে চাইল।

আর কোন সন্দেহ নেই। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে বলল, 'সেই চোখই বটে।'

কুমুদও একবার এই কথাই বলেছিল।

একবার! কবে? যখন সে পিসীর বাড়ী থেকে হঠাৎ ফিরে এসেছে। সে মোহনকে কোলে নিয়ে আদর করছিল তখন কুমুদ তাদের বিষয়ে কি একটা কথা বলেছিল। মোহন চোখ বড় করে একবার তাকে আর একবার কুমুদকে দেখছিল। এমন সময়···

রামপ্পা বৈরাগ্যের নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসে পড়ল। সে সময় ক্ষণিকের জন্যে এলেও জীবনটা সুখময় মনে হয়েছিল।

হ্যাঁ, তখন কুমুদ জিজ্ঞাসা করেছিল—

'ছেলেটার চোখ কার মতো হয়েছে বলুন তো।'

তখন সে চমকে গিয়ে মোহনকে দেখেছিল, আর তখনই বুঝতে পেরেছিল চোখটা কার মতো। কিন্তু সে কথা বললে কি কুমুদের এই ঘরে ফেরাটা তার কাছে বিস্বাদ ঠেকবে না?

'কার মতো?' সেও পালটা প্রশ্ন করল যেন সে জানেই না। সে বলেছিল, 'মোহনের চোখ কার মতো এত শীঘ্র ভুলে গেলেন?'

—ভুলে যাওয়া? তবে তো কুমুদও জানে যে মোহনের চোখ কার মতো। আমি যে সরলাকে ভুলে গিয়েছি সেটা কুমুদ মনে করিয়ে দিচ্ছে।

তখন সে বলেছিল, 'কার মতো মানে কি শুধু তোমার চোখের মতো?'

হাসি মুখে মাথা নেড়ে কুমুদ বলেছিল, 'উঁ-হুঁ-হুঁ।'

'তবে কি আমার মতো?'

এরপর কুমুদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। আমার মুখ থেকেই কথাটা

শুনবে প্রত্যাশা ছিল, না পেয়ে হতাশ হল। তবে আমি ভাবছিলাম যে সে হয়তো নিজেই কথাটা বলবে। কিন্তু তার দৃষ্টি তখন কতদূরে, মুখে নৈরাশ্যের ছায়া। তবু তার আশা ছিল সে হয়তো একটু পরে বলবে কিন্তু এই সময় মোহন তার কাছে ছুটে যেতে সে তাকে কোলে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

কথাটা রামপ্পার মনে কয়েকবার এসেছিল—আচ্ছা সে যদি বলতো যে তোমার ধারণাই ঠিক, মোহনের চোখ সরলার চোখের মতই হয়েছে তা হলে কি কুমুদ খুশি হত? মানুষের স্বভাব বিচিত্র। সেদিন সে, কুমুদ আর মোহন সকলেই খুব হাসিখুশি ছিল। তাই রামপ্পা ভেবেছিল যতদূর সম্ভব সতর্ক থাকবে। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক ফল হল উলটো। সরলার স্মৃতি, কুমুদের পেটের ছেলের সরলার সঙ্গে মিল আছে, এ সব শুনলে পাছে কুমুদের মনে সরলার প্রতি বিরূপ ভাব জাগে, এই ছিল তার ভয়। তখন তার একমাত্র চিন্তা কুমুদ যেন বিরক্ত না হয়। তার উদ্দেশ্য সৎ হলেও পরিণাম হল বিপরীত।

হয়তো এই জন্যেই লোকে দৈব বিশ্বাস করে। যদি লোকে সত্যিই দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী হয় তবে মানুষের মত ক্ষুদ্র অনুকম্পার পাত্র আর কেউ নয়। কে জানে, হয়তো দৈবের প্রভাবেই তার কপালে উল্টো ফল হয়েছে।

এ বিষয়ে রামপ্পার অন্য একটা কথাও মনে হয়েছিল। দৈব বলে কোন কিছু নেই। যখন মানুষ নিজের কর্ত্তব্য স্থির করতে পারে না কিংবা স্থির করার চেষ্টায় লেগে থাকে তখনই দৈবের শরণাপন্ন হয়। অর্থাৎ দৈবের কথা বলা মানে নিজের ভুল স্বীকার করা।

কথাটা সত্যি। আজ রামপ্পা নিজের ভুল স্বীকার করে। কিন্তু সেদিন যা হয়েছিল সেটা দৈবের ভুলে নয়, নিজের ভুলের উচিত প্রায়শ্চিত্ত। ছেলের চোখ কার মতো হয়েছে প্রশ্ন করবার সময় কুমুদের মুখের ভাব ও হাসি দেখে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে উত্তরটা দুজনেরই জানা কুমুদ আর তার পরিচিত লোকের মধ্যে ক'জনেরই বা মোহনের মতো চোখ হতে পারে? অর্থাৎ কুমুদ সোজা উত্তরটাই প্রত্যাশা করছিল যে চোখটা সরলার চোখের মতো বলি।

কিন্তু সে কী করল? সোজা উত্তর না দিয়ে 'তোমার মতো' বলে ভুল উত্তর দিল। তারপর না ভেবেই বলেছিল 'তবে কি আমার মতো'। কাজেই যে প্রত্যাশা নিয়ে কুমুদ প্রশ্ন করেছিল তার এই সব উত্তরে তার কোন মূল্যই রইল না।

কেন এমন উত্তর দিল? শুধু এই ভেবে যে কুমুদ যেন তাকে ভালবাসে। তার উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছিল। যেমন পারিবারিক সুখের কল্পনায় মগ্ন হয়ে দুর্বাসাকে ভুলে যাবার ফলে শকুন্তলাকে দন্ডভোগ করতে হয়েছিল।

বাস্তবিক স্বার্থের খাতিরে নিজের দায়িত্ব এড়াবার জন্য যে কর্ত্তব্যে অবহেলা করে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হয়।

রামন্নার হাসি পেল। 'কী মহৎ চিন্তা!' বলে নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করল। সত্যি কি তাই? সে কি এ সব কথা সার্বজনিক সভায় বলতে পারে? লোকে বলুক না বলুক সে কি নিজে বলতে রাজী?

'হুঁ' বলে রামন্না নিজের দাড়ি চুলকোতে লাগল। বলতে হলে তো ধৈর্য ধরে স্পস্ট করেই বলা উচিত। লোকে যদি শুনতে না চায় তবে সেটা মনোরঞ্জন ভাবে বলতে হবে যেন লোকে তা শোনে। সে না সাহিত্যিক? পাঠকের জন্যে সে কুকুরের মৈথুন নিয়েও গল্প লিখতে পারে। কিন্তু নিজের জীবনে পরস্পরকে ভালবাসে এমন দুটো হৃদয় শুকিয়ে মরে যাচ্ছে—এই গল্পটাই সে বলে না কেন?

সে ঠিক করল যে সে বলবে, এইখানে তার সাহিত্যিক জীবনের একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। আজ থেকে সার্বজনিক রূপে সে সম্মান পাবে। পরে সে নিজের কথাগুলো বেশ সরস করে শোনাত পারে। শোনাতে কোনও বাধা নেই। সে দাড়ি চুলকে জানলার ধারে গেল।

বাইরে তাকিয়ে দেখল। পরে নিচে নামার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কান পেতে শব্দ শুনতে লাগল। হাত ঘড়িটা দেখল। যদি সভা ঠিক সময়ে আরম্ভ হয় তবুও আঠারো মিনিট বাকী। সভা অবশ্য দেরীতেই শুরু হবে। ভালই হবে, মোহনকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সুবিধে হবে ভাবতে ভাবতে মাথার পিছনে হাত রেখে মুখ উঁচু করে ক্লান্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বসে পড়ল।

তের

কুমুদ নিজের মনেই বলে উঠল, একটা শব্দ হল না? মোহন এল বুঝি? ভালই হলো, আমিও ওর জন্যে সব ঠিক করে—আরে না, ওটা তো দরজার শব্দ নয়।' পরে মুখ তুলে বলল—'ওঃ! মনে হচ্ছে বাপ ছেলের প্রতীক্ষা করছে।' মিনিট খানেক সিঁড়ির শব্দটা কান পেতে শুনে তার মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসে সে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগল।

প্রতিবিম্বকে জিজ্ঞাসা করল, 'এত খুশি কেন? রামন্না মোহনকে ভালবাসছে বলে?' তখন প্রতিবিম্ব হেসে উঠল।

'বড় ভাল লাগছে', আবার সে নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'কেউ কাউকে ভালবাসলে কি খুশি হওয়া উচিত?

সে একটা পাগল। প্রথম দিকে না জানি সে কি সব ভেবেছিল। সেবার

যখন সে মোহনকে নিয়ে এল তখন রামন্নার মোহনকে আদর করা দেখে সে খুব খুশি হয়েছিল না? মোহনের বদলে নিজেকে কল্পনা করে তার গায়ে কাটা দিয়েছিল, ঘাম ছুটেছিল। রামন্নার মুখে উল্লাস দেখে তার মনে হয়েছিল যেন রামন্না তার প্রতি ভালবাসা মোহনের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই কথাটাই তার তখন মনে হয়েছিল। আচ্ছা, সেদিনের সে দৃশ্য যদি সরলাদিদি দেখতে পেত? সরলাদিদিই না কতোবার বলেছিল যে ঘরে ছেলেপিলে থাকা দরকার? রামন্নার উচিত কুমুদকে বিয়ে করা। তাদের ছেলে মেয়ে দেখেই যেন মরি। কথাটা দিদি বারবার বলত। আজ যদি সে বেঁচে থাকতো? তার ও রামন্নার ছেলের সঙ্গে রামন্নাকে ছোট ছেলের মত খেলতে দেখতে পেত। কুমুদ বাৎসল্যভরা চোখে ছেলেকে দেখছিল। বুকটা হঠাৎ যেন ধ্বক করে উঠল। দিদি! না-দিদির চোখ! না মোহনের চোখ; হুবহু দিদির চোখের মতন। এতদিন কেন যে তার খেয়াল হয় নি। ছেলেকে বেশ ভাল করে দেখল, না কোনও সন্দেহ নেই। একেবারে দিদিরই চোখ। আজকের দৃশ্য চোখ মেলে দেখছে। ধন্য সরলা দিদি—

এই সময় রামন্না হাসিমুখে তাকিয়েছিল। জানি না তার কেমন লাগছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মোহনের চোখ কার মতো হয়েছে।

কত উৎসুক হয়েই না প্রশ্নটা করেছিল? সে যা দেখেছে সেটা কি রামন্নার নজরে আসে নি? তার সুখের ভাগ রামন্নাও পাক। সেদিন দুজনে মিলে সরলা-দিদিকে স্মরণ করে কৃতার্থ হবার আশাতেই সে প্রশ্নটা দুবার করেছিল।

রামন্না হয়তো প্রশ্নটা বুঝতে পারে নি। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করাতে মোহনের দিকে তাকিয়ে 'তোমার মতো' বলেছিল। ছিঃ ছিঃ! কি অসম্ভব কথা। এমন স্পষ্ট জিনিষটাও কি না দেখার কথা? সে কথা না বলায় বলেছিল, 'তবে কি আমার মতো?'

উত্তর শুনে সে বেশ দমে গিয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছা করেনি। মোহনকে কোলে নিয়ে সে দ্রুত ঘরে চলে গিয়েছিল।

মানুষ যে কত কৃতঘ্ন হতে পারে তা দেখে সে কয়েকদিন বেশ উত্তেজনায় দিন কাটাল। সরলা দিদির চোখ কেমন ছিল সেটা কি রামন্না একেবারে ভুলে গেছে? তা হলে কোন আশা নিয়ে জীবন কাটানো যায়। যদি পুরুষের এমনি স্বভাব হয় তবে তার স্ত্রীর ভাগ্য আর কেমন হবে?

হ্যাঁ! পুরুষের স্বভাবই এমন। সে কি তার পিসীর কাছে শোনে নি? বেচারী! সেকালের বুড়ী, কিন্তু আজও বুক ফুলিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঘর করার কথা বলে। একবার সে বলেছিল যে বারমুখো স্বামীকে কাছে ঘেঁসতে দেওয়া উচিত নয়. তখন বুড়ী উত্তরে বলেছিল—'আরে কুমুদী, স্বামী বাইরে কি কি করে বেড়ায় তার দিকে নজর দিলে তো স্ত্রীর বেঁচে থাকাই মুসকিল।'

সেও তখন রাগ করে বলেছিল, 'স্বামী অপরের সঙ্গে রাত কাটিয়ে ফিরলে স্ত্রীর বুক জ্বলবে না?'

'আচ্ছা ; আজকালকার মেয়েদেরও এটা খারাপ লাগে?'

সে জোর দিয়ে বলেছিল, 'কি কথার কি উত্তর দিলে?'

'দ্যাখ কুমদী, তালি একহাতে বাজে না। মানছি আমারও দোষ ছিল। আমি কি করে তার ওপর রাগ করি?'

'তোমার দোষটা কি?'

'দোষ ছিল বৈকি, তবে তা এড়াবার উপায় ছিল না। ওদের সংসার ছিল বিরাট। আমাদের দুজন নিয়ে এগারো জোড়া স্বামী-স্ত্রী। কর্তারা যখন ঘরে ফিরতেন তখন আমরা কাজে ব্যস্ত। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে শ্বাশুড়ী উত্তর দিতেন। কাজ কর্ম সেরে সুখ দুঃখ, হাসি তামাসার কথা বলার আশায় যখন ঘরে যেতাম তখন কর্তা ঘুমে কাদা। ভোরে ওঁর ঘুম ভাঙবার আগেই নিঃশব্দে বেরিয়ে যেতাম ঘরের কাজে। বলতো, এটা কি তাঁর খারাপ লাগত না? কী? শুনছিস না শুধু আমার মুখই দেখছিস?'

'পিসী, তুমি যদি লেখাপড়া জানা মেয়ে হতে—'

'তাহলে সেকালে আমার বিয়েই হত না', বলে বুড়ী হেসে ফেলেছিল। কিন্তু তার কথাটায় কি সত্য ছিল? যদি ঘরে স্ত্রীসঙ্গ না মেলে তবে স্বামী বাইরে যাবে কেন? সারাদিন পরিশ্রমের পর স্বামীর সঙ্গ সুখ স্ত্রীই বা কতটুকু পায়? যদি স্ত্রীও ঐ পথ ধরে তবে কি সমাজ তা মেনে নেবে?

যাক্ গে। সরলাদিদিকে ভোলবার জন্য রামন্নার কোন কারণ ছিল কি?

কিংবা?

প্রথমে কুমুদের যা মনে হয়েছিল আবার তা মনে পড়ল। রামন্না সরলাদিদিকে ভোলে নি। শুধু তার মন রাখবার জন্যেই অমন কথা বলেছিল।

কি অন্যায়? সরলাদিদির কথা মনে রাখলে তার হিংসে হবে রামন্না একথা ভাবল কেমন করে?

কুমুদ আবার আয়নায় নিজেকে দেখল।

সেই প্রতিবিম্ব দেখেই তার মনে হল যেন গায়ে কাঁটা বিঁধছে।

ভাবছিলাম না যে রামন্না এমন কথা বলল কেন? আচ্ছা, কি বোকা সে? রামন্না তাকে ভালবাসে না, এখনও সরলাদিদিকে মনে মনে ভালবাসে—এই সব বলে সে না কতবার রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে—

সামনের মূর্তিটা যে তার প্রতিবিম্ব তা খেয়াল হতে তার হুঁশ হল।

ততক্ষণে তার চোখের সামনে থেকে মোটা কালো পর্দা সরে গেছে। কুমুদ আকাশ-পাতাল ভাবতে বসল। তার চোখ পুরোণো ছবি থেকে সরে গিয়ে অন্তরে

উঁকি মারল। কুঁয়োতে ঘড়া নামিয়ে যেমন জল ভরা ঘড়া উপরে তোলা হয়, তেমনি তার চোখ অন্তরে ডুব দিয়ে জল ভরে বর্ত্তমান জগতে ফিরে এল।

কুমুদ বুঝতে পারল যে তার বিবাহিত জীবন শুধু তাকে আর রামন্নাকে নিয়েই নয়। আগে এ কথাটা সে জানত না।

সেদিন পিসী না কথাটা বলেছিল? ঘরে অন্যান্য লোক থাকলে পরস্পরের সঙ্গ মোটেই তৃপ্তিদায়ক হয় না। পিসী সে কথা বুঝেছিল, তাই সে স্বামীর উপর রাগ করত না। বরং যেটুকু স্বল্প অবসর পেত তাতেই তার উপর নিজের প্রেম উজাড় করে দিত। সেই প্রেমের স্বাদে মন আর অন্য কিছু চাইত না। সত্যি পিসী সেদিন তাকে পথ দেখিয়েছিল কিন্তু সে অন্ধ হয়েই রয়ে গেল।

কুমুদ জানতো যে তার আর তার পিসীর পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তাই পিসীর অবস্থা তার চেয়ে ভালো।

রামন্নার সঙ্গে তার বিয়ের পর সে ভেবেছিল যে ঘরে কেবল সে আর রামন্না।

কি বোকাই না ছিল সে!

ঘরে না থাকলেও মনে তৃতীয় ব্যক্তি নেই কি? সরলাদিদির স্মৃতিই তো ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে রয়েছে। সে তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। বোকার মতো। কেন? সরলাদিদি কি তাদের বিয়ে চায় নি? তাছাড়া রামন্না তার সঙ্গে কিছুকাল ঘর সংসার করেছে। কাজেই সে যদি সরলাদিদির কথা মনে রাখে তাতে দোষ কি?

রামন্না এখনও সরলাদিদিকে ভালবাসে মনে করে সে—

সরলাদিদির কথা বললে তার অর্থাৎ কুমুদের খারাপ লাগবে ভেবে রামন্না—

দুজনে এতকাল দুদিকে—ছুঁচলো শিক মাঝখানে রেখে পরস্পরের কাছে যাবার চেষ্টা করছে।

কুমুদ নিজেকে সামলে নিল। এ কী? তার ভাবনা কি ঠিক পথে এগোচ্ছে? জলের খোঁজে ক্লান্ত লোকে যেমন মরীচিকাকে জল ভাবে তার অবস্থাও কি তাই? তারা দুজনে অপরাধীর মতো সরলাদিদিকে মন থেকে দূর করবার চেষ্টা না করে তাকে বন্ধুর মতো মনে রাখলেই কি ভালো হতো না?

পুরোণো দিনের একটা কথা কুমুদের মনে পড়ল। বিয়ের পর প্রথম প্রথম রামন্না ক্রমাগত সরলাদিদির কথা বলত। তার এটা ভাল না লাগলেও রামন্নার বলা বন্ধ হত না।

বেচারা! রামন্নাই বা কী করে। সরলাদিদি কতদিন ভালবেসে তার সঙ্গে ঘর করেছে। তাকে সে কি ভুলতে পারে? সদ্যপরিচিত কুমুদের সঙ্গে কোন্ কথাই বা সে বলবে? কিন্তু তখন কুমুদ বুঝতে পারে নি। তার মনে হয়েছিল যে সরলাদিদির কথা বলার মানে হচ্ছে যে সে কেবল সরলাদিদিকেই

ভালবাসে। সেটা কি তার ভুল? মোহনকে আদর করেও কি সে রামন্নাকে ভালবাসে না? তেমনি সরলাদিদির কথা মনে রেখেও কি সে তাকে ভালবাসতে পারে না?

কুমুদের মুখে হাসি ফুটল। যদি কারো প্রেমকে আদর্শ প্রেম বলতে হয়, তবে সেটা তার পিসীর। স্বামী বাইরে কোথায় যায়, কি করে এ সব জেনেও তাকে ভালবাসে। পিসীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল যে কথাটা মনে হলে তার খারাপ লাগে কি না; তাতে বেশ গর্বের সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিল—

'না কুমুদী। বাইরে ঘুরে ফিরে আসা স্বামীর জামায় যদি কাক নোংরা করে তবে কি জামাটা ফেলে দেওয়া হয়? না কি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়?'

'তবে কি করতে পিসী? স্নান না করিয়ে পিসেকে ঘরে ঢুকতে দিতে না বুঝি?'

'ওর মন যদি পরিষ্কার থাকে তবে স্নান হয়েছে বুঝে নাও। আর আমার মন যদি পরিষ্কার থাকে তো তাই সাবানের কাজ করেছে।' জানি না বুড়ী কি বুঝে এমন উত্তর দিয়েছিল কিংবা এমনি কথার কথা বলেছিল। যাই হোক না কথাটায় তত্ত্বজ্ঞানের আভাস ছিল।

কুমুদ হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠল। নানারকম এলোমেলো চিন্তা তাকে এক জায়গায় সুস্থির হয়ে বসতে দিচ্ছিল না। এই সব চিন্তার হাত এড়াতে সে পায়চারি করতে শুরু করল।

এ কি সত্যি? এ কি সত্যি? এ কি সত্যি?

চিন্তা যেন তার পিছু নিয়েছে, ছাড়ছেই না। একবার চেপে ধরে আর সরে যায়।

রামন্না তাকে ভালবাসে—সত্যি! সত্যি! সত্যি!

অপর কাউকে কি বিশ্বাস করা যায়? কিন্তু কুমুদের অবস্থা এমন যে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা আর সম্ভব নয়। দশ বছরের অবরুদ্ধ চিন্তা যেন বুক চিরে বেরিয়ে আসতে চায়। সেই চিন্তাকে ঘিরে নানান ভাবনা জড় হতে থাকে।

যখন সে পিসীর বাড়ী গিয়েছিল রামন্না খোঁজ করে সেখানে এসেছিল।

সে ঘরে ফিরে এলে রামন্না মোহনকে কোলে নিয়ে আদর করেছিল।

তার জ্বর হয়েছে সন্দেহ হওয়ায় তার গায়ে হাত দিয়ে না দেখে সে ছুটে ডাক্তার ডেকে এনেছিল।

তার সঙ্গে দৈহিক যোগ না থাকলেও অন্য কোন পথে পা বাড়ায় নি। সেদিন তো নিজের ইচ্ছেতেই শাড়ী কিনে এনেছিল।

ছোট খাটো ঘটনা, একটা কি দুটো কথা। সন্দেহের পাহাড়ের চূড়াটা ভেঙে

পড়তেই যেন গোটা পাহাড়টাই ধ্বসে পড়ল। একের পর এক স্মৃতি এসে ভিড় করে।

এটা সত্যি যে প্রথমদিকে রামপ্পার কাছে সে ছিল কাম পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র। এটাও ঠিক যে পরে তাদের বিবাহ হয়েছিল। ব্যভিচার সমাজ সহ্য করে না। বিয়ে না হলে সমাজ তাকে বের করে দিত। কিন্তু রামপ্পা কি তাকে বিয়ে করে নি? বিয়ে করার জন্যে কেউ তাকে জোর করে নি। তবে কেন ভাবছি না যে ভালবাসে বলেই রামপ্পা আমাকে বিয়ে করেছে। কেনই বা জোর করে ভাবছি যে উপকার করবার জন্যে সে আমাকে বিয়ে করেছে। সে ভাল করেই জানে যে রামপ্পার জীবনে অন্য কোন মেয়ে নেই। তবু প্রথমে সে রামপ্পার কামতৃপ্তির উপায় হয়েছিল এ কথাও সত্যি।

—হ্যাঁ, কিন্তু তাতে দোষ কী?

যেন অন্য কারও সঙ্গে তর্ক করছে এমনভাবে সে চেয়ারে বসল।

আবার নিজের মনেই বলল, তাতে দোষ কী?'

আজকাল সমাজের নীতি বদলে গিয়েছে, আজকাল ছেলেমেয়েরা বিয়ের আগে অন্য পরিবেশে মানুষ হয়, সমাজে একে অপরের সঙ্গে মেশে, ভালবাসে. পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হলে, হৃদয়ের মিল হলে একে অপরকে গ্রহণ করে। বিয়ের আগেই যদি এক আধবার দেহের মিলন ঘটে তবে তাতে দোষ কি?

কুমুদের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। তার ধারণা কি ঠিক? অথবা যে সমস্যা নিয়ে সমাজ কর্ত্তব্য স্থির করে সেটাকে কি এত তুচ্ছ মনে করা উচিত?

কুমুদের মনে হল যে প্রেম যদি খাঁটি হয় তো বাসনার কোন মহত্ত্ব থাকে না। সে নিজের আর রামপ্পার প্রেমের কথা ভাবল। কি করে তাদের মিলন হল? বাসনা তৃপ্তির জন্য নয়। একজনকে দেখতে না পেলে অপরের শান্তি নেই। একে অপরকে দেখে আপন ভোলা হয়ে যেত। একের সুখ দুঃখের ভাগ নিতে অপরে তৈরী, যেন তার সুখ দুঃখই নিজের সুখ দুঃখ। দুই হৃদয় এক হয়ে গেলে দুই দেহের এক হয়ে যাওয়ার কোন খেয়াল থাকত না। এমন নয় যে এক হয়ে যাবার ইচ্ছে হত বরং এক হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকত না। মনের মিল হলে আর কিছুই বাকী থাকে না। সমাজ সাংঘাতিক ভুল করছে।

হৃদয়ের মিলন ছাড়া দৈহিক মিলন তো বাস্তবপক্ষে বেশ্যাবৃত্তি। বিয়ে হয়ে গেলেও তাকে বেশ্যাবৃত্তি বলা যায়।

নিজের সিদ্ধান্তে কুমুদ বাধা পেল। এ কী? তার ভয় হলো যে দশ বছর ধরে আলাদা থাকার ফলে তার মনে এই সব চিন্তা জাগছে না তো?

সেই ভয়ের পাশ দিয়েই যেন সুখ উঁকি মারছে।

হ্যাঁ, মোহনকে সঙ্গে নিয়ে সভায় যাওয়া উচিত। মোহন এখনো এল না কেন? তার আসার সময় তো হয়েছে। যাক্ গে, সভায় যাবার জন্যে এত ব্যস্ত হবার কি আছে। মোহন ফিরলে তাকে নিয়েই যাবো।

কিন্তু……

কুমুদ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এত বড় সভা, কত লোক আসবে। রামন্না কি ভালো কাপড় জামা পরেছে? কুমুদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সে ঠিক জামা কাপড় পরে নি। হ্যাঁ, পুরুষের স্বভাব এইরকমই হয়। আজ তো রামন্নার ভালো জামা কাপড় পরা উচিত; এই মনে করে সে জামা কাপড় বের করতে লাগল। তখন তার খেয়াল হল যে তার হাত-পা কাঁপছে।

কিন্তু এখন এ সবে মন দেওয়া উচিত নয় ভেবে সে কাপড় জামা বের করার জন্য ড্রয়ারগুলো খুলতে আর বন্ধ করতে লাগল।

চোদ্দ

রামন্না থমকে দাঁড়াল। কিসের শব্দ?

'ওঃ! নিচে শব্দ হচ্ছে কেন?' বলতে বলতে সে সিঁড়ির দিকে গেল। কিন্তু কি ভেবে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল। কে জানে? হয়তো আমার সঙ্গে সভায় যেতে হচ্ছে বলে কুমুদের রাগ হয়েছে।

কেন? রামন্নার হাসি পেল। রাগ হলেই যে ড্রয়ার টানাটানি করতে হবে এমনকি কোন নিয়ম আছে? খুশি হলেও তো করা যায়। দুঃখেও করতে পারে। আরো কত কারণ হতে পারে।

কুমুদ রাগ করে নি। শব্দটা তো কমে গেল। সে আরেকবার জানলায় উঁকি মেরে শেষে বসেই পড়ল। সভার লোকেরা শীঘ্র এলেই ভালো হয়। জানিনা মনটা এমন করছে কেন। কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটতে চলেছে বুঝি। তাই কখনো আনন্দ কখনো দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

কি বিচিত্র মানুষের মন! বোমার ঘায়ে যারা সংসার ধ্বংস করবার জন্য পরমাণু বোমার সন্ধান চালাচ্ছে তাদের কি মানব মনের সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান চালানো উচিত নয়? কিন্তু তা না করে পরমাণু বোমার উন্নতির কাজে লেগে আছে। এইজন্যেই না ভবভূতি বলেছেন, 'কিমপিঃ, কিমপিঃ' অর্থাৎ এর মধ্যে কি কিছু রহস্য আছে?

এখন তার ভয় লাগছে না। মজার কথা বটে। কেন ভাবছিলাম যে কুমুদ রাগ করেছে। সে কি কুমুদকে ভয় করে? বিয়ের আগের ব্যাপার হলে সে ভাবতো কুমুদ মনের আনন্দে আছে। যা ঘটবার তা ঘটেই থাকে। তার ব্যাখ্যা নিজের মনের উপর নির্ভর করে।

অর্থাৎ······?

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে মাথা চেপে চোখ বন্ধ করে রামন্না একাগ্রচিত্তে কিছু ভাবল।

ঘটনার ব্যাখ্যা মনের উপর নির্ভরশীল।

মানে কি?

মন যদি নিজের বশে থাকে, তবে কি ঘটনা নিজের অনুকুল বলে মনে হয়?

কুমুদকে যদি সঠিকভাবে বোঝা যায় তো সেও···?

উঁহুঁ! এইখানটায় গোলমাল ঠেকছে। সে নিজের মনেই বলল।

তার মানে হল আজ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে। কেন? সেটা বলা কঠিন কেননা কারণ জানা নেই, কাজের কল্পনাটুকুই আছে। যদি এটা সত্যি ঘটে, যদি কুমুদ তাকে ঠিক বুঝতে পারে। হুঁ! যাই হোক, দায়িত্ব সে অপরের ঘাড়ে চাপাচ্ছে না? এটা কি তার ভুল হতে পারে না। যদি সে সত্যিই কুমুদকে ভালবাসে তবে এই অস্থিরতা কেন?

কুমুদ যে তাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে তাতে রামন্নার কোনও সন্দেহ নেই। বিয়ের আগেই সে তাকে পেয়েছিল বলে রামন্না আরো নিঃসন্দেহ হতে পেরেছে। তা সত্বেও কুমুদ কয়েক বছর ধরে তার সঙ্গে কোন সংস্রব না রেখেই সংসার করে যাচ্ছে।

কেন এই বৈরাগ্য? এতে সে কি সুখ পায়? তাদের বয়সের তফাৎটা চোদ্দ পনেরো বছর হবে। তাতে কী? আঃ তার মন আবার ঐ পথে চলেছে।

বিবাহিত জীবনের সুখ কি কামতৃপ্তিতেই হয়? এ প্রশ্নটা তার নয়, হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা এই প্রশ্ন তার জীবনেও আছে। না কি প্রত্যেক পুরুষের প্রশ্নই এই? তাই সম্ভব। কামতৃপ্তিতে পুরুষের তৃপ্তি হয়। আনুষঙ্গিক কোন দায়িত্ব তার থাকে না। মেয়েদের কথা স্বতন্ত্র; কামতৃপ্তি তার উপরে একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। পুরুষের কামতৃপ্তি যেন রাতের চোর। সহজেই লুকোনো যায়। আর মেয়েদের কামতৃপ্তি যেন দিনের চোর। লুকোবার উপায় নেই। কামতৃপ্তির বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের ধারণাও কি ভিন্ন? হঠাৎ তার মনে হল, একথা ভাবছে কেন? দশ বছর ধরে সে নারীসঙ্গ লাভ করেনি বলে?

ওঃ! রামন্না নিজেই নিজেকে বাহবা দিল। চট করে চারপাশ দেখে নিল যেন লজ্জা পেয়েছে। কেউ দেখে ফেললে তাকে পাগল ভাবত।

কিন্তু বাহবা দেবার মত ব্যাপারই বটে—সে আবার ভাবল।

দশ বছর ধরে সে ব্রহ্মচারীর জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু এ সময়ে কুমুদ ছাড়া অন্য কারও দিকে মন যায় নি। সে যে কুমুদকে ভালবাসে, এর চেয়ে জোরালো প্রমাণ আর কি আছে?

রামন্নার মাথায় নানা চিন্তা একসঙ্গে জোট পাকাতে লাগল। সত্যিই কি এত সহজে সে কুমুদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? শুধু এই একটা কথায় কুমুদের সমস্যার সমাধান হতে পারে?

রামন্না হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে পাগল না বোকা? এ কথা শুনলে কুমুদ কেন, যে কোন স্ত্রীই সুখী হবে। শেষপর্যন্ত তাকে নিষ্ঠাবান বলা যেতে পারে কি? ঠিক; যদি কোন শিশু কোন জিনিষের জন্য বায়না ধরে তাহলে তার মানে এই নয় যে সে অন্য জিনিষ চায় না। তার মনোমত জিনিষটি না পেলে সে সারাদিন না খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কেউ কি নিশ্চিত বলতে পারে যে ছেলেটা শুধু ঐ জিনিষটাই খেতে চায়?

কিন্তু কুমুদের সঙ্গে তর্ক করলে সে বলতে পারে যে সে নিজেও জেদী ছেলের মতো। কিন্তু সে কি এ কথা বিশ্বাস করবে? হবে কি সে নিঃসন্দেহ যে সে কুমুদকে মনে প্রাণে ভালবাসে? অর্থাৎ প্রথমে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল? ছিঃ এ সন্দেহ ছিলই না। অর্থাৎ···?

রামন্না মাথা নেড়ে সংশয়কে দূরে সরাতে চায়। সে জোর দিয়ে নিজের মনেই বলল যে কুমুদকে ভালবাসায় তার কোন সন্দেহ নেই। তাই যদি হয় তো নিজেকে বাহবা দিয়েছিল কেন?

ওহো!···বুঝেছি। এইবার কুমুদকে বোঝাতে পারব—এই ভেবে সে নিজেকে বাহবা দিল। তার মনে হল এবার তার সাহস হয়েছে। যদি বলা যায় যে কুমুদকে ছাড়া আর কাউকে সে স্বপ্নেও চায় নি······

···যদি বলি? শুনে সে হয়ত ভাববে যে সে একটা কাজ করে কৃতার্থ হয়েছে। কিন্তু কথাটা কেমন ভাবে বলা যায় যাতে কুমুদ বিশ্বাস করে। কি এমন নতুন কথা যাতে তাকে আবার বিশ্বাস করতে হবে? কুমুদ কি তাকে জানে না? তার মন যে অন্য কোথাও পড়ে নেই এটা জেনেও তো তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রয়েছে। এটাও দেখছি দুষ্যন্ত শকুন্তলার গল্পের মতো। তফাৎ এইটুকু যে, নাটকে শকুন্তলার যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থা দুষ্যন্তের অর্থাৎ তার হবে। শকুন্তলার সঙ্গীরা সকলেই দুষ্যন্তকে বলেছিল, 'এ আপনার বিবাহিতা স্ত্রী। আপনার সন্তানের মা হতে যাচ্ছে। আমরা একে আপনার হাতেই দিচ্ছি। কতদিন আর বাপের বাড়ীতে থাকবে আপনি একে গ্রহণ করুন।' কিন্তু এই বিয়ের কথা দুষ্যন্তের মনে ছিল না। দুষ্যন্ত বলেছিল, 'মেয়েটি গ্রহণ করার যোগ্য বটে, কিন্তু একে আমি বিয়ে করেছি বলে

মনে পড়ে না। কাজেই আমি মেনে নিতে পারি না।' তখন গুরুজনেরা শকুন্তলাকে বললেন, 'তুমিই এমন কথা বলো যাতে ওঁর বিশ্বাস হতে পারে।' তখন শকুন্তলা বলেছিল, 'একদিন নবমল্লিকা মণ্ডপে আপনি পদ্মপাতায় জল নিয়ে হরিণ শিশু দীর্ঘাপাঙ্গকে জল খাওয়াতে গেলেন, আপনি অনেক চেষ্টা করেও তাকে জল খাওয়াতে পারলেন না। তখন আমি আপনার হাত থেকে পাতার দোনা আমার হাতে নিলাম। তখন ছানাটা ছুটে এসে আমার হাত থেকে খেল। তখন আপনি হেসে বলেছিলেন, 'সকলে নিজের লোককেই বিশ্বাস করে।' গল্পটা শুনে দুষ্যন্তের বিশ্বাস হবে ভেবে শকুন্তলার মুখে হাসি ফুটেছিল। তখন দুষ্যন্ত বলল, 'গল্পটা ভালো। এ থেকে বোঝা যায় মেয়েরা মিথ্যেকে সুন্দর করে বলতে পারে।' আমার অবস্থাও যে এমনি হবে না কে বলতে পারে? যদি সে বলে বসে, 'অন্য মেয়ের দিকে নজর না দেবার কারণটা ব্রহ্মচর্য পালন না বয়সের লক্ষণ?' রামন্না বেশ ভয় পেল। তার মনে হল যে সত্যকে বিশ্বাস করবার পন্থা যদি সরল না হয় তবে তার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে? আমাদের ভাষার ট্র্যাজেডী শব্দ নেই বলে তার জায়গায় 'দুর্ভাগ্য' কথাটা প্রয়োগ করা উচিত।

হ্যাঁ, একটু আগে দৈবের বিষয়ে ভাবছিলাম না? মনে যাই হোক, 'দৈব' বলে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। আমার দায়িত্ব কি? আমি ভালবাসি কিন্তু সে তা বিশ্বাস করে না। এতে আমার দায়িত্ব কোথায়? তাকে বিশ্বাস করাবার জন্যে কি করতে হবে? কেমন করে বলতে হবে? না সেটা আমার কাজ নয়। কুমুদকে ভালবাসি এই বিশ্বাস রেখেই আমার চুপ করে থাকা উচিত। এটাই আমার কর্তব্য।

'সাবাস! তবে কি আমার চুপ করে থাকাই উচিত? বাঃ কেমন সহজে সিদ্ধান্তে পেঁছে গেলাম,' বলে রামন্না নিজেকেই ব্যঙ্গ করল। শেষে তার মনে হল চুপ করে থাকা ছাড়া আর কী বা সে করতে পারে।

বিষয়টাই এমন…। 'তোমাকে ভালবাসি।' শুধু এইটুকু শুনেই কে মেনে নেবে? ভালবাসাটা অনুভব করা চাই। শুধু মুখের কথায় তো বিশ্বাস হয় না। যেমন কি না গল্প, উপন্যাস, নাটকে লেখা হয়। নায়ক বলে, 'প্রিয়ে আমি তোমায় ভালবাসি।' নায়িকা বলে, 'প্রিয়তম আমি তোমায় ভালবাসি।' বাস্তব জীবনে যদি কথা এত সরল হতো তো প্রতি মুহূর্তে এক একটা প্রেম-বিবাহ ঘটত। রামন্না নিজের মনেই বলল—সেও তো সাহিত্যিক, প্রাণীজগতের স্বভাবের সঙ্গে তারও কিছু পরিচয় আছে। পুরুষ প্রাণী যখন স্ত্রী প্রাণীর সঙ্গ চায় তখন তাকে ভালবাসা তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; আবার মাতৃত্ব লাভের পর যাকে ভালবাসে তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করাই হল তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মানুষের পক্ষেও এটা স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষ নিজের প্রিয়জনকে নিজের কাছেই রাখতে চায়। সেইজন্য তার ভালবাসার কল্পনা অন্য রকমের। সে…

রামন্না ঘড়ি দেখে উঠে পড়ল। 'জানি না এত রকমের চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসছে কেন। যা তা ভেবে মরছি।' নিজেকেই শাসন করে সে বলল—

'হতচ্ছাড়া সভাটা কি তাড়াতাড়ি শুরু হতে পারে না?'

'দেখলে? কার ওপর রাগ করে কার ওপর ঝাল ঝাড়া হচ্ছে।

রামন্না ক্লান্ত লোকের মত ম্লান হাসি হাসল। তবু তার বোধ হল যেন মনটা অকল্পনীয় উল্লাসে ভরে আছে। কিসের উল্লাস হতে পারে? দশ বছরের তপস্যা থেকে মুক্তি পাবো। আমার কাছে কুমুদের চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই। সে সুখে থাকুক এইটুকুই চাই। সে আমার হয়েই থাকুক সে জোরও খাটাতে চাই না।

'হ্যাঁ হ্যাঁ! একটু থামো। এটা কি বৈরাগ্য না বার্ধক্যের লক্ষণ?

না, কোনোটাই নয়। আমার দিব্যি। সে প্রসন্নমনে আমার সামনে থাকুক। এতেই আমি খুশি। সে, তার মোহন—না, তারা দুজন তো আলাদা নয়। মোহন তো তারই অঙ্গ। আমি তাকে যতটা ভালবাসি মোহনকেও তো ততটা ভালবাসি। তারা যেন একে অপরের অঙ্গ; আলাদা নয়। কুমুদ যে আমাকে ভালবাসে তা আমি জানি। সেই জন্যেই তো আজ সভায় যেতে রাজী হয়েছে। আমার সম্মান দেখে সে খুশি হবে আর তাকে খুশি দেখে আমিও খুশি হবো। যখন আমরা দুজনে খুশি হব তখন আমাদের দৃষ্টি এক জায়গায় অর্থাৎ মোহনের ওপরে পড়বে।

নিজের চোখে জল আসতে রামন্না বলে উঠল, 'মোহনও সভায় চলুক।' আবার জানলার কাছে গিয়ে বলল, 'মোহনও সভায় যাবে।' তাতেও যেন স্বস্তি না পেয়ে সিঁড়ির কাছে গিয়ে বলল, 'মোহনও সভায় যাবে।'

পনের

কাজ করতে করতে কুমুদ হঠাৎ থেমে গেল। 'কিসের শব্দ হল? কেউ কথা বলল কি?' ভাবতে ভাবতে সে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে গেল। না, পুতুলের মত নয়, পুতুলের তো দাঁড়াবার জন্যে পা থাকে কিন্তু তার যেন পা নেই। পায়ে কোন জোর নেই—উরুতে হাত দুটো রেখে সে সেখানেই বসে পড়ল।

'মোহনও সভায় যাবে।'

রামন্নার গলা। কথাগুলো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। সে শব্দগুলো দড়ির মত মনে হল। তারই সাহায্যে সে ধীরে ধীরে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়াল। মাথার চুল সামলে নিল—এ কি? হাত ভিজে লাগছে, মাথায় ঘাম!

কেন-কেন-কেন? বুক ধড়ফড় করছে। দুঃখ আর সুখ—দু'য়ের লক্ষণ এক রকম। ভয়, ঘাম, অশান্তি, কিন্তু এ সবের ফলে তার শরীরে যেন বল-সঞ্চার হচ্ছে। হয়তো এটাই একটা পার্থক্য—সুখ দুঃখের মধ্যে। মোহনকেও সে সভায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। রামন্নাও সেই কথাই বলছে। যখনই সে আর রামন্না একমত হয় তখনই তার ভাল লাগে। তার মনে হল যেন রামন্না তাকে ছুঁয়েছে, ছোঁয়া লাগলেই শরীর কেঁপে ওঠে, শরীর ঘেমে যায়, পা অসাড় হয়ে আসে। কেন? কেন? কেন?

সে নিজেকেই এই প্রশ্ন করল।

কত দিনের কথা তবু যেন তার মনে হল যেন আজকের অনুপম আনন্দের মধ্যে সেদিনের অলৌকিক আনন্দ তার শরীর অনুভব করছে। একদিনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি আজ পরোক্ষভাবে মনে পড়ছে। প্রথম বারে তার মনে হয়েছিল যে তার নারী জন্ম সার্থক হয়েছে। তখনও তার আর রামন্নার অস্তিত্ব যে আলাদা তা মনে ছিল। দুঃখের মধ্যেও এই যে সুখ—তা ক্ষণিকের হলেও যেন চিরন্তন। কথাটা মনে করে কুমুদ এখনও কেঁপে উঠল। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে সে চেয়ারে বসে পড়ল। তার ভয় হল যে সে হয়তো নিজেকেই ভুলে গিয়েছে। তখন সে আয়নায় নিজেকে দেখল। শরীর গরম হয়নি তবু নিঃশ্বাস কেন গরম লাগছে? সে চোখ বন্ধ করে বসে রইল। ঘর, সভা, সম্বর্ধনা সব যেন ভুলে গেল। সে এখন অন্য এক জগতে বিচরণ করছে।

সে দিনটা কবে? দিন জেনে কি হবে? চরম আনন্দ পেয়েছিল সেদিন। রামন্না কিছু লিখছিল। তার টেবিলের সামনে আয়না। সে কিছুক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। লেখার জন্যে ডান হাতটা নড়ছিল। মাথার চুল এলো-মেলো। ডান হাতেই মাঝে মাঝে কান চুলকোচ্ছিল। সে ধীরে ধীরে চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়াল। পাশে দাঁড়াবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু চেয়ারের হাতল ছিল না। মনে পড়ে না কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। আয়নাতে তাকেও দেখা যাচ্ছিল কিন্তু সেদিকে রামন্নার নজর ছিল না। একবার মাথা তুলে ডান হাতে মাথা চুলকোল। তবু তাকে দেখতে পেল না। কী একাগ্রতা! সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মাথার চুলে হাত বোলাতে লাগল। ভয় হচ্ছিল পাছে ওঁর ধ্যান ভেঙে যায়। তখন তার বাহ্য জগতের কোন জ্ঞান নেই। তার মনে হল যেন কেউ তাকে ব্যঙ্গ করছে। ওটা একাগ্রতা না তাচ্ছিল্য? এই ভাবে তাচ্ছিল্য করা কি উচিত? একটু রাগ করে সে তার পাশে গেল। এক মিনিট কাটল। ডানহাতে লিখছিল আর বাঁ হাতে তাকে জড়াচ্ছিল। ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল? না, না, লেখা চলছেই। বাঁ হাতটা তাকে জড়িয়ে রাখল। সে হাতে কতো মমতা; কি কোমল ছিল সেই স্পর্শ। জড়ানো হাতটা তাকে নিজের দিকে টানল। তখন সে রামন্নার কোলে বসে পড়ল। কিন্তু তখনো হয়তো রামন্নার কোন হুঁশ নেই। শুধু তা কেন?

সে নিজেও হয়তো বেহুঁশ হয়েছিল। কিছুক্ষণ বুঝতেই পারেনি সে কোথায় বসে আছে। দুজনের কেউ কথা বলেনি। এমনভাবে তারা বসেছিল যেন তাদের হৃদয় এক হয়ে গিয়েছে। কুমুদ লেখা দেখায় মগ্ন আর তাকে চেপে ধরে রামন্না লেখায় মগ্ন। কাঁধে কাঁধ, গালে গাল ঠেকে আছে, যেন দুটো শরীর চিরে ভিতর থেকে দুটো হৃদয় এক হয়ে যাবে। কথা না বলে চোখ বুঁজে কতক্ষণ বসেছিল তা মনে পড়ে না।

কুমুদের মনে হল তন্ময়তায় যে আনন্দ পাওয়া যায় তা সে কখনো ভুলতে পারে না। পুরোণো সেই কথা স্মরণ করে আবার সেই আনন্দ পাবার আশায় সে চোখ বুঁজল।

কুমুদ বড় উৎসাহে রামন্নার জন্যে ভাল জামা কাপড় বের করল। মোহনের জন্যে সব জোগাড় করে রাখল। নিজের সাজগোজ ঠিক হয়েছে তো? রামন্নার সম্মান সভায় যেতে তার এত সাজগোজ কেন? রামন্না লেখক। তাতে কি? সেও তো লেখকের অর্ধাঙ্গিনী। সেদিন রামন্নার কোলে বসে থাকার সময় সে কি ভাবেনি যে সে নিজেই লিখছিল?

পরে সে বলেছিল, 'মনোযোগ নষ্ট হল বলে রাগ করেননি তো?'

'কিসে মনোযোগ?'

'লেখায়।'

'ওঃ! কি বলছ, কুমুদ? লেখার সময় প্রেরণা এসে দরজায় দাঁড়ালে লেখকের মনেযোগ নষ্ট হয় না।'

'তবে কি খুশি হয়ে মাথা চুলকোচ্ছিলেন?'

'না, যে প্রেরণা এসেছে সেটা গ্রহণ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে মাথা চুলকেছি।'

'প্রেরণাটা কেমন? আমাদের দুজনের সামনে আর একবার যদি আসে তো—'

'শুধুই আসে না, এসে কোলে বসে পড়ে তো,' বলতে বলতে সে জোরে হেসে উঠল। সে তার প্রেরণা। সে আসায় কোন বাধা হয় না বরং লেখায় উৎসাহ মেলে। তখন সে কত গর্ব বোধ করেছিল। রামন্নার লেখার জন্য তাকেও দরকার হত। ওঁর দক্ষতা আরও বাড়ানো দরকার। মা যেমন করে ছেলের পালন পোষণ করে সেইভাবে রামন্নার লেখায় তারও পুষ্টি যোগানো উচিত - এই কথা ভেবে সারারাত তার ঘুম হয়নি। উঠে বসে আনন্দে ঘুমন্ত রামন্নাকে দেখেছিল। সে যেন সত্যিই ছোট ছেলে, খেলা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কত বড়ো মাথা! এই ভেবে সে তাকে চুমু খেল। রামন্না চোখ মেলল। ওঃ— চালাকি! সে ঘুমোয়নি। চুমু খাবার জন্যে নিচু করে মুখটা আর তুলতে পারল না। সে মূর্তিমতী আনন্দ, রামন্নার সরস্বতী, কালিদাসের মুখে মুখ দিয়ে বিদ্যার বর দেবার সরস্বতী। সেও আনন্দ, রামন্নার সঙ্গে একাত্ম। লেখক

আর আনন্দ এক সঙ্গেই থাকে। একজনকে অন্যের কাছ থেকে আলাদা করা যায় না। দুইয়ের মিলনেই শিল্পকলা রূপ নেয়।

সেইদিন শিল্পকলা মূর্তিমতী হয়ে মোহনের রূপ ধরে এসেছিল। সে কি তা ভুলতে পারে? রামন্না যখন মোহনকে 'মোহন' বলে ডাকে তখন সেদিনের অনুভূতি জীবন্ত হয়ে তার চোখের সামনে ভাসে।

কুমুদ ধীরে ধীরে উঠল। তার মনে হল যেন সে এখনও রামন্নার কোলে বসে আছে। চেয়ার থেকে উঠে চেয়ারের গদিটা নিজের কোলে নিয়ে সে আবার বসে পড়ে।

সে বলল—'আমি কত সুখী তবু কী হতভাগী?'

হতভাগ্য ছাড়া কি? রামন্না যত মন দিয়ে লিখত, তত মন দিয়ে কি তাকে ভালবাসে নি? প্রশ্ন জাগছে কেন? এতে কোন সন্দেহ হওয়া উচিত নয়। উনি যে সব বই লিখেছেন ঐ সব বইয়ের স্ত্রী চরিত্র ভিন্ন অন্য কোন নারীর কথা রামন্নার মনে আসে নি। তবুও সে ভাগ্যহীন।

ছিঃ! এসব কি ভাবছে? মনে যে সময় উৎসাহ জেগেছে তখন এক অবাঞ্ছিত ঘটনার আশঙ্কায় পুরোণো দিনের ভুলের কথা ভেবে কি মন খারাপ করা উচিত? মনে হচ্ছে যেন রামন্নার ভালবাসা আজ নতুন করে জানতে পেরেছে। সে কি আবার নতুন বৌ হল নাকি? রামন্নার গলার আওয়াজ শুনে তার এই উৎসাহ, লজ্জা আর রোমাঞ্চ! সে নতুন বৌ। এ শাড়ীটা ভাল নয়। সভায় যাবার মত শাড়ী নয়। যদি সে ভাল করে সেজে সভায় যায় তো রামন্না খুশি হবে। রামন্নার আনন্দে সেও আনন্দ পাবে। দুজনে খুশি হয়ে ছেলেকে দেখবে আর মোহনকে দেখতে গিয়ে তারা পরস্পরকে চুমু খাবে।

কুমুদ নিজেকে সামলে নিল। পরম উৎসাহে সে একটা নতুন শাড়ী বের করল। হঠাৎ চমকে গিয়ে সে সিঁড়ির দিকে তাকাল। তার মনে পড়ল সেই শাড়ী পরবার সময় রামন্না তাকে কেমন জ্বালাতন করেছিল। তখন সে রাগ করে বলেছিল, 'এ সব চিন্তা মাথায় পুরে বই লিখলে সুসভ্য লোকে পড়া দূরের কথা বই হাত দিয়েও ছোঁবে না।' তার এত রাগ হয়েছিল যে সে কেঁদে ফেলেছিল কিন্তু রামন্না তাকে নিজের কাছে টানা বন্ধ করে নি, এমন কি শাড়ীটা হাত থেকে পড়ে যেতে বসেছিল। কুমুদ হাসিমুখে আরো ভাবতে বসল। তখনো মোহন হয়নি, তার কপাল ভাল বলতে হবে। মোহন হবার পরেও তার ছেলেমানুষি যায় নি। যখন সে পিসীর বাড়ী থেকে প্রথমবার ফিরে এল তখন মোহনকে কোলে নেবার ছলে দুষ্টুমি করে হাত ঠেকায় নি?

কিন্তু—সে নিজেই বোকা, হতভাগী।

আরে! আবার কেন দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছি? আজ মোহন ফিরলে দুজনে

তার হাত ধরে সভায় গেলে কেমন হয়? না, মোহনের বদলে আমার হাতও ধরতে পারেন। না, মোহনকেই বলবো। ছেলেটা শীঘ্র ফিরে আসে তবে তো।

ভাবতে ভাবতে সে আয়নায় দেখল। এ শাড়ীটা কি ওঁর ভাল লাগবে না? মোহন এসে গেলেই হয়। উনিও তো বলেছিলেন, 'মোহনও সভায় যাবে।' আরে! মনে হচ্ছে উনি আমাকেই বলেছিলেন। আর আমি পাগলের মত নিজেই বসে বসে ভেবে মরছি। উনি আবার না ভাবেন যে আমি ওঁর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলি নি।

সে সিঁড়ির কাছে গেল। ঈশ্, কত দেরি হয়ে গেল. ছেলেটার কোন খোঁজ নেই। তখন সে জোর গলায় বলল, 'মোহনের পথ চেয়ে বসে আছি।' পরে অপরাধী ছেলের মতো জিভ কামড়ে সিঁড়ির কাছ থেকে সরে গেল।

ষোল

'মোহনও সভায় যাবে', বলে রামণ্ণা হতবুদ্ধি হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল।

'মোহনের পথ চেয়ে বসে আছি।'

কুমুদের গলা। কথাটাকেই নিজের চোখে দেখার আশায় সে চোখ বড় করে তাকিয়ে রইল। চোখের সামনে যেন অন্ধকার। সিঁড়ির পাশের থামটা ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষণেকের জন্য। পরে তার মনে হল যেন কত বছরের ঘন অন্ধকার যেন এক মুহূর্তে সরে গেল। চোখের সামনের পর্দা সরে গেছে। দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে দেখবার শক্তি তার হয়েছে।

মানুষের অন্তর এক অদ্ভুত সৃষ্টি—এই বলে সে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। মানুষের জ্ঞান বিচিত্র। মানুষের সব চেয়ে প্রিয় সুখ কি? নিশ্চিত করে বলা কি সম্ভব? যাকে দুঃখ বলে মনে হয়, তার বিপরীত কিছু হলে তাকেই সুখ বলা হয়। হ্যাঁ, আমাদের সব জ্ঞান এই রকম। এই জন্যই মানুষের স্মৃতিকে এক বিশিষ্ট শক্তি বলা হয়। এক হচ্ছে আজ বর্তমান, আর এক হচ্ছে পুরোণো অতীত। অতীতের তুলনায় বর্তমানের অনুভূতি হচ্ছে জ্ঞান। কুমুদের কথা শুনে তার গায়ে কাঁটা দিল—আনন্দে কি? সেই গলা আগে শুনে তো উদ্বেগ হত, ওটাই কি জ্ঞানলাভের বৈচিত্র্য? সেই গলা শুনে অতীতের সুখের দিনগুলো মনে পড়ত আর তার সঙ্গে তুলনা করে ভয় হত; কিন্তু এখন? আজ? সেই গলা অতীতের উদ্বেগের আভাস নিয়ে এলেও তার সঙ্গে আজকের উদ্বেগের তুলনা করে আনন্দ পেল। এটা ধ্রুব সত্য।

রামন্না ভয় পেল। কুমুদের গলা পেয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল সত্যি কিন্তু একে কি আনন্দের লক্ষণ বলা যায়? চোখের সামনে ক্ষণিকের জন্য অন্ধকার ঘনিয়েছিল। সেও কি আনন্দের লক্ষণ?

রামন্না দীর্ঘশ্বাস নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। তার মনে হল অন্তরঙ্গের স্বর চেনা কত কঠিন। যে রহস্য স্বয়ং ভগবানও বুঝতে পারেন না তা আমাদের মত মানুষ কি করে বুঝতে পারবে! বেচারা! ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটকে ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের কি অবস্থা হয়েছিল? রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বলছেন, 'তোমার হাত আমার গলার আশ্রয় প্রাপ্ত করুক।' দেবী লজ্জায় চুপ করে থাকেন। তখন রামচন্দ্র নিজের হাতে তেমনি করে দেখান আর জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রিয়ে কিমেতৎ—এটা কি?' তাঁর বাহুস্পর্শে তাঁর কি হল? বুঝতে না পেরে তিনি বলছেন—

বিনিশ্চতুং শক্যো ন সুখমিতি-বা দুঃখমিতি-বা
প্রমোহো নিদ্রাবা কিনু বিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি-চ সংমীলয়তি-চ— ॥

এর অর্থ কি। এক অজ্ঞ টীকাকার এইভাবে লিখছেন; 'সর্বমিদং সীতায়া ভোগ্যতাপ্রকর্ষে তাৎপর্যমাবিষ্করোতি।' টীকাকার কেমন অশ্লীল অর্থ বের করেছেন।' যদি স্ত্রীর স্পর্শ আত্মহারা করে ফেলে তবে তো স্ত্রী বিশেষভাবে ভোগ্য বস্তু হল। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন যে মানব-পশুর রুচি সে তো এটাই বুঝবে। কিন্তু ভবভূতি তা বলেন নি। তাঁর বলার তাৎপর্য হচ্ছে যে স্পর্শে অদ্বৈতানন্দ লাভ হয়। সেই স্পর্শে এমন অনুভব হল যাতে সুখ-দুঃখ, প্রমোদ-নিদ্রা, বিষ-মদ এই সব কোন ভাবকে আলাদা করা যায় না।

ভবভূতির কথা সত্য। ক্ষণিকের জন্য চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল না? সেই সময় সে ঐ রকম অদ্বৈত আনন্দ অনুভব করেছিল। এই অদ্বৈত আনন্দে ভোগী কে আর ভোগ্যই বা কি?

কথাটা ভেবে রামন্নার মনে হল যেন তার শরীরে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। কুমুদের স্মৃতি-এই সব কিছুতেই তার শরীরে যেন বিদ্যুতের সঞ্চার করে। এমন জীবন কাটাতে পেরে সে নিজেকে যথেষ্ট ভাগ্যবান মনে করে।

কিছুক্ষণের জন্য এসব ভাবনা চিন্তা দূর করে রামন্না বলে ফেলল, 'হুঁ! দশ বছরের কষ্ট ভোগ দেখলে মনে হয় ভাগ্যবানই বটে।'

না, এটা হয়তো কষ্ট নয়। রামন্না মনে ভাবে, যদি মনে করা যায় যে সবরকম দুঃখ দূর হলেই মানুষ সুখী হতে পারে তবে তো তার সুখী হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ভাড়া বাড়ীতে যদি ছাদ দিয়ে জল পড়ে, তো সেটা সারাবার দায়িত্ব কার?

ভাড়াটের ? জীবনে আমাদের শক্তির চেয়ে বড় অনেক শক্তি আছে। অনেক বিষয় আছে তাতে কষ্টভোগ করতেই হয়, তাতে দুঃখ করে লাভ কি ? সব শক্তিকে জয় করলেও মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে না। যদি কোনদিন সে মৃত্যুকে জয় করে, তবেই সে জীবনকে ঘৃণা করতে পারে। কোন কষ্টই থাকবে না এমন চিন্তা করা ভুল, অজ্ঞানের লক্ষণ। জীবনের কষ্টকে যদি জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ বলে মনে করি এবং তাকে জীবনের শিক্ষার এক অঙ্গ বলে মনে ভাবি তবে কষ্ট আর কষ্ট বলে মনে হয় না। তার চিন্তার যেন শেষ নেই। কষ্ট পাওয়ার কষ্টকে কি বলা উচিত ? যাক গে, আমার মনে যা আছে সে কি আমি বুঝছি না ? এই ভেবে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল, কিন্তু তখনি তার মনে হল—সান্ত্বনা দেওয়া খুব সোজা। আবার মনে হল, কবিরা দুষ্যন্ত-শকুন্তলা, যক্ষ-যক্ষপত্নী, রাম-সীতা, এদের পরস্পরের প্রেমকে তো বিরহ দিয়েই ফুটিয়ে তুলেছেন।

যক্ষ নিজের স্ত্রীকে ভালবাসত, কিন্তু তাকে এক বছর বিরহ সইতে হয়েছিল। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে ভালবাসত, তাকেও দশ বছর বিচ্ছেদ সইতে হয়েছিল।

সেও তো দশ বছর কুমুদের কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। অতএব সেও কুমুদকে ভালবাসে। বাঃ! এই সিদ্ধান্তই যথার্থ।

সিদ্ধান্ত তো ঠিক, তর্কও সঙ্গত, কিন্তু কুমুদ মেনে নেয় তবেই তো।

না, এ ব্যাপার এখানেই শেষ। ধরে নেওয়া উচিত যে কুমুদও এটা মেনে নিয়েছে। আমি যখন বললাম যে মোহনকেও সভায় নিয়ে যেতে হবে, তখন সেও কি বলেনি 'মোহনের পথ চেয়ে বসে আছি' ?

ছিঃ। আবার পাগলামি! একটা সামান্য কথার কত রকম অর্থ সে কল্পনা করছে। অর্থাৎ! অর্থ কি তবে শব্দে থাকে ? না কি কল্পনায় থাকে ?

'মোহনেরই পথ চেয়ে আছি', এ কথার অর্থ কি ? আমিও তৈরী হয়ে আছি ? সে নিজের কথায় অবাক হল। সে কোন্ কথার কোন্ অর্থ করছে! মোহনের পথ চেয়ে আছি, এ কথার অর্থ, আমিও তৈরী হয়ে আছি—এই অর্থ কোথা থেকে এল ?

তবু রামণ্ণার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে কল্পনা করেছে সেটা ঠিক। কেন ?

আমি কিছুই জানি না। হৃদয়ই বোঝে—বুদ্ধি নয়—সে নিজের মনে এমনভাবে বলল যেন সে প্রতিবাদীকে বোঝাচ্ছে।

কুমুদ তৈরী হয়ে আছে এই কথাটা সে তাকে জানিয়েছে, এই আনন্দে রামণ্ণা ভেবে পেল না সে কি করবে। সে নিজে আগে থেকে তৈরী হয়ে আছে বলবে ? বল্— পাগল, কিছু তো বল্—এত বছর বাদে প্রথমবার সে আপনজনের মতো কথা বলছে। ভালো কিছু বলে ফেলে—বলে সে নিজের ওপর রাগ করল। আস্তে আস্তে সিঁড়ির কাছে গেল যেন নিজেকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

সে বলল, 'সভার লোকদের আসবার সময় হয়েছে !'

বলে একেবারে জানলার ধারে চলে গেল। সিঁড়ির দিকে চেয়ে আবার বলল, 'সভার লোকদের আসবার সময় হয়েছে।'

সতের

কুমুদ হকচকিয়ে গেল। রামন্না বলল সভার লোকদের আসবার সময় হয়েছে। কথাটার মানে সে বুঝল। কথাটার মানে হচ্ছে যে 'আমি তৈরী, তুমিও তৈরী তো?'

কুমুদ হেসে ফেলল।

রামন্না তৈরী হয়েছে। তার তৈরী হওয়াটা কি সে জানে না? কোটের বদলে টুপি পরা। কুমুদের ভয় হল তার হাসি রামন্না আবার শুনতে না পায়। আবার হাসি পেল। একদিন কি কাজে যখন বাইরে যাচ্ছিল তখন খালি গায়ে রয়েছে একথা ভুলে কোটটাকে পাগড়ীর মত জড়িয়ে বাইরে যাবার উপক্রম করছিল। হ্যাঁ, রামন্নার তৈরী হবার সময় কারুর না কারুর খেয়াল রাখা দরকার। আজ তো এক বড় সভার আয়োজন হয়েছে। রামন্নার জন্য সে যেসব জামাকাপড় বের করেছে সেগুলিই পরা উচিত। না জানি কি পরে বসে আছেন?

কুমুদ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সার্বজনিক সম্বর্ধনা সভায় যেতে রামন্নার স্ত্রীর সাজসজ্জা সম্পূর্ণ।

'সভার লোকদের আসার সময় হয়েছে।'

দ্বিতীয়বার রামন্নার গলা শোনা গেল। তখন কুমুদ নিজের মনেই বললে, ওই দেখ। আমি জানি উনি অপরের জন্য তাড়াহুড়ো করেন। যাই হোক আমার তৈরী হবার কথাটা ভোলেন নি। আমার ভাগ্য বলতে হয়। সব পুরুষ একই রকমের। বাইরে যেতে হয় তো বেরিয়ে পড়। ধীরে সুস্থে তো চলা উচিত। যেখানে যেতে হবে সেই মতো বেশভূষা করতে হয়। সকাল থেকে রান্নাঘরে পড়ে থাকা মেয়েরাই বোঝে বাইরে যাবার জন্যে কত কাঠ খড় পোড়াতে হয়।

কুমুদ আবার আয়নায় নিজেকে দেখল। ব্যস্ত হবার কি আছে? সে তো তৈরী। কিন্তু···? কুমুদ ভয় পেল। রামন্নার কাপড় জামা তো বের করেছে। সভায় যাবার ডাক আসার আগেই জামা কাপড় বদলানো দরকার। সে কি ওখানে গিয়ে কাপড় জামা দিয়ে আসবে? কুমুদ কেঁপে উঠল। সে কি করে যাবে?

তাও আবার 'এই' নতুন শাড়ী পরে? তার ভয় হল। কিন্তু রামপ্পার কাপড় বদলাবার জন্য যেতেই হবে। না হলে লোকে তাকে কি বলবে? কুমুদ নিজের মনেই বললে, ঘরে দুজন পুরুষ হলে কি হবে দুজনেই ছোট ছেলের মতন। এদিকে তাকে মোহনের জামা কাপড়ের কথাও ভাবতে হবে আবার রামপ্পার জামা কাপড়ের কথাও তাকেই ভাবতে হবে। দুজনেরটাই তৈরী করে রেখেছে।

'ঠিক আছে, মোহনের জামা কাপড় বের করে রেখেছি—বলে সে আয়নার দিকে মুখ ঘোরাল। তারপর লজ্জিত ভাবে নিচের সিঁড়ির কাছে গিয়ে আবার বলল, 'ঠিক আছে, মোহনের জামা কাপড় বের করে রেখেছি।'

আঠার

জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রামপ্পার মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। তখন সে শুনল কুমুদ বলছে 'মোহনের জামা কাপড় বের করে রেখেছি।' সে নিজের মনেই হেসে বলল—

মেয়েদের স্বভাব! ঘরে আগুন লাগলেও বাইরে বেরোবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি ঠেকানো চাই।

বলছে যে আমার জামা কাপড় ঠিক নেই। রামপ্পা আনন্দে ফুলে উঠল। আবার নিজের মনেই বলল যে আজ তার ইচ্ছা যে আমি ভাল জামা কাপড় পরে যাই। বেচারী! ওর এমন ইচ্ছা হবে না বা কেন? আমার জন্য এত গর্ব আর কেই বা করবে?

'মোহনের জামা কাপড় বের করে রেখেছি।'

কুমুদের মুখে কথাটা আবার শুনে রামপ্পা প্রায় দৌড়ে সিঁড়ির কাছে গেল। তার মনে হল যেন কথাটা তাকে রশির মত টানছে। সে ভাবল, ওঃ! ওর ইচ্ছে যে আমি নিচে যাই। আমার জন্যেও ও জামা কাপড় বের করে রেখেছে। তার হয়ত উপরে আসতে লজ্জা হচ্ছে। তাকে দেখবার জন্যে আমাকেই নিচে যেতে হবে। আমাকেও তার মতো সাজগোজ করতে হবে। রামপ্পা নিঃশ্বাস নিয়ে নাটকীয় ঢঙে বলল, 'মেয়েরা যখন বলে, ছেলেদের তখন চুপ করে থাকা উচিত।'

পাগল নাকি সে? যখন কুমুদ মুখ ফুটে কিছু বলছে তখনও সে আবোল তাবোল বকে মরছে।

রামপ্পা ঘড়ি দেখল। নিশ্চিত সময়ের মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। সে বলে

উঠল, 'আরে! মোটে পাঁচ মিনিট বাকী।' বলে সে জানালার বাইরে দেখতে লাগল।

উনিশ

'আর পাঁচ মিনিট বাকী আছে না?'

রামন্না'র কথা শুনে কুমুদ নিজের ঘড়ি দেখল। হ্যাঁ ঠিক তো, কিন্তু মোহন তো এখনো ফিরল না, মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী, এখনো মোহন এল না। কেন? কুমুদের স্পষ্ট মনে হল যে রামন্না তাকেই জিজ্ঞাসা করছে। চারপাশ দেখে সে দরজার দিকে চলল। দরজার কাছে পেঁছে সে ডানদিকে সিঁড়িটা দেখল। সিঁড়ি থেকে একটু দূরে রামন্না জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে আর তার পিঠ দেখা যাচ্ছে। লেখকের পিঠে চোখ থাকে না। এটা ভগবানের কৃপা ভেবে সে রামন্নাকে দেখতে দেখতে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। তখনই রামন্না তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'মোহন এসে গেছে।' রামন্না যে চোখ দিয়ে মোহনকে দেখেছিল সেই চোখে মোহনকে দেখার আশায় সে রামন্নাকে দেখতে লাগল। তার হাসি দেখে কুমুদের মুখেও হাসি ফুটল। রামন্না দ্রুত নামতে লাগল। তাকে নামতে দেখে সেও দরজা খুলতে গেল। কিন্তু সে খিল খুঁজে পাচ্ছিল না।

কুড়ি

বাইরে মোটর কারের জোর শব্দ।

রামন্না বলল, 'মোহন এল।'

তবু কুমুদ বললে, 'মনে হচ্ছে সভার লোকেরা।'

গাড়ীর শব্দ এগিয়ে আসছে। হর্ণের শব্দ। কেউ যেন ডাকছে। হঠাৎ ব্রেক কসাতে দুজনের গায়ে কাঁটা দিল। গাড়ি থামল, কুমুদ দরজা খুলল।

সামনে জনতার ভিড়। সকলে একেবারে নিস্তব্ধ। জনতা পথ ছেড়ে দিল। একজন নিজের দুহাতে কিছু তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল।

'মোহন এল?' রামন্না জিজ্ঞাসা করল। তার মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভালো করে বের হচ্ছিল না।

কুমুদ তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল।

যে লোকটা মোহনের দেহ তুলে এনেছিল সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল ভিতরে যাওয়া উচিত হবে কিনা ভেবে।

—o—